চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ

যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ

মূল হিন্দি থেকে অনুবাদ : রণেন গুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :

প্রভা প্রকাশন

৪ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা—৭০০০০৯

চম্পালাল অঞ্চালিয়া ।। ২ রাজা উডমান্ট স্ট্রীট ।। কলকাতা-৭০০০০১

এবং কলকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে

CHETANAR URDHWAROHAN : Yubacharyya Mahaprajna
Translated in Bengali from Hindi Original
by Ranen Gupta.

Rs. 22·00 Only

প্রথম মুদ্রণ—১৩৫৩

মূল্য : ২২·০০ টাকা

প্রচ্ছদ : চিত্ত দাস

তুলসী অধ্যাত্ম নীডম, জৈন বিশ্ব ভারতী, লাডনূ (রাজস্থান)-এর পক্ষে শ্রীচম্পালাল অকালিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এবং অশোক চৌধুরী, চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পি-২১ সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

সাধবী প্রমুখা কণকপ্রভাজীকে—

যাঁর স্বতঃ-উৎসারিত আশীর্বাদ

আমার অনুবাদ-কার্যের সহায়ক হয়েছে

আশীর্বাণী

চেতনার দুটি স্তর—সুপ্ত এবং জাগ্রত। অন্তর্মন এবং জ্ঞানকেন্দ্র যখন সুপ্ত থাকে, তখন চেতনার আরও নিম্নাবতরণ ঘটে। ঐ স্থিতিতে আমাদের প্রতিভা, শক্তি এবং সমৃদ্ধির (আনন্দ) স্রোত বন্ধ থাকে। সব কিছু হয়েও আমরা নিজেদের নগণ্য বলে অনুভব করতে থাকি। মনের অশান্তি, উত্তেজনা, ভাবানুভূতি—এ সবই হয় এই স্থিতিতে।

অন্তর্মন এবং জ্ঞানকেন্দ্র যখন জাগ্রত হয় তখন চেতনা অনেক উর্ধ্বে আরোহণ করে। ঐ স্থিতিতে আমাদের প্রতিভা, শক্তি এবং সমৃদ্ধির স্রোত খুলে যায়। এদের ধারা জীবনকে প্লাবিত করে দেয়। এই স্থিতিতেই পাওয়া যাবে মনের শান্তি, উত্তেজনা থেকে মুক্তি, ভাবমুক্তি এবং জীবনের সার্থকতা।

এই বইতে চেতনার উর্ধ্বারোহণের কিছু দিশা-সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। একে গ্রহণ করতে পারলে আমাদের অস্তিত্বকেই গ্রহণ করা হবে।

আচার্য তুলসী

ভূমিকা

আমরা মানুষ এবং চেতনা হল আমাদের বৈশিষ্ট্য। চেতন ও অচেতনের মাঝে একটি ভেদ-রেখা আছে এবং সেটিই হল চেতনা। চেতনা যার আছে, সে-ই হল চেতন। অচেতনের চেতনা থাকে না। মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও একটি ভেদরেখা থাকে। তা হল চেতনার বিকাশ। যার চেতনার বিকাশ ঘটানোর ক্ষমতা আছে অথবা যার চেতনা বিকশিত হয়, সে হল মনুষ্য। অন্য প্রাণীদের মানুষের মত চেতনা বিকশিত হয় না।

চেতনার বিকাশ হয় শরীরের মাধ্যমে। মনুষ্যেতর প্রাণীদের চেতনা নিচের দিকে কামকেন্দ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়। এ হল চেতনার নিম্ন অবতরণ। মানুষ এই দিককে বদলে দিতে পারে, চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ ঘটাতে পারে, কামকেন্দ্র অভিমুখে অবতরণশীল চেতনাকে জ্ঞানকেন্দ্র পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ একটি নিশ্চিত প্রক্রিয়া। এর কিছু উপায় আছে। তাকে জানতে পারলে মানুষ ঐ দিকে যাত্রা করতে পারে। যে মানুষেরা ঐ দিকে যাত্রা করেছিলেন, তাঁদের যাত্রা-বিরামগুলিকে জানতে পারলেও ঐ দিকে যাত্রা করা সম্ভব হয়। ভগবান মহাবীর চেতনার ঊর্ধ্বারোহণের দিকে এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা করে-ছিলেন। এই বইতে নানা জায়গায় ওঁর সঙ্কেতগুলি সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সাঙ্কেতিক ভাষাকে অনুধাবন করা খুব সহজ না হলেও তা বোঝা যেতে পারে। এদের বুঝবার জন্য অতীতকে বর্তমানে আনতে হয় এবং ঐ ভাবে বর্তমান এলে তা অতীতকে অনাবৃত করে দেয়। এই বইতে কোন নতুন উপস্থাপনা নেই, কেবল অতীতের অনাবৃতকরণ রয়েছে।

১৯৭১ সালে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ ক্ষুদ্রতর আকারে পাঠকদের হাতে এসেছিল। বইটি পাঠকদের কাছে প্রচুর সমাদর পেয়েছিল। শীঘ্রই ঐ সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তখন পর পর অন্যান্য নতুন বইয়ের প্রকাশনার উদ্যোগ চলছিল। তাই এই বইয়ের প্রকাশনার দিকে প্রকাশক তাঁর মনোনিবেশকে কেন্দ্রীভূত করতে পারেন নি। এখন অপেক্ষাকৃত বড় আকারে বইটি পাঠকদের হাতে এল। এতে কর্ম এবং অধ্যাত্মের আলোচনা যুক্ত করা হল।

আমি একথা মানি, কর্মকে না বুঝলে অধ্যাত্মকে বোঝা যায় না, আবার অধ্যাত্মকে না বুঝে কর্মকে বোঝা যায় না। চেতনার নিম্ন অবতরণের ক্ষেত্রে কর্মের অনেকটা হাত আছে। ওর থেকে মুক্তি পেলে তারই মানুষ ঊর্ধ্বারোহণ ঘটাতে পারে। সাপেক্ষতার এই জগতে একাধিপত্য কারুর নেই। মানবিক কর্তৃত্বগুলিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম তথ্যগুলির মধ্যে কর্ম একটি, কিন্তু তা একমাত্র তথ্য নয়। পুরুষার্থ কর্মকে প্রভাবিত করে এবং তাকে বদলেও দেয়। এটাই হল সাধনার পশ্চাৎপট। এই সত্যকে অনুধাবন না করলে সাধনার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবে না।

সামাজিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রণালী বদলে গেলে অনেকে কর্ম-সিদ্ধান্তের ব্যর্থতা বুঝতে পারেন। তাঁদের ধারণা হল, কর্মই উচ্চ-নিচ, ধনী-নির্ধন তৈরি করে। সমাজ-ব্যবস্থায় যদি সাম্যের অবতরণ হয় তাহলে কর্মের সার্থকতা কোথায়? তাঁদের মতানুসারে কর্মের সিদ্ধান্ত সঠিক হলে সমাজে অসমতা থাকবে। সমাজ-ব্যবস্থায় যদি সমতা থাকে তাহলে কর্মের সিদ্ধার্থ সত্য হতে পারে না। এই অবধারণাই কর্মকে ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, কারণ এর সম্বন্ধ ব্যক্তির আন্তরিক চেতনা থেকেই হয়। কর্মশাস্ত্র, মানসশাস্ত্র এবং যোগশাস্ত্র—এই তিন শাস্ত্রই স্থূল ব্যবহারের ভিত্তিতে ব্যক্তির মূল্যায়ন করে নি, বরং ঐ ব্যবহারগুলির পিছনে সংঘটিত চেতনার ভিত্তিতে মূল্যায়নটি সম্পন্ন করেছে। অধ্যাত্মসংক্রান্ত আলোচনায় এই তিন প্রণালীর একত্রিত অধ্যয়ন খুবই আকাঙ্ক্ষিত। মানসশাস্ত্রে

সুপণ্ডিতরা অবচেতন মনের রহস্য অনাবৃত করে কর্মশাস্ত্রীয় প্রণালীকে নতুন অধ্যায়ের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। এই বইতে ঐ তিন বিষয়ের সমন্বয়ের কিছু রেখা দেওয়া হয়েছে, যা ভবিষ্যৎ বিকাশের আধার হতে পারে।

শিবির চলাকালীন ভাষণগুলির সঙ্কলন এবং সম্পাদনকার্যে মুনি দুলহরাজের অক্লান্ত পরিশ্রম এই উপলব্ধির হেতু হয়েছে। আচার্য শ্রীতুলসীর প্রদর্শিত পথে চললেও এই প্রয়াস পৃথক মূল্য পাবে।

২০৩৫, আষাঢ় শুক্ল পূর্ণিমা
গঙ্গাশহর (রাজস্থান)

মুনি নথমল
(যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ)

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

চেতনা-জাগরণ সম্বন্ধে মানুষ খুবই সচেতন, তাই ঐ কর্ম-আবরণের নিরসনেও সে রস গ্রহণ করে। অধ্যয়নেও ঐ রস বড় কম নয়। যদি এর ক্ষেত্র ব্যাপক হয় তাহলে এই গ্রন্থের সংস্করণ জীবন-পরিষ্করণের সংস্করণ হতে পারে।

যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

লাড়নূ

সূচীপত্র

১ঃ

চেতনার জাগরণ

- অস্তিত্ব ও প্রাণের সমন্বয় হল জীবন।
- অস্তিত্ব ও প্রাণের পৃথকত্ববোধ হল বিবেক।
- চেতনার জাগরণের প্রথম বিন্দু হল এটাই।

চেতনার জাগরণ ঃ একটি জিজ্ঞাসা

অনেকেরই ধারণা আছে জৈনধর্মে সাধনা-পদ্ধতিটি ব্যবস্থিত নয় এবং এতে যোগ নেই। জৈন দর্শনে পণ্ডিত রীতিমত বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যেও এই ধারণা প্রচলিত। আমার মনে হয়, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই কারণে এই অধ্যায়ে আমি প্রধানত জৈন সাধনা-পদ্ধতি অথবা জৈন যোগের ওপর অথবা তার আধার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। এমনিতে যোগ হল একটি এমন বিষয় যাতে জৈন-অজৈন প্রভৃতি কোন প্রভেদ করা সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও নিজস্ব ঢং-এর প্রতিপাদন এবং নিজস্ব শৈলীতে কিছু বিশেষ কথার নিরূপণ হয়। এই বিষয়ের ওপরে আমি কিছু বক্তব্য রাখব।

এই অধ্যায়ে আলোচনার প্রথম বিষয় হল 'চেতনার জাগরণ'। কারণ, যোগ এবং সাধনা-পদ্ধতির আচরণ কেন করা উচিত, এই সম্বন্ধে যতক্ষণ না আমাদের পরিষ্কার ধারণা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এগুলি সম্বন্ধে তৎপর হতে পারব না—এগুলি সম্পন্ন করার প্রবল চিন্তা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হবে না। আমাদের করার বিষয়

সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত হতে পারব না। এই কারণেই আমাদের মনে রাখতে হবে, চেতনার জাগরণ ছাড়া আমাদের জীবনের সার্থকতা নেই এবং আমরা যা পেতে চাই তা পেতে পারব না। তাই এগুলি আলোচনাই হবে আমাদের প্রথম বিষয়।

জল খাবার জন্য আমি একদিন বসে ছিলাম। সামনেই জলপাত্রটি ছিল। দেখলাম, পাত্রটির মধ্যে গুটিকয়েক লবঙ্গ পড়ে আছে। সব মিলিয়ে পাঁচ-সাতটি হবে। কিছু পড়ে আছে একেবারে নিচে, আর কিছু রয়েছে জলের ওপরে। সহসা আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগল, কেন এমন হল? যে লবঙ্গগুলো নিচে পড়ে আছে, সেগুলি কি লবঙ্গ নয়? অথবা, যেগুলি ওপরে রয়েছে, সেগুলি লবঙ্গ নয়? সবকটিই যদি লবঙ্গ হয়, তাহলে কিছু ওপরে আর কিছু নিচে, এমন কেন হল? আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। বুঝতে পারলাম না। আবার দেখলাম। গভীরভাবে দেখা এবং চিন্তার পর একটা কথা আমার মাথায় এল। যে লবঙ্গগুলো জলের ওপরে ভাসছিল ওগুলোতে মাথাটা রয়েছে, কিন্তু যেগুলো জলের তলায় রয়েছে সেগুলোর টুপি এবং ফুল দুই-ই খুলে পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম, এই টুপিই লবঙ্গকে ভাসিয়ে রাখে জলের ওপরে, আর যেগুলোর টুপি খুলে গেছে, হালকা ভাবের বদলে ভারি ভাব এসেছে, ঐগুলি জলের নিচে গিয়ে ডুবে যায়।

এ জিনিস আপনারাও বা আপনিও দেখেছেন, দেখে না থাকলে দেখতে পারেন। যখন ইচ্ছা দেখতে পারেন। চারটি লবঙ্গ হাতে নিন। দুটির টুপি খুলে জলে ছেড়ে দিন, আর দুটিকে টুপিসমেত জলে ডোবান। যেটির টুপি খুলে নিলেন সেটি জলের নিচে চলে যাবে, আর যেটিতে টুপি লাগানো রয়েছে সেটি ওপরে থেকে যাবে। এই হালকা এবং ভারি ভাব কেবল লবঙ্গগুলিকেই ডোবায় না বা উঁচুতে তুলে ধরে ভাসায় না, ব্যক্তিকেও ডুবিয়ে দেয় বা উঁচুতে তুলে রাখে।

সত্যি বলতে কি, ওপরে যাবার যে রাস্তা, তা হালকাই হয়। নিচে যাবার রাস্তা হয় ভারি। জয়ন্তী ভগবান মহাবীরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ভন্তে! কোন্‌টি প্রশস্ত, আর অপ্রশস্ত কোন্‌টি? স্মরণীয় কি, আর নিন্দনীয় কি? উপাদেয় কি, আর হেয় কি?'

হালকা এবং ভারি ভাব

ভগবান খুব সংক্ষেপে বললেন, 'যা ভারি তা হল অপ্রশস্ত, আর যা তা হালকা হল প্রশস্ত। লঘু হল প্রশস্ত এবং গুরু হল অপ্রশস্ত।' উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে! এই জীব কিভাবে ভারি হয় এবং কিভাবে হালকা হয়?' ভগবান শাস্ত্রীয় ভাষায় এর উত্তর দিলেন, কিন্তু আমি এর সরলার্থ আপনাদের কাল বলব। ভগবান বলেছিলেন, যার চোখে পরমাত্মা উঁকি দেয় সে হল হালকা, আর যার চোখে শয়তান উঁকি মারে তা হল ভারি। পরমাত্মা কি, আর শয়তান কি? যা আমাদের অস্তিত্বের অনুভূতি, তা হল পরমাত্মা। আর, অহং-এর যে অনুভূতি, তা হল শয়তান। যে ব্যক্তি অস্তিত্বের অনুভূতির ধরাতলে চলে যায়, যেখানে পরমাত্মা চোখে উঁকি দেয় সে হয় হালকা. আর যে ব্যক্তির চোখে অহঙ্কার এবং সম-বারের শয়তান উঁকি দেয়, সে হয় ভারি।

একটি পুরনো ঘটনার কথা বলি। একটি লোক একটি ছবি আঁকতে মনস্থ করল। সে ভাবল, সেই মানুষের ছবি সে আঁকবে যার চোখে পরমাত্মা উঁকি দিচ্ছে, কিংবা যার চোখে রয়েছে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। সে ঘুরল। খুব ঘুরল। হাজার হাজার মানুষকে দেখল। মেয়েদের দেখল। ছেলেদের দেখল। বড় বড় পণ্ডিতদের দেখল। ধনীদের দেখল। কিন্তু কোথাও পরমাত্মা উঁকি দিতে দেখল না। তারপর সে ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলে গেল। ক্ষেত-খামারে ঘুরল। সেখানে এক চাষীকে সে দেখতে পেল। চাষী ক্ষেত তৈরি করছিল, কৃষিকাজ করছিল। তার চোখ দেখে মনে হল সেখানে পরমাত্মা উঁকি দিচ্ছে। শিল্পী ঐ কৃষকের

একটি ছবি আঁকল। ছবিটি এমন সুন্দর, এত মোহময় এবং চিত্তাকর্ষক হল যে বহু সহস্র মুদ্রায় সেটি বিক্রি হল, সাধারণ মানুষের কাছেও খুব প্রিয় বলে গণ্য হল। যে দেখল সেই ছবিটির খুব প্রশংসা করল, তারই পছন্দ হতে লাগল ছবিটি।

কিছু দিন পরে শিল্পী আবার ভাবল, এবার আমাকে এমন এক ছবি আঁকতে হবে যার চোখে উঁকি দেবে শয়তান। এমন মানুষের খোঁজে সে বেরোল। অনেক খোঁজ করল। দেখতে লাগল মানুষজনকে। কিন্তু আপনারা জানেন, সব মানুষের চোখে পরমাত্মা বা শয়তান উঁকি দেয় না। এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। তেমন মানুষ খুব কমই আছেন যাঁর চোখে শুধুমাত্র পরমাত্মা বা কেবলমাত্র শয়তান উঁকি দেয়। মানুষ লুকোতে জানে। এইজন্য সে লুকিয়ে ফেলে। এদিকে শিল্পী ঘুরতে ঘুরতে একটি কারাগারে পৌঁছল। সেখানে এক কয়েদীকে দেখতে পেল। কয়েদীর চোখে উঁকি দিচ্ছিল শয়তান। কয়েদীকে দেখে শিল্পী তার ছবি আঁকল। ছবিটি এমন ভীষণ হল যে শয়তান কি উঁকি দেবে, মনে হল যেন এক হত্যাকারী কথা বলছে। একটি প্রত্যক্ষ হত্যাকাণ্ড যেন কথা বলছিল। শিল্পী খুবই কুশলী ছিল, তাই ছবিও ঐ রকম আঁকা হয়ে গেল। ছবিটি নিয়ে শিল্পী কয়েদীর কাছে গেল। প্রথমে আঁকা ছবিটির সঙ্গে দ্বিতীয় ছবিটিও সে কয়েদীকে দেখাল। কয়েদী নিজের ছবি দেখল। কি ভয়ঙ্কর! কি ভীষণ! শিল্পী কয়েদীকে বলল, 'এই হল তোমার ছবি।' কয়েদী তন্ময় হয়ে ছবিটি দেখল। ছবির ভীষণত্ব দেখল, তারপর হাসতে শুরু করল।

শিল্পী জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধু! হাসছ কেন?' কয়েদী বলল, 'তবে কি কাঁদব? কি ভাবে কাঁদব? হাসব না কেন? এই ভয়ঙ্কর চিত্রটি তুমি আমাকে দেখাচ্ছ, কিন্তু তুমি এ কথা জান না, তোমার যে ছবিতে পরমাত্মা উঁকি দিচ্ছে, সেই ছবিও আমার। দুই-ই আমার ছবি। এখন তাহলে আমি কি করব? কাঁদব, না হাসব?'

যে মানুষটির চোখে পরমাত্মা উঁকি দেয়, সেই মানুষেরই চোখে শয়তানও উঁকি দিতে পারে। আবার, যে মানুষটির চোখে শয়তান উঁকি দেয়, তার চোখে পরমাত্মাও উঁকি দিতে পারে। পরমাত্মা কোথাও নেই, শয়তানও কোথাও নেই। প্রতিটি মানুষের আত্মায়, জীবনে পরমাত্মা যেমন উপস্থিত হয়, শয়তানও তেমনি উপস্থিত হয়। পরমাত্মার উপস্থিতি আমাদেরই উপস্থিতি, আবার শয়তানের উপস্থিতিও আমাদের উপস্থিতি। কিন্তু, এই দুই ব্যাপার কখন ঘটে? পরমাত্মার উপস্থিতি তখনই হয় যখন আমাদের ভেতরে লঘুত্ব উপস্থিত হয়। যখন আমাদের ভেতরের ভারি বা গুরু ভাবটি উপস্থিত হয় তখন দেখা দেয় শয়তানের উপস্থিতি। বাস্তবে এই হালকা এবং ভারি ভাবই সব কিছু, যা ব্যক্তির দুটি ছবি তৈরি করে, ব্যক্তিকে দু ভাবে প্রস্তুত করে।

এজন্যই ভগবান মহাবীর শ্রাবিকা জয়ন্তীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, জীব যখন ভারি হয়ে যায় তখন সে হয় অপ্রশস্ত এবং সে যখন হালকা হয় তখন হয় প্রশস্ত। আমাদের বিপদ কোথায় আপনারা তা জানেন। আমাদের এই ভারিত্বই হল আমাদের বিপদ। যখনই লঘুতা আসে, তখনই সব সমস্যা দূর হয়ে যায়। মহর্ষি চরক লঘু ভাবটাকে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। লঘুত্বই হল স্বাস্থ্যের প্রথম লক্ষণ। সুস্থ ব্যক্তি কে? যার মধ্যে লঘুত্ব আছে। যার মধ্যে গুরুত্ব এসেছে, সে অসুস্থ হয়ে যায়। গুরুত্বই হল অ-স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আমরা যখন বলি শরীর ভারি হয়ে গেছে, তখন বুঝতে হবে, শরীরে জ্বর দেখা দিতে চলেছে। জ্বরের প্রথম দূত হল, শরীরের ভারি হওয়া। শরীর ভারি হলে একটা অস্থিরতা দেখা দেয় এবং আমরা অনুভব করি, মনও অস্থির হয়ে পড়েছে। খানিকটা বে-নিয়মের ভাব দেখা দিচ্ছে। ভারি-বোধের এই হল কারণ। চরক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে যাকে বর্ণনা করেছিলেন, আসন ও ব্যায়ামের যে নিষ্পত্তি করেছিলেন, তার প্রথম তথ্যই ছিল লঘুতা

—'লাঘবং কর্মসামর্থ্যম্'। লঘুতা উৎপন্ন হলে, হালকা ভাবটা এলে, আমাদের মনে হয় শরীরটা আজ খুব ভাল লাগছে, কারণ শরীরটা বেশ হালকা বোধ হচ্ছে।

ঊর্ধ্বারোহণের রেখা

বাস্তবেও হালকা খুব সুখপ্রদ হয়। ভারিত্ব কখনও সুখকর হয় না। জয়ন্তী যেমন মহাবীরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ভন্তে! জীব কিভাবে ভারি হয়, আর কিভাবে হালকা হয়', সেই প্রশ্ন গৌতম স্বামীও করেছিলেন মহাবীরকে। ভগবান একটি রূপকের সাহায্যে এর উত্তর দিয়েছিলেন—গৌতম! মনে কর মাটির একটা পাত্র রয়েছে। কেউ তার ওপরে খড় বা ঘাস জড়িয়ে দিল। মাটি লেপে দিল। শুকোল। পর পর দ্বিতীয়বার ওর ওপরে মাটির প্রলেপ দিল। এ রকম আট বার করল। পাত্রটি বেশ ভারি হয়ে গেল। এখন ঐ পাত্রকে নিয়ে জলে ছেড়ে দেওয়া হল। পাত্র জলের নিচে ডুবে গেল। যে পাত্রের জলে ভাসার কথা, অপরকে ভাসিয়ে রাখার কথা, সেই পাত্র ডুবে গেল, জলের নিচে চলে গেল। কারণ, সেটি ভারি হয়ে গেছে। কিছুদিন ঐ পাত্র জলের নিচেই রইল। থাকতে থাকতে এর একটি প্রলেপ খসে গেল। তারপর দ্বিতীয় প্রলেপটি উঠল, তারপর তৃতীয় প্রলেপ—এভাবে উঠতে উঠতে সমস্ত প্রলেপই উঠে গেল। পাত্র হালকা হয়ে গেল। আবার তা ওপরে উঠে এল। এখন, যে জিনিসটি ডুবে গিয়েছিল সেটিও পাত্র, পরে যেটি ভেসে ওপরে উঠল সেটিও পাত্র। পাত্রটি একই, তা দুটি নয়। কিন্তু যেই তা ভারি হয়ে গেল অমনি ডুবে গেল, জলের নিচে চলে গেল। আবার যেই তা হালকা হল, অমনি ওপরে উঠে এল, ওপরে ভেসে উঠল।

এই জীব যখন ভারি হয়, তখন তার অধোগতি হয়। নিম্ন গতিতে চলে যায়। তার বৃত্তিগুলি নিম্নমুখী, তার চিন্তাও হয় নিম্নমুখী। তার আচরণও নিম্ন হয়। যার আচরণ, বিচার, সংস্কার

এবং বৃত্তি অধোগামী হয়, নিম্নগামী হয়, নিকৃষ্ট বোধির হয়, তা হয় ভারি বোধের জন্য। পাত্র যখন ভারমুক্ত হয়, বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, যখন তার প্রলেপ খসে যায়, তখন তা ওপরে চলে আসে। জীবও যখন হালকা হয় তখন ওপরে চলে আসে। ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন হয়। তার ঊর্ধ্বচিন্তা, উত্তম বিচার এবং উত্তম আচরণ হয় হালকা হওয়ার জন্য। হালকা-ভাবের এই হল সহজ নিষ্পত্তি—একে আটকানো যায় না।

আগুন জ্বলে, তার শিখা যায় ওপরের দিকে। এর কারণ কি? লঘুতার জন্য শিখা যায় ওপরে। এরণ্ড ফল থেকে যে অঙ্কুর বেরোয় তা লাফিয়ে ওঠে, ওপরে চলে যায়।

ভগবান মহাবীরের উক্তিতে, নিজেদের অনুভবের ভিত্তিতে, নিজেদের দৃষ্টির কারণে আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি, দেখা—তা শরীর, বিচার বা চিন্তা, যাই হোক না কেন—যেখানে ভার সৃষ্টি হয়, ভারবোধ জাগে, সেখানেই ব্যক্তি নিচে চলে যাবে। আবার, যেখানে ভার থেকে মুক্তি অনুভূত হবে, সেখানে ব্যক্তি ওপরে উঠে আসবে। লঘুতা এবং গুরুত্ব, হালকা ভাব এবং ভারি ভাব—এই দুই বোধই আমাদের সামনে এখন খুব স্পষ্ট। আমরা এখন বুঝতে পারছি, আমাদের চেতনার জাগরণ, আমাদের চেতনার ঊর্ধ্বগতি তখনই সম্ভব যখন আমাদের জীবনে, আমাদের পারিপার্শ্বিকতায় এবং আমাদের বৃত্তিতে লঘুতা আসে, হালকা ভাব আসে।

এই লঘুত্ব এবং গুরুত্বের বিবেক আমাদের সামনে তৈরি রয়েছে। আমাদের জীবনের আনন্দ, আলোক, নিশ্চলতা এবং পবিত্রতা যেখানে প্রকট হয়, তার কেন্দ্রবিন্দু বা রেখা হয় হালকা ভাবের রেখা, লঘুতার রেখা। এখান থেকেই আমাদের চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ শুরু হয়। আর যেখানে গুরু রেখাটি থাকে, অর্থাৎ ভারিত্বের রেখাটি থাকে, সেখান থেকেই আমাদের চেতনার, বিবেকের নিম্নাবতরণ শুরু হয়।

এখন প্রশ্ন হল, হালকা ভাবটি কিভাবে আসবে? ভারি

ভাবটাকে আমরা কিভাবে শেষ করব? যাবতীয় সাধনা-পদ্ধতির শুরু এখান থেকেই। সাধনার বিবেক বা পৃষ্ঠভূমিটি রয়েছে এখানেই। সাধনার এই দৃষ্টিকে আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সাধন-পদ্ধতির এটিই হল আদি বিন্দু, এখান থেকেই সাধনা শুরু হয়। কিভাবে এবং কাকে আমরা হালকা করব? যা ভারি হয়ে আছে, তাকে হালকা করতে হবে। কারণ ভারি বা হালকা করার ব্যাপারে আমাদের বিবেক থাকা প্রয়োজন।

মালের বোঝা নিয়ে যাচ্ছিল একটি লোক। সঙ্গে ছিল কয়েকটি ঘোড়া এবং কয়েকটি গাধা। পথের মাঝে একটি নদী পড়ল। একটি ঘোড়ার পিঠে চাপানো হয়েছিল নুনের বস্তা, সে বসে পড়ল। নদীতে জল ছিল। সব নুন ভিজে গেল। একটু পরে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। বস্তা একেবারে খালি হয়ে গেল। গাধা ভাবল, 'বেশ ভাল উপায় তো! আমিও হালকা হয়ে যাব। চমৎকার উপায়!' একটু বেশি সময় জলের ওপরে সে-ও বসল। কিন্তু, পিঠের ওপরে ছিল কোমল কার্পাস। জলের মধ্যে এদিক-ওদিক করতেই বস্তা ভিজে গেল। আগে যতটা ভারি ছিল, বস্তাটা তার চেয়ে এখন অনেক বেশি ভারি হয়ে গেল। দ্বিগুণ কি চারগুণ ভারি হল। জল থেকে উঠতে দেখা গেল, হালকা হওয়ার বদলে বস্তা অনেক ভারি হয়ে গেছে।

সাধনায় যদি এই জ্ঞানটি না হয়, তাহলে হালকা হওয়ার চেষ্টা শুরু করলে আমাদের অজ্ঞাতেই তা ভারি হয়ে যাবে। এই জন্যই সাধনমার্গে প্রভূত অন্তর্দৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন। কোথায় কিভাবে হালকা হতে হবে এবং কিভাবে ভারমুক্ত হতে হবে, যদি এই ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান না থাকে. সঠিক দৃষ্টি যদি না থাকে, তাহলে এমন হতে পারে যে, হালকা হওয়ার বদলে ভার বেড়ে যাবে। এমন হবে যে, হালকা হওয়ার জন্য চলা শুরু করে শেষ পর্যন্ত ভারি হয়ে গেলাম।

জ্ঞাতাসূত্র-র একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করি। সুমালা ভাবলেন, আমি হালকা হব। সাধ্বী হব। কিন্তু হালকা হওয়ার মন্ত্র হাতে এল না। ভারি হতে হতে এমন ভারি হলেন যে, একদিন ওঁর মনে এক বিকল্প চিন্তা এল, যখন আমি ঘরে ছিলাম তখন কত স্বাতন্ত্র্য ছিল আমার—আর এখন সাধ্বী হয়ে কত পরাধীন হয়ে গেছি। কত পরাধীন এখন আমি—চলতে হলে এভাবে চল, বসতে হলে এভাবে বসো। এটা কোরো না. ওটা কোরো না। শৃঙ্গার কোরো না, সাজ-গোজ, প্রক্ষালন কোরো না—কত পরাশ্রয়ী, কত পরাধীন! আমার ওপরে কত অঙ্কুশ লাগানো রয়েছে! কি হয়েছে? কত পরাধীন হয়ে গেছি। বেচারী হালকা হওয়ার চলা শুরু করল, আর হয়ে গেল বেশি ভারি!

সাধনমার্গে এই কারণেই সঠিক দৃষ্টি-সম্পন্নতার প্রয়োজন। যতক্ষণ এই দৃষ্টি-সম্পন্নতা প্রকট না হচ্ছে, ততক্ষণ অনেক বার এমন মনে হবে যে, আপনি চেষ্টা করলেন হালকা হতে, আর ঐ গাধাটির মত বেশি ভারি হয়ে গেলেন।

কাকে হালকা করতে হবে, এই ব্যাপারেও খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রয়োজন। কে ভারি হয়? আমাদের শরীর ভারি হয়, মন ভারি হয়, শ্বাস ভারি হয়। এই তিনটি জিনিস ভারি হয় এবং সাধনার জন্য, ভেতরে প্রবেশের জন্য বা চেতনার জাগরণের জন্য, সবচেয়ে আগে এই তিনটিকেই হালকা করতে হবে। শরীরকে হালকা করতে হবে। সব সাধনার এই হল পদ্ধতি। আপনি ভাবছেন, মহাবীর কোথায় শ্বাস হালকা করার কথা বলেছিলেন? মহাবীর কোথায় শরীর হালকা করার কথা বলেছিলেন? সম্ভবত এ প্রশ্ন না-ও উঠতে পারে, কারণ আপনার সামনে রয়েছে তপস্যা। কিন্তু মহাবীর কোথায় মনকে হালকা করার কথা বলেছিলেন?

লঘুতা তিনের

এখন যদি আমরা মহাবীরকে বুঝি, তাঁর অন্তঃস্থলে গিয়ে বুঝি, কেবল শব্দগুলিকেই আঁকড়ে ধরে বোঝার চেষ্টা না করি, তাহলে দেখব, শরীরকে হালকা করা, মনকে হালকা করা এবং শ্বাসকে হালকা করা—এই তিন কাজের ওপর উনি যতটা জোর দিয়েছিলেন, তেমনটি আর কোন কাজের ওপরেই দেন নি। আমরা পরিভাষাকেই বেশি করে ধরি, কিন্তু মূল মর্মকথাকে খুবই কম অনুধাবন করি। কিন্তু পরিভাষায় শব্দের অর্থকেই কেবল ধরা যায়, তার মর্মস্থলে হাত দেওয়া যায় না। চেষ্টা করলেও শব্দ আমাদের থেকে অনেক দূরে থাকবে। আর তখনই মহাবীরের মূল কথা বা আত্মাকে অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। মহাবীর হালকা হওয়ার উপায়টিকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন। ঐ তিনটি জিনিসকে হালকা না করলে কারুর পক্ষেই হালকা হওয়া সম্ভব নয়।

হিংসার স্মৃতি : ভারি হওয়ার কারণ

জয়ন্তী প্রশ্ন করলে মহাবীর তার উত্তরে বললেন, জীব ভারি হয় প্রাণানিপাতের জন্য, হিংসা করার কারণে। হিংসা করলে কি জীব ভারি হয় ? খুবই স্থূল কথা। কিন্তু এই স্থূল কথাই আমাদের একটি সঙ্কেত দিয়েছে। ঐ সঙ্কেতকে ধরেই আমরা বসে আছি।

হিংসা করলে জীব ভারি হয়, এ তো খুবই ছোট কথা। জীব ভারি হয় হিংসার স্মৃতিচারণা করলে। জয়াচার্য এই বিষয়টিকে নিজস্ব শাস্ত্রীয় ভঙ্গিতে খুব সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। যে কর্মের উদয়ে, যে সংস্কারের স্মৃতিতে কেউ হিংসা করে, প্রাণানিপাত করে, ঐ সংস্কার এবং ঐ স্মৃতিই হল প্রাণানিপাত ও হিংসার মূল।

খুবই মর্মপূর্ণ কথা। হিংসার স্মৃতিই বাস্তবে হল হিংসা। হিংসার সংস্কারের স্মৃতি যত বড় হিংসা, ক্রিয়মান হিংসা কিন্তু তত বড় হিংসা নয়। ক্রিয়মান হিংসার আকাঙ্ক্ষা আমাদের ভারি করে, আমাদের হিংসা ঐ স্মৃতিকে জুড়ে দেয় এবং অতীতের স্মৃতি ও

ভবিষ্যতের কল্পনা মানুষকে আরও ভারি করে। ভার কি? স্মৃতির ভার এত হয় যে, যে কাজ আমরা করছি তার ভার কখনই অতটা বেশি হয় না।

আজ কোন বড় কাজ আপনাকে করতে হবে। কাজ করতে কিছুটা সময় তো লাগবেই। কিন্তু তাতে স্মৃতি এতটা ভারি হয়ে যায়, যে বহু লোক তো ঐ স্মৃতির ভারেই চাপা পড়ে, কাজ করার ক্ষমতাও তখন অনেকটা কমে যায়। কল্পনা করে নিন পাঁচজন সাধ্বী রয়েছেন, কিন্তু পঁচিশজন বাইরে থেকে এসে পড়লেন। পাঁচজনের মনে চিন্তা আসে, অতিথি সৎকার করতে হবে। তা ঐ আতিথ্যটি সমাপ্ত করার সম্পন্ন করার সময় কল্পনার ভার, ঐ স্মৃতির ভার এমনই চেপে বসে যে পরিণামে তার কাজ করার ক্ষমতাই কমে যায়। আমাদের সামনে এমন অনেক কাজ আসে, অনেক প্রসঙ্গ আসে যেগুলি সম্পাদন করা খুব জটিল নয়, দুরূহ নয় এবং সে সব কাজ আমরা করেও ফেলতে পারি। কিন্তু স্মৃতি এমন জটিল, দুরূহ এবং ভারবিশিষ্ট হয়ে পড়ে যে তা আমাদের কাজ করার শক্তিকেই চুরি করে নেয়। এই হিংসার স্মৃতির ভার তাই খুব বেশি।

কল্পনার ভার

কল্পনার ভারও ঠিক এই রকম জটিল হয়। কল্পনায় আমরা এমনভাবে হারিয়ে যাই, এতটা ভারি হই যে পরিণামে আমাদের গতিই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সঠিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখবেন, স্মৃতির ভার এবং কল্পনার ভার দুই-ই আমাদের কাছে অসহ্য ভার হয়ে উঠছে। আপনি অনুভব করবেন, কল্পনা এবং স্মৃতির ভার যতটা হয়, বাস্তবে কিন্তু সেগুলি ততটা ভারবিশিষ্ট নয়।

লোকে বলে, অমুক জঙ্গলে অনেক বাঘ আছে, সিংহ আছে, তারা দিনের বেলায় ঘোরাঘুরি করে। ভয়ঙ্কর জঙ্গল। কল্পনায় তা আরও ভয়াবহ। কিন্তু যখন বনে ঘুরে বেড়ান তখন অতটা ভয় লাগে না। ভয়ের বুকের ভেতরে প্রবেশ করলে ততটা ভয় করে

না। স্মৃতিতে যতটা ভয় ছিল, ঐ সময় ততটা ভয় থাকে না। স্মৃতি এবং কল্পনার এই ভারকে অতিক্রম করা খুব কঠিন কাজ। স্মৃতি এবং কল্পনা হল আমাদের অন্তর্জগতের ঘটনা। আর, বাস্তব পরিস্থিতির পরিবেশ বা পরিস্থিতির সামনের দিকটা হল বাইরের জগতের ঘটনা। আমাদের অন্তর্জগৎ, আমাদের কল্পনা এবং স্মৃতি আমাদের মন এবং কার্যক্ষমতার ওপর যতটা প্রভাব ফেলে, বাইরের জগতের ঘটনাবলী কিন্তু আমাদের মনের ওপর ততটা প্রভাব ফেলতে পারে না।

কল্পনা এবং স্মৃতির ভারকে বহন করা অনুচিত, এ কথাটা বোঝা আমাদের পক্ষে খুবই জরুরী। হিংসা, অসত্য প্রভৃতি যত রকমের দোষাবহ আচরণ আছে, সেগুলি যদি স্মৃতি ও কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়, বিস্তার করে, হয়তো তাহলে বর্তমানে পাওয়াই যাবে না। বর্তমানের মুহূর্তটি খুবই পরিশুদ্ধ। বর্তমানের পবিত্র জল, বর্তমানের নির্মল গঙ্গাজল অতীতে দুর্গন্ধযুক্ত এবং ভবিষ্যতেও দুর্গন্ধযুক্ত হবে, মলিন হয়ে যাবে, তার স্বচ্ছতাও বিনষ্ট হবে। যদি আমরা অতীত এবং ভবিষ্যতকে বাদ দিয়ে, ঐ দুটিকে পৃথক করে কেবল বর্তমানে থাকাটাই শিখে নিতে পারি, তাহলে স্থিতি লাভ করা সম্ভবপর হবে।

হালকা কিভাবে হবেন

জীবনকে মুক্ত করার পরিভাষা যিনি লিখেছেন, সেই আচার্য শঙ্কর বলেছেন—

অতীতানুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্।
ঔদাসিন্যমপি প্রাপ্তে, জীবনমুক্তস্য লক্ষণম্॥

এই জীবন-মুক্তি কি? যেখানে অতীতের অনুসন্ধান নেই এবং ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, ভবিষ্যতের কল্পনা এবং যোজনা যেখানে নেই, সেটিই হল জীবনমুক্তি। ভবিষ্যতের কল্পনা এবং অতীতের স্মৃতি বা অনুসন্ধান ছেড়ে যদি আমরা বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে থাকি তাহলে মুক্তি অনুভব করি, হালকা ভাবটাকে অনুভব করতে পারি।

হালকা হবার এই প্রক্রিয়াকেই ভগবান মহাবীর বর্তমানের ক্রিয়ার মাধ্যমে দিয়েছেন। আমাদের হালকা হতে হবে, শরীরকে হালকা করতে হবে। কিভাবে তা করব? এই বিষয়ের আলোচনায় আজ আমি যেতে পারব না, কারণ বিষয়টি খুবই দীর্ঘ। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া, কায়োৎসর্গের পদ্ধতি চলে আসে শরীরটাকে হালকা করার ভেতরেই। মনকে হালকা করতে হবে, কিন্তু কিভাবে তা করব? এই ব্যাপারেও আজ আমি কিছুই বলতে পারব না। কারণ, মনকে হালকা করার পদ্ধতি বুঝতে হলে সবচেয়ে আগে মনটাকে বুঝতে হবে। মন কি? তার অস্তিত্ব কি? মনের ক্রিয়া কি? মনের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে, তা কতটা সঠিক এবং কতটা ভ্রান্ত, সেটা একটা সম্পূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য আজ এর ব্যাখ্যায় আমি যাব না।

তৃতীয় বিষয় হল, শ্বাসকে হালকা করা। যিনি শ্বাসের সম্বন্ধে জানেন না, তিনি সাধনা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেন না। বর্ণমালার প্রথম অক্ষর হল 'অ'। যে শিশু 'অ' জানে না, সে পণ্ডিত হবে কি করে—অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্নই তো হবে না। সবচেয়ে আগে তাই ওর পক্ষে 'অ' বোঝাটা জরুরী। যিনি শ্বাসকে জানেন না তিনি সাধনা করবেন কি করে? কিছুই করতে পারবেন না। শ্বাসের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্বন্ধ এত নিকট ও ঘনিষ্ঠ যে তাকে না বুঝলে জীবনকে বোঝা সম্ভব হয় না।

অস্তিত্ব এবং জীবন

আমাদের জীবনে রয়েছে দুটি স্থিতি—প্রথমটি হল, আমাদের অস্তিত্ব বা আত্মা এবং দ্বিতীয়টি হল, আমাদের জীবন। আমরা অস্তিত্বকে জানতে পারি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সারা জীবনকে জানতে পারি। এমনই একটি সেতুর ওপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমরা কেবল সেতুটিকেই জানি। এদিকের তটটিকে ধরতে পারি না, ওদিকের তটটিকেও নয়—কেবল দুয়ের মাঝে যে সেতুটি তৈরি

হয়ে রয়েছে, সেটিকেই ধরতে পারি। কিন্তু, আমাদের জীবনের সেতুটি কি? আহার, শরীর, ইন্দ্রিয়, শ্বাসপ্রশ্বাস, ভাষা এবং মন—এই ছটি হল আমাদের সেতু। আত্মা কি আহার করে? করে না। আপনারা সবই জানেন, আত্মা আহার করে না। তাহলে কি শরীর আহার করে? শরীরও আহার করে না। কিন্তু যখন আত্মা এবং শরীরের মাঝে এক সেতু তৈরি হয়, তখন আহার সম্পন্ন হয়।

কে বলে? আত্মা কি বলে? আত্মার তো বলার প্রয়োজন নেই। আত্মার কোন ভাষাই নেই। আত্মা রয়েছে সেই স্থিতিতে, যেখান থেকে যাবতীয় স্বর ফিরে আসে—'সব্বে সরা নিয়ট্টন্তি।' যেখানে শব্দ পৌঁছতে পারে না। যেখানে কোন তর্ক নেই—'তক্কা তত্থ ন বিজ্জই।' যেখানে কোন মনন বা চিন্তা নেই—'মই তত্থ ন গাহিয়া।' যেখানে কোন স্মৃতি নেই। যেখানে কোন কল্পনা নেই। ঐ বিন্দুর নাম হল—আত্মা বা অস্তিত্ব।

কে বলে? শরীর কি বলে? শরীর বেচারী তো জড়। সে আবার কি বলবে? সে বলতে পারে না। আত্মা বলে না, শরীর বলে না, বলে ঐ সেতু। আহার করে ঐ সেতু। সেতু আহার করে, সেতু বলে এবং সেতুই চিন্তা করে। ঐ সেতুই ওপরেই আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এখন আমাদের স্থির করতে হবে, আমরা কোন্ দিকে যাব? এদিকে যাব, না, ওদিকে যাব? নিজেদের অস্তিত্বের পথে যাব, না জীবনের পথে যাব? এই পছন্দটা আমাদেরই করতে হবে। এই পছন্দেরই নাম হল, সাধনার চিন্তা করা। এই পছন্দের বিন্দুটি হল সাধনার বিন্দু। মানুষ চাইলে এদিকে যেতে পারে, আবার ওদিকেও যেতে পারে। অস্তিত্বের গতি হল এক রকম গতি। আবার, জীবনেরও গতি এক রকমের গতি। এই হল ছটি তট এবং এই ছুই তটের মাঝে রয়েছে একটি সেতু। এই সেতুটিকেই আমাদের নির্ণয় করতে হবে এবং সেটিই হবে আমাদের সাধনার মুখ্য বিষয়। সাধনার মুখ্য বিষয় হল, সেতুটির

ওপর দাঁড়িয়ে দেখা। উভয় দিকেই উঁকি মারা। উভয়ের পরিণাম দেখা। দুয়ের পরিণাম বা ফলাফলের সমালোচনা করা, দুয়ের পরিণাম বিচার করা এবং বিচারের পর স্থির করা, কোন্ দিকে যাওয়া আমার পক্ষে হিতকর এবং কোন্ পথ অহিতকর।

ভগবান মহাবীর এই বিচারটিকেই স্পষ্টভাবে দিয়েছিলেন। তাকে সাধন-পদ্ধতি বলি কিংবা যোগ বলি, অথবা যে নামেই তাকে অভিহিত করি, মূলত তা হল নিজের অস্তিত্বের দিকে যাবার বিচার। এই অস্তিত্বের দিকে অগ্রসর জন্য ভগবান মহাবীর যেমন স্পষ্ট দিক, স্পষ্ট বিচার এবং প্রখর গতি দেখিয়েছেন, তেমনটি খুব কম মানুষই দিয়ে থাকবেন।

প্রথম পদক্ষেপ : বিবেক-প্রতিমা

চেতনার জাগরণের প্রথম বিন্দুটি কি? প্রথম বিন্দু হল, বিবেক। বিবেক-প্রতিমা, উৎসর্গ-প্রতিমার কথা সূত্রগুলিতে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। বিবেক-প্রতিমার অনুশীলন আজ আমরা করি না। কিন্তু মুনিদের পক্ষে ধর্ম-জাগরণের সময়, পূর্ব রাত্রিতে এবং তৎপরবর্তী রাত্রিতে ঐ বিবেক-প্রতিমাকে অভ্যাস করা, স্বীকার করা এবং অনুশীলন করা অবশ্য-কর্তব্য বলে বিবেচিত হতো।

এই বিবেক-প্রতিমা কি? বিবেক কোথা থেকে আমরা আরম্ভ করব? একটি মাধ্যমের দ্বারা দুটি ভিন্ন বস্তুর সঙ্গম হচ্ছে। একদিকে প্রাণ এবং জীবনের শক্তি, আর অন্যদিকে অস্তিত্বের শক্তি, আত্মার শক্তি। অস্তিত্ব এবং প্রাণ, এই দুয়ের সঙ্গম হচ্ছে, মিশ্রণ হচ্ছে এবং আমাদের মধ্যে এই দুয়ের একতা ঘটছে। আমাদের অনুভূতি এমনই যে আমরা অস্তিত্বকে প্রাণের দৃষ্টিতে দেখি এবং প্রাণকে দেখি অস্তিত্বের সঙ্গে। এই দুয়ের ভেতরে বিবেক করা, উভয়ের পার্থক্য বোধ করা, পৃথকত্ব বোধ করা, ভেদজ্ঞান করা—এই হল আমাদের বিবেক।

বিবেক হল আমাদের সাধনার প্রথম বিন্দু। বিবেকের পরে

আমাদের গতির মোড় ফেরাতে হবে। ঐ মোড়ে আপনি যেসব মোড়ের দেখা পাবেন, সেগুলি ক্রমশ আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে আসবে।

প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন : ক্রিয়মান হিংসা হিংসা হয় না। স্মৃতির হিংসাই হিংসা হয়—এটা কিভাবে হয়?

উত্তর : ক্রিয়মান হিংসা হিংসা হয় না, এ কথা আমি বলেছি। স্মৃতির হিংসা যতটা প্রবল, ক্রিয়মান হিংসা ততটা প্রবল হয় না। বর্তমানের যে ঘটনা, তা হিংসা ঠিকই, কিন্তু তা হিংসার মূল নয়। হিংসার মূল হল স্মৃতি। যদি মনে হিংসার সংস্কার না থাকে এবং হিংসার সংস্কার স্মৃতিরূপে জাগ্রত না হয় তাহলে বর্তমানের হিংসা কিছুই করতে পারে না। বর্তমানে যে মানুষটি হিংসায় আচ্ছন্ন, সে এই জন্য হিংসা করছে কারণ তার মনে রয়েছে হিংসার সংস্কার। ঐ হিংসায় সংস্কারের স্মৃতি জাগ্রত হচ্ছে। বর্তমানের হিংসাটা ঐ কারণেই। এই জন্যই হিংসার মূল দোষ এবং বড় দোষ হল স্মৃতি—বর্তমানের ঘটনা নয়। এটি হল ওর এক পরিণাম। যেখানে নিবারণের প্রশ্ন রয়েছে, সেখানে আমাদের চেতনার যেমন যেমন ঊর্ধ্বারোহণ হবে, হিংসাও তেমন তেমনভাবে আপনা থেকেই শেষ হয়ে যাবে। হিংসা ছাড়লে হিংসা শেষ হয় না, ত্যাগ করলে বা না করলেও তা সমাপ্ত হয় না। চেতনার জাগরণ ঘটলে আপনা থেকেই তা শেষ হয়ে যায়, কারণ তাতে হিংসার সংস্কার সমাপ্ত হয় এবং সংস্কার সমাপ্ত হলে স্মৃতি এবং ঘটনা হয় না।

প্রশ্ন : ঊর্ধ্বারোহণ, না চেতনার জাগরণ, কোনটা করা উচিত? শয়তানেরও চেতনা রয়েছে, কিন্তু সেই চেতনা হয় অধোগামী। উচু স্তরের ব্যক্তির চেতনা ঊর্ধ্বগামী হয়, কিন্তু এই দুয়ের মধ্য স্তরে যে ব্যক্তিটি রয়েছে তার চেতনার তো এতটা বিকাশ হয় না। এই

মধ্যবর্তী ব্যক্তিটির চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ, না জাগরণ, কোন্‌টা করা উচিত ?

উত্তর : কথাটা ঠিকই। চেতনার জাগরণ হল মধ্যবিন্দু। এদিকে রয়েছে নিদ্রা এবং ওদিকে রয়েছে ঊর্ধ্বারোহণ। নিচে যাওয়া, ওপরে যাওয়া। মাঝের বিন্দুটি হল জাগরণ। জাগরণ-বিন্দুতে যে চেতনা চলে যায় তার ঊর্ধ্বারোহণ শুরু হয়ে যায়, আর জাগরণ-বিন্দুর এদিকে যা থাকে তার নিম্নগমন হতে থাকে। আমি আগেই বলেছি, সেতুর ওপরে দাঁড়িয়ে মানুষ বিবেক করে। ঐ বিবেক হল জাগরণ। যখন তার জাগরণ ঘটে তার পরেই চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ শুরু হয়ে যায়। এদিক থেকে প্রস্থান শুরু হল তো ওদিকে অভিযান শুরু হল।

প্রশ্ন : যার মধ্যে শক্তি জাগ্রত হয়েছে, তার পক্ষে খুব সহজে ঊর্ধ্বারোহণ সম্ভব। কিন্তু, ঊর্ধ্বারোহণের প্রয়োজন কি ?

উত্তর : সুপ্ত শক্তি কোন কাজ করে না, তা একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়। শক্তিকে জাগানো হল এক ব্যাপার, আর শক্তিকে দিক-গামী করা হল অন্য ব্যাপার। শক্তি জাগ্রত হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন হল দিকের। গতি কোন্‌ দিকে, কোন্‌ দিকে চলেছে ? যে শক্তি শয়তানের অর্থাৎ অহং-বোধ এবং অহঙ্কারের যে শক্তি—যা অহঙ্কার এবং অহং-বোধকে জাগিয়ে তোলে, আমরা এই ভাষায় তো বলতে পারি, ঐ শক্তি জেগে উঠেছে। কিন্তু সেটা তো মূর্চ্ছার প্রবল প্রচেষ্টা। 'জাগরণ' শব্দটি দিয়ে তাকে আখ্যাত করা যায় না। মূর্চ্ছাও শক্তি। আমরা জানি, মানুষের যখন আকস্মিক পতন ঘটে, তখন তার শক্তি বেড়ে যায়। শক্তি আছে, কিন্তু তা জাগ্রত শক্তি নয়—তা হল মূর্চ্ছা-শক্তি। মূর্চ্ছা-শক্তি প্রকট হলে মানুষ আরও নিচে নেমে যায়। সে তখন যেসব কাজ করে তা জাগরণের সময়ে করে না।

প্রশ্ন : সেতুটি কে নির্মাণ করেছে ?

উত্তর ঃ কে সেতুটি তৈরি করে, এ বড় এক জটিল প্রশ্ন। কারণ নির্মাণের প্রসঙ্গটি যখন ওঠে, তখন প্রথম যে কথাটি আসে ঃ এই জীবন কবে থেকে শুরু হয়েছে। আত্মার অস্তিত্ব বা চেতনা কবে থেকে হয়েছে? কে করেছেন? সেই ধাঁধাঁ-জড়ানো প্রশ্ন ঃ আগে ডিম হয়েছে, না আগে মুরগী হয়েছে? দুয়ের মধ্যে আগে হয়েছে কোন্‌টি? এই নির্মাণ-প্রসঙ্গ স্থগিত রাখাই ভাল। এ কথা আমাদের বুঝতে হবে, অস্তিত্বের কোন আদি বিন্দু নেই। জীবনেরও কোন আদি বিন্দু নেই। অস্তিত্ব এবং জীবন যখন আদি বিন্দু প্রাপ্ত হয় না, তখন নির্মাণও আদি বিন্দু প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ অস্তিত্ব এবং জীবন দুই-ই খোলা রয়েছে। উভয়ই মিশ্রিত রূপে চলে আসছে এবং মিশ্রণ থেকেই এই নির্মাণ আপনা থেকেই হচ্ছে। এই কারণেই আদি বিন্দুর সন্ধানকে বাস্তবে অব্যক্ত বলে ধরা হয়।

কবে বাড়ি তৈরি হয়েছিল ঠিক নেই। পঞ্চাশ বছর আগে তৈরি বাড়িও দেখা যায়। এমন বাড়িরও খোঁজ পাবেন যা আমাদের জন্মের আগে তৈরি হয়েছে। কয়েক প্রজন্ম আগে তৈরি বাড়িও পাওয়া যায়। বাড়ি তৈরির নির্মাণ-কৌশল দেখি নি, তৈরি করাও দেখি নি, কিন্তু বাড়িটাকে আজও আমরা দেখছি। সেজন্যই বাড়িটি ঠিকভাবে বানানো হয়েছে, না কোন ভুল হয়েছে, তা আমরা আলোচনা করতে পারছি। কিভাবে বাড়িটি তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে আলোচনা করা আমাদের কাজ, যেহেতু বাড়িটিকে আজও আমরা দেখছি। বাড়িটি তৈরির ব্যাপারটি কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি।

যে সেতুটি তৈরি হয়েছে তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেতুটি সম্বন্ধে নির্ণয় করাই আমাদের কাজ, কিন্তু সেতুটির নির্মাণ প্রসঙ্গ আমাদের জানা নেই। সেতুর এ ধারে যেতে হবে, না ওধারে যেতে হবে, তা চিন্তা করে দেখতে পারি। সেতু তৈরি হয়ে আছে। নদীর সেই সেতু কবে তৈরি হয়েছিল তা আমরা দেখি নি। সেতুর এ

পারে যেতে হবে, না ওপারে যেতে হবে, তা স্থির করা তো আমাদের কাজ হতে পারে। কিন্তু সেতুর নির্মাণ বা নির্মাণকার্য দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : যদি আত্মা শব্দাতীত এবং মন জড় হয় তাহলে কে বিবেকের নির্ণয় করবে ?

উত্তর : আমরা জানি, নির্ণয় করার জন্য শব্দের প্রয়োজন পড়ে না এবং যেখানে আমাদের শব্দের প্রয়োজন পড়ে না, সেখানেই বাস্তবে সঠিক নির্ণয়কার্য সম্পন্ন হয়। শব্দের খুব বেশি প্রয়োজনও নেই। আমরা স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নে কি কোন শব্দ থাকে ? স্বপ্নে একটি ব্যক্তি বা বস্তুকে দেখা যায়। আমি স্তম্ভটিকে দেখছি। এটি দেখার জন্য শব্দের কোন প্রয়োজনই নেই। যেখানে দেখেও কিছু হয় না, সেখানেই কেবল শব্দের প্রয়োজন পড়ে। এজন্যই বৌদ্ধরা বিকল্পকে অপ্রমাণ বলেছিলেন। ওঁরা বলতেন, 'নির্বিকল্পং প্রত্যক্ষং প্রমাণং'—যা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ, তাই-ই হল প্রমাণ। যেখানে প্রত্যক্ষে শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেখানে প্রমাণ খণ্ডিত হয়ে যায় —অর্থাৎ অপ্রমাণ হয়, প্রত্যক্ষ আর থাকে না। অনুমানও তার প্রমাণ নয়। কেবল উপচারঘটিত প্রমাণ বলে তাকে ধরা হয়। যা নির্বিকল্প এবং শব্দাতীত, বাস্তবে সেটিই প্রমাণ।

আমাদের দর্শনে শব্দের কোন প্রয়োজন পড়ে না। এক অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী যা দেখেন, তাতে শব্দ হয় না, কেবল সাক্ষাৎ হয়। শব্দের মাধ্যম তো আমাদের দুর্বলতা। এই ক্র্যাচ আমি হাতে নিয়েছি, কারণ তা না হলে আমাকে নেংচে চলতে হতো। আমাদের চোখে জ্যোতি নেই, তাই চশমা পরি। এগুলি আমাদের শক্তি নয়, বরং দুর্বলতা এবং পরাশ্রয়ীতা। বাস্তবে শব্দের কোন প্রয়োজন হয় না। নির্ণয় আমরা করি এই কারণে যে, আমাদের ভেতরে একটা জ্যোতি উঁকি দিচ্ছে। এতেই আমাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এখন যদি আমাদের অস্তিত্ব বাস্তবে শব্দ পর্যন্ত সীমিত হয় তাহলে আমাদের এই

নির্ণয় নেবার শক্তিও শেষ হয়ে যেত। আমরা ভৌতিক বাতাবরণে থেকেও অস্তিত্ব, আত্মা এবং চেতনার কথা বলি। এতেই প্রমাণ হয় যে আমাদের ভৌতিকতার নিচে লুকোনো রয়েছে এক প্রখর জ্যোতি; জ্যোতির নির্ণয় নিচ্ছে এবং তা আমাদের বাইরেটা পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে। ঠিক যেমন ঘরের ভেতরে যখন বিজলী-বাতি জ্বলে তখন বাড়িতে যে ছিদ্রগুলি আছে—তা সে দরজারই হোক বা খিড়কির হোক—সেগুলি দিয়ে বাইরে সেই আলোর প্রকাশ ঘটে। ছিদ্র দিয়ে আলো বাইরে উঁকি দেয়। চেতনার ওপরে রয়েছে আবরণ। চেতনার আলো ছিদ্রের ভেতর দিয়ে বাইরে আসে। সেটিই হয় আমাদের নির্ণয়। এই কারণেই আমরা বাইরে থেকে ভেতরে এবং সেতুর অপর পারে যাবার প্রেরণা লাভ করি।

প্রশ্ন : জাগরণকে সাধনার ফলিত ধরব, না সাধনার আদি বিন্দু বলব ?

উত্তর : বাস্তবে জাগরণ হল সাধনার আদি বিন্দু। এই অর্থে একে ফলিতও বলা যায়। যে দীপ একবার জ্বলে তা কখনও নেভে না। ওটা হল অখণ্ড জ্যোতি। অনির্বাণ জ্যোতি। যে জ্যোতি একবার প্রজ্বলিত হয়েছে তা কখনও নেভে না। চেতনার শিখা তো কখনও নেভে না। জাগরণ হল চেতনার ঊর্ধ্বারোহণের আদি বিন্দু। প্রতিটি মানুষের কাছেই রয়েছে শক্তির ভাণ্ডার। শক্তির সঞ্চয় থাকে। তাকে আমাদের পরিভাষায় বলি লব্ধি। শক্তি পাওয়াটা আমাদের প্রশ্নের বিষয় নয়, প্রশ্ন হল শক্তি প্রয়োগের, যাকে বলা হয় করণবীর্য অর্থাৎ ক্রিয়াত্মক প্রয়োগ করা। শক্তির প্রয়োগ করা। যাঁর মধ্যে জাগরণ ঘটে, চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ এবং প্রয়োগ যার মধ্যে সম্ভব হয়, তাঁর শক্তি প্রয়োগ ঊর্ধ্বদিকে হতেথাকে, আর যাঁর জাগরণ হয় না, যিনি নিদ্রিত থাকেন, তাঁর শক্তি প্রয়োগ হয় অধোগামী। প্রয়োগের এই হল দুটি দিক। শক্তিতে কোন তারতম্য নেই এবং উভয় ক্ষেত্রেই শক্তির সঞ্চয় সমান রূপে হয়।

প্রশ্ন ঃ শক্তিকে কেন জাগরিত করা উচিত ?

উত্তর ঃ চেতনাকে আমরা কোন্ দিকে নিয়ে যেতে চাই, এর মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে। আরও ওপরে নিতে হবে, না নিচে নিতে হবে ? আমাদের চিন্তা, বিচার এবং আচরণকে কোন্ দিকে নিয়ে যেতে হবে ? আমাদের এখানে দুটি শব্দ রয়েছে—একটি হল স্বর্গ এবং অন্যটি নরক। আপনি স্বর্গের জীবন চান, না নরকের জীবন চান ? দুটি চলে প্রতীকের রূপে। একটি হল সেই জীবনের, যেখানে জীবন সমাপ্ত হয়ে যায়। অন্যটি হতে পারে, জীবনের অসফলতা বা জীবনের অধোগামী হবার। প্রশ্ন হল, আমরা কি চাই। প্রতিটি মানুষই উন্নতি চায়, জীবনে সফল হতে চায়, সঠিক হতে চায়, জীবনে ধন্য হতে চায় এবং জীবনে মহান হতে চায়। এই মহত্ব, জীবনের সফলতা, জীবনের ধন্যতা এবং সার্থকতা হল এক দিকে, আর এর ঠিক বিপরীতে, উল্টোদিকে রয়েছে জীবনের অসফলতা, ব্যর্থতা এবং নিরর্থকতা। প্রতিটি মানুষই জীবনের উচ্চ স্তরে যেতে চাইবে। প্রত্যেকেই চায় জীবনে সফল হতে, সার্থক হতে, ধন্য হতে এবং মহান হতে। এই মহত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় শক্তি-সঞ্চয় এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে।

তাহলে এ কথা আমরা স্পষ্ট বুঝে নিলাম যে শক্তির, চেতনার ঊর্ধ্বারোহণের প্রচেষ্টা করলে, ঐ দিকে চেতনাকে নিয়ে গেলে জীবনে মহত্ব, সফলতা ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এর বিপরীতে চললে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হতে হয়। সেইজন্য জীবনে সফলতার জন্য, সার্থকতার জন্য নিজের শক্তিকে সেই দিকে নিয়ে যেতে চাই, সেই দিকে নিয়োজিত করতে চাই। সাধনার এই বিশিষ্ট দিকটিকেই আমাদের বেছে নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ শ্বাস সম্বন্ধে জ্ঞান যদি আমরা প্রথম থেকে শুরু না করি তাহলেও কি আমাদের সাধনা শ্রেষ্ঠ হবে ?

উত্তর ঃ বিবেক বহুবার জাগে, কিন্তু একটি মাত্র বিন্দুতে তা

সম্পূর্ণ হয় না। অন্ধকারে যেখানেই প্রবেশ করছেন, সেখানেই অন্ধকার হচ্ছে। যেখানে বসে আছেন, সেটিও অন্ধকার, আবার কম করে এক মাইল এগিয়ে গেলেও ঐ অন্ধকার থাকবে। কিন্তু এ তো খুব ছোট উদাহরণ। কলকাতার প্রথম প্রান্ত এবং শেষ প্রান্তের দূরত্ব কম করে দশ মাইল হবে। এই দশ মাইলের মধ্যে সব জায়গাকেই কলকাতার মধ্যে ধরা হয়। এই রকম, বিবেকও রয়েছে সর্বত্র। আমাদের বুঝতে হবে, যে বিন্দু থেকে আমরা চলা শুরু করেছি তাও বিবেক, আর যে বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছব তাও হবে বিবেক। বিবেকের যে বিন্দুতে সাধনা শুরু করেছিলাম, তাও যেমন বিবেক ছিল, তেমনি শ্বাসের ওপারে যে বিবেক পাওয়া যাবে, তাও বিবেক। যদি শ্রেষ্ঠই হতো, তাহলে শ্বাসের বিবেক করতে হবে একথা আমরা ভাবতামই না। সেই কারণেই শ্রেষ্ঠ না হলেও পদ্ধতি বিভিন্ন হয়। সাধনপদ্ধতিতে সঙ্কল্প করাও সাধনার এক বিবেক। কেউ কেউ সঙ্কল্পকে মজবুত করতে মনস্থ করেন এবং ভাবেন, শ্বাসকে আটকানোর কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই। অবশ্য, ব্যক্তির সঙ্কল্প বড় হলে শ্বাসের যাবতীয় প্রক্রিয়াই সহজভাবে ফলিত হয়।

রুটি যিনি তৈরি করছেন, তিনি জানেনই না গমের আটায় কি কি রয়েছে। যিনি তা খাচ্ছেন, তিনিও তা জানেন না। কিন্তু রুটি যিনি খাচ্ছেন তিনি আপনা থেকেই প্রয়োজনীয় প্রোটিনটুকু পেয়ে যাচ্ছেন, আটার মধ্যে আর যা যা সার পদার্থ রয়েছে তা তিনি পেয়ে যান। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটা দিক হল ঘটা এবং অন্য দিক হল যা ঘটবে তা জানা। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কোন সত্যকে গ্রহণ করতে পারি এবং তা আপনা থেকেই ফলিত হয়। তেমনি সঙ্কল্প যদি আপনি গ্রহণ করেন, সঙ্কল্পকে দৃঢ় করেন, তাহলে শ্বাস-সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা আপনা থেকেই আপনার মধ্যে ফলিত হবে। এজন্যই যোগাচার্যরা বলেছেন, শ্বাস, মন এবং বিন্দু (বীর্য)—এই তিনের

মধ্যে যে কোন একটিকে ধরতে পারলে বাকি দুটি আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রণে আসে। শ্বাসকে যিনি বুঝেছেন অথচ মনকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা যিনি করেন নি, তিনিও মনের যাবতীয় ঘটনা আপনা থেকেই বুঝতে পারবেন। কেউ মনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, অথচ শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন নি, তিনিও মনকে নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প লাভ করলে আপনা থেকেই শ্বাসের যাবতীয় স্থিতিকে বুঝতে পারবেন।

একটি গ্রামে যাবার পঞ্চাশটি রাস্তা আছে, কিংবা একটি বাড়িতে ঢোকার পঞ্চাশটি দরজা আছে। এর যে কোন একটি দিয়ে আপনি প্রবেশ তো করুন। ভেতরে যাবার চেষ্টা করুন। যে কোন একটি দরজা দিয়েঁ বাড়িতে ঢুকতে পারলে সারা বাড়িতেই ঘোরা যায়, কোন বাধা তখন থাকে না। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—যে দিক থেকেই হোক না কেন, আসলে বাড়ির ভেতরেই আমাদের ঢুকতে হবে।

২.

অমূল্যের মূল্যায়ন

- শব্দের মূল্যায়নই হল অমূল্যের মূল্যায়ন ;
- শ্বাসের শারীরিক মূল্য—
    - মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতা।
    - রক্তের গতিশীলতা।
    - জীবনযাত্রার অন্যতম পাথেয়।
- শ্বাসের আধ্যাত্মিক মূল্য—
    - চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ।
    - অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভ।
    - সতত জাগরণের অবস্থিতি।

বড় ত্যাগী কে?

একটা গল্প দিয়ে আজ নিজের কথা শুরু করছি। এক ছিলেন রাজা। আর ছিলেন এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী ছিলেন অপরিগ্রহী। উনি ছিলেন নগ্ন। তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। তপস্বী মানুষ। সাধারণের মধ্যে ওঁর প্রচুর সুখ্যাতি ছড়িয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ ওঁর কাছে আসতে শুরু করেছিল। রাজার কানেও কথাটা গেল। তাঁর মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগল। তিনি সন্ন্যাসীর কাছে এলেন। সন্ন্যাসীকে দেখলেন। আশেপাশের পরিবেশও দেখলেন। দেখে রাজা খুবই প্রভাবিত হলেন।

রাজার মনে সন্ন্যাসীর তপস্যার, তাঁর ত্যাগের অসাধারণ প্রভাব পড়ল। এক দিন উনি বললেন, 'গুরুদেব! আপনি তো বিরাট

ত্যাগী পুরুষ। আপনার তো কাপড়-চোপড় নেই, বাড়ি নেই, পয়সা নেই, কিছুই নেই। কত বড় ত্যাগী আপনি!' এই বলে রাজা সন্ন্যাসীর খুব প্রশংসা করতে লাগলেন।

সন্ন্যাসী খুব গম্ভীর হয়ে রাজার প্রশংসাবাণী শুনছিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা চুপ করলে উনি বললেন—'রাজা! আপনি আমার প্রশংসা করছেন, কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে বাস্তবে আমার ত্যাগ আপনার ত্যাগের কাছে খুবই তুচ্ছ। আপনি অনেক বড় ত্যাগী।'

রাজা অবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন, তা কেমন করে হয়? আমি কি করে ত্যাগী হতে পারি? এত বড় রাজ্যের ঐশ্বর্য এবং বৈভব আমি ভোগ করছি, আর গুরুদেব বলছেন, আমি বড় ত্যাগী! তা কেমন করে হয়? রাজা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না কথাটা। জিজ্ঞাসা করলেন—'গুরুদেব! আমি ত্যাগী হলাম কি করে? ত্যাগী তো আপনি।'

সন্ন্যাসী বললেন—'রাজা, আমি যা কিছু ত্যাগ করেছি তা বৃহত্তের জন্য—তার পরিমাণ সামন্যই। আমি পরমাত্মা হতে চাই, পরমাত্মার ঐশ্বর্য পেতে চাই। তা পাবার জন্যই আমি ত্যাগ করেছি। আমার ত্যাগ খুব সামান্যই এবং তা অনেক কিছু পাবার জন্যই ছেড়েছি। আর তুমি অনেক বেশি ছেড়ে সামান্যতেই মুগ্ধ হচ্ছ। এবার বল, ত্যাগ কার বড়—তোমার, না, আমার?

কথা শুনে রাজা মাথা নত করলেন।

শ্বাস অমূল্য

সত্যি বলতে কি, এই প্রশ্ন আমারও মনে জাগে। আবার সব-গুলির জন্য শ্বাসের মূল্য আমরা জানি না। শ্বাসের মূল্য যিনি জানেন না, তিনি প্রকৃতপক্ষে অনেক ছেড়ে অন্নের উপাসনা করছেন। সাধনক্ষেত্রে এসেও যিনি শ্বাসের মূল্যায়ন করেন না, তিনি বাস্তবে আত্মার মূল্যায়ন করেন না, পরমাত্মার মূল্যায়ন করেন না।

তিনি বহুর জন্য প্রকৃতপক্ষে ছোটতে বা অল্পে মুগ্ধ হচ্ছেন। আপনি ভাবছেন, শ্বাসের কি এমন গুরুত্ব আছে। বাস্তবে তো শ্বাস এক ভৌতিক বস্তু। আমাদের শরীরে এক অংশমাত্র। তার এত দাম কেন? আমি ভেবেছিলাম, এই ব্যাপারে কিছু বলতে গিয়ে বলব, মূল্যকে নয়, আমাদের অমূল্যের মূল্যায়ণ করতে হবে। আমার বিষয়টির শিরোনাম হবে—'অমূল্যের মূল্যায়ণ'। বাস্তবে শ্বাস আমাদের পক্ষে অমূল্য জিনিস। তারই মূল্যায়ণ করতে হবে।

আমাদের জীবনে খাদ্যের দাম অনেক। আহার ছাড়া আমরা কেউ বাঁচতে পারি না। আমাদের জীবনে জলেরও মূল্য অনেক। জল ছাড়াও আমরা কেউ বাঁচতে পারি না। শ্বাসেরও মূল্য আমাদের জীবনে অনেক। শ্বাস ছাড়া আমরা কেউ বাঁচতে পারি না।

নিজের চোখেই দেখেছি, খাদ্য ছাড়াও মানুষ কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে। জল ছাড়াও কিছুদিন মানুষকে বেঁচে থাকতে দেখেছি। কিন্তু শ্বাস রাড়া কয়েক মাস, কয়েক দিন, কয়েক ঘণ্টার কথা বাদ দিন, কয়েক মিনিটও বেঁচে থাকা যায় না। পাঁচ মিনিট শ্বাস না নিলে জানি না কি হবে। তাহলে মূল্য কার বেশি? খাদ্যের বা জলের, না শ্বাসের?

আমি জানি, সকলেই স্বীকার করবেন, খাদ্য বা জলের চেয়ে শ্বাসের মূল্য অনেক বেশি। কিন্তু যে মূল্য আমরা দিই, তাও খুবই সামান্য। আমরা শ্বাসের শারীরিক মূল্যকেই ধরি। ধরি ভৌতিক মূল্যকে। কিন্তু শ্বাসের মূল্য এর চেয়ে অনেক বেশি।

প্রথমে রয়েছে শ্বাসের শারীরিক মূল্য, তারপরে আসে শ্বাসের আধ্যাত্মিক মূল্য। শ্বাসের আধ্যাত্মিক মূল্য খুবই বেশি। সাধনার ক্ষেত্রেও এত বড় উপযোগী তত্ত্ব খুব কম আছে।

যে কথাটার উপর আমি খুব বেশি করে জোর দিয়ে থাকি তা হল: যত বেশি সম্ভব শ্বাসকে অভ্যাস করুন এবং তাকে বোঝার

ও জানার চেষ্টা করুন। চেষ্টা করলে কিছু কিছু রহস্যের দুয়ার আপনার কাছে উন্মুক্ত হবে। আরও অনেক রহস্য এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। যেদিন ঐ রহস্যের সম্পূর্ণটা আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হবে, সেদিন আমরা যে কি হয়ে যাব, তা আমরা নিজেরাই জানি না। সেটা এক বিরাট বড় ব্যাপার হবে।

শ্বাসের শারীরিক মূল্য

শ্বাসের শারীরিক মূল্য আপনারা জানেন। শরীরবিদ্যার দৃষ্টিতে, শ্বাস ছাড়া আমাদের মাংসপেশীগুলি গতি লাভ করে না, শরীরে ক্ষমতাও উৎপন্ন হয় না। আমাদের মস্তিষ্কের তন্তুগুলি মরে যায়। আমাদের হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়, আমরা মরে যাই। এই হল শ্বাসের শারীরিক মূল্য।

শ্বাসের আধ্যাত্মিক মূল্য

শ্বাসের আধ্যাত্মিক মূল্য হল—চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ, প্রাতিভ-জ্ঞান লাভ, অপ্রমাদ বা সতত জাগরণের অবস্থা। শ্বাস সম্বন্ধে জ্ঞান ছাড়া এগুলি লাভ করা যায় না।

ভগবান মহাবীর বলেছিলেন—মুহূর্তের জন্যও প্রমাদ কোরো না। কথাটা খুবই ভাল। কিন্তু, মুহূর্তের জন্যও প্রমাদ না করা—তা কেমন করে সম্ভব? তার সাধনা কি? তার ব্যবহার কি? এর উপায় হল—শ্বাসের ওপরে যাবতীয় মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করা। বৌদ্ধদের মধ্যেও এই পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। তাঁরা একে 'আনাপানসতী' নামে অভিহিত করে থাকেন। শ্বাসের ওপরে সব দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করুন এবং প্রতি মুহূর্তে শ্বাসের সঙ্গে মনকে জুড়ে দিন। তাহলে মন অপ্রমত্ত থাকবে। জৈনদের মধ্যেও এই পদ্ধতির প্রচলন আছে। যিনি 'যথালন্দক মুনি'-তে পরিণত হন, তিনি প্রতি ক্ষণে জাগরিত থাকেন, এক মুহূর্তের জন্য তাঁর মধ্যে প্রমত্ততা আসে না। অপ্রমত্ত এই দশার মধ্যেই রয়েছে কায়োৎসর্গ বা শ্বাসের ওপরে যাবতীয়

চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করা। শ্বাসের জাগরণের এ হল এক সজাগ প্রহরী।

এক ছিল ভক্ত। বহু দূর পর্যন্ত সে এগিয়ে গিয়েছিল সাধনার পথে। তাঁকে একবার রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'ভাই! আপনি কি কখনও আমার কথা মনে করেন?' উনি বললেন—'ভগবানকে যখন ভুলে যাই তখন আপনার কথা মনে করি, কিন্তু ভগবানের স্মৃতি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আপনার কথা কখনই মনে করি না।'

এই রূপকের ভাষাতেই আমি বলব, ক্রোধ-অভিমান-দম্ভ-লালসা প্রভৃতি আবেগগুলি একবার এক সাধককে প্রশ্ন করল—'আমরা তোমার খুব পরিচিত সাথী। তুমি কখনও আমাদের মনে কর?' সাধক উত্তর দিলেন—'যখন শ্বাসকে ভুলে যাই তখন তোমাদের মনে পড়ে। শ্বাসের স্মৃতি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তোমাদের কথা মনে পড়ে না।'

শ্বাস এবং আবেগ

এ কেমন করে সম্ভব, এই প্রশ্ন উঠতে পারে। আমাদের শ্বাস যখন শান্ত থাকে, তখন কোন আবেগই আসতে পারে না। শ্বাস শান্ত থাকলে আবেগও শান্ত থাকে। শ্বাস ক্ষুব্ধ হলে আবেগেরও অবতরণ ঘটে। এই নিয়ম এমন সুনিশ্চিত যে, শ্বাসকে শান্ত রেখে আপনি ক্রুদ্ধ হতে চাইলে আপনি হতেই পারবেন না। ক্রুদ্ধ হওয়ার আগে আপনার শ্বাসের উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, তবেই ক্রোধ আসতে পারে। শ্বাস ক্ষুব্ধ না হলে ক্রোধ আসতে পারে না। কিরকম নিশ্চিত নিয়ম দেখুন।

মুদ্রা এবং মানস

যোগের একটি সিদ্ধান্ত হল—মুদ্রা এবং মানস। মুদ্রা এবং মানস অর্থাৎ মুদ্রার অনুকূল আবেগ আসবে আবেগের মুদ্রাটি সম্পন্ন হবার পর। আবেগ এলে তার অনুকূল মুদ্রা তৈরি হবে। দুয়ের মধ্যে একটি নিশ্চিত সম্বন্ধ রয়েছে। পদ্মাসনে বসে কেউ হত্যা করে এল, কিংবা

শান্ত রসে বসে কেউ খুন করে এল, এমন ঘটনা সারা পৃথিবীতে কোথাও দেখা যাবে না। হতে পারে না এমন ঘটনা। যিনি হিংসায় লিপ্ত হবেন, তাঁকে ক্রোধ-মুদ্রা তৈরি করতেই হবে। তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠবেই। চেহারায় আসবে একটি বীভৎসতার দৃশ্য। হাত কাঁপতে শুরু করবে, বাহুগুলি কাঁপতে থাকবে। এগুলি হলে তবেই কাউকে হত্যা করার আবেগ তাঁর মধ্যে তৈরি হবে, হত্যা করার ক্ষমতা তিনি অর্জন করবেন। অস্ত্র যিনি প্রয়োগ করতে চান, তিনি নিজেকে উত্তেজিত না করে এবং ঐ ধরনের মুদ্রা তৈরি না করে কিছুতেই তা প্রয়োগ করতে পারবেন না।

মানস এবং মুদ্রা—এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে খুবই গভীর এক সম্পর্ক। বৃহৎ কল্পসূত্রে একটি নিয়ম পড়েছি—সাধ্বীর সোজা হয়ে শুতে নেই, সাধু উপুর হয়ে শোবেন না। এই ব্যবস্থা কেন, তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মুদ্রা এবং মানসের সম্পর্কটা যখন আমার বোধগম্য হল, তখন বুঝতে পারলাম, চমৎকার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যবস্থাগুলি পালন কবার সুপারিশ করা হয়েছে। কামের মুদ্রা, চিন্তার মুদ্রা, ক্রোধের মুদ্রা প্রভৃতি মুদ্রাগুলি তৈরি হলে কাম, ক্রোধ, চিন্তা প্রভৃতি আবেগগুলি খুব সহজেই তাঁর মধ্যে নেমে আসে।

যে ব্যক্তি চিন্তিত, কেউ তাকে বলে না, তুমি এ রকম কর। মনে চিন্তা উদয় হলেই হাত মাথায় চলে যায়। মাথা চুলকোতে থাকবে, দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ হবে বা আকাশের দিকে চলে যাবে। কে এই মুদ্রা তৈরি করে? আমাদের অন্তঃস্থলে যে আবেগ এবং ভাব রয়েছে সেগুলিই এমন মুদ্রা তৈরি করে।

বিপরীত দিকে চলুন। ঐ ধরনের মুদ্রা করুন। করতে থাকুন। যেমন মুদ্রা সম্পন্ন করবেন, ঠিক তেমনি ভাব দেখা দেবে। মুদ্রা থেকে আবেগের অবতরণ ঘটে এবং আবেগ মুদ্রা তৈরি করে। এই দুয়ের সম্পর্ক এমন অটুট, এমন গভীর ও ঘনিষ্ঠ যে, একটি সম্পন্ন হবার পর দ্বিতীয় স্থিতিটি দেখা দেবেই।

মুদ্রা এবং মনের এই সম্পর্কটাকে যদি আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারি তাহলে আবেগ-সৃষ্টিকারী মুদ্রাগুলির ভেতরে জড়িয়ে পড়ব না। আমাদের শ্বাস শান্ত থাকবে। শ্বাস শান্ত থাকলে আবেগ তৈরি হবে না। যদি রাগ দেখা দেয়ও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আধ মিনিটের জন্য নাক বন্ধ করে রাখুন, রাগ শান্ত হয়ে যাবে। যদি বৃহদাকৃতির কোন আবেশ আসে, তাহলে মুহূর্তের জন্য কুম্ভক করুন, আবেশ চলে যাবে।

সুদর্শন পথ চলছিলেন। অর্জুনমালার সামনে এলেন। দেখলেন, সামনে মৃত্যু এগিয়ে আসছে। তখুনি উনি কায়োৎসর্গে দণ্ডায়মান হলেন। উপসর্গ এলে কায়োৎসর্গের এই যে বিধান দেওয়া হয়, এর রহস্য কি? রহস্যটি হল: কায়োৎসর্গ করলে আমাদের সামনে যেসব বিভীষিকা আসে, যেসব ঘটনা আসে এবং যা আমাদের মনকে বিচলিত করতে পারে, মনকে স্বতন্ত্র এবং মার্গচ্যুত করতে পারে, সেগুলির আবেগ শান্ত হয়। শান্ত স্থিতি আনয়নকারী প্রতিটি ঘটনাকে সামনে আনার পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা জাগ্রত হয় এবং উত্তেজক ঘটনাগুলিকে শান্তভাবে সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারি। ঐগুলিকে সহ্য করার ক্ষমতা অর্জনের জন্যই ক্ষেত্রবিশেষে কায়োৎসর্গের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে। আমাদের আচার্যরা একেই 'অভিভব কায়োৎসর্গ' নামে অভিহিত করেছেন। আগত বিপদের মোকাবিলার প্রস্তুতিই হচ্ছে এই 'অভিভব কায়োৎসর্গ'। কায়োৎসর্গ করলে শ্বাসের স্থিতি শান্ত হয়ে যায় এবং শান্ত স্থিতিতে কখনই আবেগের স্থিতি তৈরি হতে পারে না। গ্রহণ করার ক্ষমতাও এর মাধ্যমে বর্ধিত হয়।

ছয় প্রকার শ্বাস

আমাদের শ্বাসের কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে। একটি তো সাধারণ শ্বাস। প্রতিটি সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ষোল থেকে উনিশটি শ্বাস আসে। এগুলি হল আমাদের সামান্য শ্বাস। দ্বিতীয়টি হল

পূর্ণ শ্বাস বা গভীর শ্বাস। আর এক রকমের শ্বাস হল ক্ষুব্ধ শ্বাস। আর এক প্রকার হল শান্ত শ্বাস। এছাড়া রয়েছে সূক্ষ্ম শ্বাস এবং নিরুদ্ধ শ্বাস। এভাবে শ্বাসকে ছটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১. সামান্য শ্বাস।
২. পূর্ণ শ্বাস।
৩. ক্ষুব্ধ শ্বাস।
৪. শান্ত শ্বাস।
৫. সূক্ষ্ম শ্বাস।
৬. নিরুদ্ধ শ্বাস।

সামান্য শ্বাসের ব্যাপারটা আপনারা জানেন। পূর্ণ শ্বাস বা গভীর শ্বাস কি? যে শ্বাস আমাদের বুক ও পেট পর্যন্ত আসে, তা হল গভীর শ্বাস। ক্ষুব্ধ শ্বাস হল সেটি, যখন কঠোর পরিশ্রম করলেন এবং শ্বাসের মাত্রা সোল থেকে উনিশ পর্যন্ত যে অনুপাতটি রয়েছে তা বেড়ে বিশ, পঁচিশ কি ত্রিশ হয়ে যায়। সামনে কোন ভয়ের ঘটনা উপস্থিত হল এবং তার ফলে শ্বাসের গতি তীব্রতর হয়ে গেল। জ্বর হলেও শ্বাস বেড়ে যায়। জ্বর হলে প্রায়ই শ্বাস বাড়ে। শ্বাস শান্ত থাকলে জ্বর আসতে পারে না। এই যোগের একটি প্রক্রিয়ায় বলা হয়েছে যখন জ্বর আসছে বলে মনে হবে তখন নাভির ওপরে ধ্যান করলে শ্বাসের মাত্রা কমে যায় এবং শ্বাস কমে গেলে জ্বর বাড়তে পারে না। পরিশ্রম, ভয়, চিন্তা, উদ্বেগ এবং কিছু কিছু শারীরিক অসুস্থতায় শ্বাসের মাত্রা বেড়ে যায়। ঐটি হল ক্ষুব্ধ শ্বাস। এগুলি হল শারীরিক কারণ। দ্বিতীয়টি হল মানসিক কারণ। ক্রোধ, ভয়, লোভ, বাসনা, হিংসা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি কারণে আবেগ এলে তখনও শ্বাসের মাত্রা বেড়ে যায়।

ভারি হওয়ার ক্রমপর্যায়

প্রথম' প্রসঙ্গটি ছিল, জীব হিংসা ইত্যাদি কারণে ভারি হয়। যখন হিংসা বা মিথ্যার কথা আমরা ভাবি, তখন সবচেয়ে আগে

ভারি হয় আমাদের শ্বাস, তারপর ভারি হয় শরীর, তারপর ভারি হয় মন এবং সবশেষে ভারি হয় সংস্কার। এই হল ক্রমপর্যায়। এই ক্রমপর্যায়ের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কেউ ভারি হতে পারে না। শ্বাস ভারি না হলে পরবর্তী কোন জিনিসই ভারি হতে পারে না। সবচেয়ে আগে শ্বাস ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হয়, তারপরে অন্যান্য জিনিসগুলি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়। যে কেউ একে পরীক্ষা করতে পারেন। নিজের নাড়িকে দেখতে পারেন। যখন শ্বাস শান্ত থাকে, তখন শ্বাসের গতি থাকে ঠিক বা স্বাভাবিক, অর্থাৎ শ্বাসের গতি যতটা হওয়া উচিত, ঠিক ততটাই থাকে। তখন বুঝতে হবে, মনে কোন আবেগ নেই। আপনি পরীক্ষা করে দেখে নিন। আপনার মনে যখন কোন আবেগ আসে বা কোন দুর্ঘটনা সামনে আসে, চিন্তান্বিত হওয়ার মত কোন কথা আসে, তখন বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে যায় এবং নাড়ির গতিও অনেকটা বাড়ে, নাড়ি উত্তেজিত হয়ে পড়ে, আমাদের মনের প্রভাব ওদের ওপর পড়ে। এই হল আমাদের ক্ষুব্ধ শ্বাস। আজ পর্যন্ত কেউ এমন অবস্থা তৈরি করতে পারেন নি যে, মনে কোন চিন্তা এসেছে অথচ ব্যক্তিটির শ্বাস শান্ত রয়েছে। এমনটি হতে পারে না। এসব হয় ক্ষুব্ধ শ্বাসে। এজন্যই বলেছি, মুদ্রা এবং মনের সম্বন্ধ জানাটা আমাদের পক্ষে ভীষণ প্রয়োজন।

মুদ্রার মহত্ত্ব

যোগাচার্যরা ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রায় বসার বিধান দিয়েছেন। হাজার হাজার মুদ্রার এই যে বিধান তা মোটেই অকারণ নয়, তার পেছনে অনেক বড় অর্থ রয়েছে। কাব্যানুশাসনে নটি রসের বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যক্তির মধ্যে যখন শান্ত রসের অবতারণা ঘটে, তখন সহজেই তার মুদ্রা ঐ রকম হয়ে যায়। তার স্থায়ী এবং সঞ্চারী ভাবটিকে দেখুন, তার মধ্যে যে মুদ্রা তৈরি হবে তা আপনি নিজেও ঐ মুদ্রায় বসে অনুভব করুন। ঐ সময় আগত কোন ব্যক্তি

যদি আপনাকে দেখেন তাহলে তিনি মনে করবেন, আপনি শান্ত ভাবের অনুশীলন করছেন।

মহাবীরের মুদ্রাকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আচার্য হেমচন্দ্র লিখেছেন—

বপুশ্চ পর্যকশয়ং শ্লথং চ, দৃশেই চ নাসা নিয়তে স্থিরে চ।

ন শিক্ষিতেয়ং পরতীর্যার্থৈঃ জিনেন্দ্র! মুদ্রাপি তবান্যদাস্তাম্॥

ভগবান! লোকে যদি আপনার মুদ্রাগুলি না শেখে তাহলে কথাগুলি কি করে শিখবে? আপনার প্রদর্শিত আসনে শয়নরত শরীর, শিথিল শরীর এবং নাসাগ্রে নিবদ্ধ স্থির চক্ষু—এই মুদ্রা যদি অপরের না আসে, তাহলে আপনার আর কি কথা আসবে?

প্রশ্ন উঠবে, মুদ্রাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেন? বাস্তবে মুদ্রার এক বিরাট গুরুত্ব আছে। যদি আমরা একে ঠিকমত বুঝতে পারি, তাহলে যাবতীয় আবেগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের মধ্যে ভীষণভাবে বেড়ে যায় এবং আবেগগুলির হাত থেকে বাঁচার ক্ষমতাও আমাদের মধ্যে তৈরি হয়।

মহাবীরকে কিভাবে বুঝবেন?

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভগবান মহাবীর শ্বাসের প্রসঙ্গে এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন কি? প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জৈনদের আগমে এবং যাবতীয় সাধনপদ্ধতিতে শ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের কথা কোথাও লেখা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও একে এত গুরুত্ব দেওয়া হল কেন, এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। কিন্তু, প্রতিটি কথাকেই তো দুটি ভিন্ন ভিন্ন দিকে অনুধাবন করা যায়। একটা হল, সোজা ভাষা এবং অন্যটি হল তার ব্যাখ্যা। সোজাসুজি মহাবীর কখনও স্বরকে জয় করার বা শ্বাসের সাধনা করার কথা বলেন নি। কিন্তু তিনি যে সাধনা করেছিলেন, তা হল শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণেরই সাধনা। আমি এগুলিকে ব্যাখ্যা করে দেখেছি, ওগুলি শ্বাস-নিয়ন্ত্রণেরই সাধনা। এর আগে বলেছিলাম, মহাবীরকে বুঝতে হলে তাঁর

স্থিতিকে জানা প্রয়োজন। মহাবীরের 'স্থিতি' কথাটির অর্থ হল—মহাবীরের প্রদর্শিত মুদ্রায় বসা তাঁর ধ্যান-পদ্ধতিতে ধ্যান করা এবং মহাবীর যা যা করেছিলেন তা করা। এ কাজ যদি আমরা করি, মহাবীরের স্থিতির অনুরূপ স্থিতি যদি স্থাপন করি, যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করি, তাহলে মহাবীরকে কাছ থেকে বোঝার, তাঁর অনুভব সমূহকে দেখবার, তাঁকে দেখার খুব সহজ সুযোগ আমরা পেতে পারি।

মহাবীরের ধ্যানের সময় দুটি কথা আসত—'এগেপোগ্‌গলনিবিট্ঠ-বিট্ঠ' এবং 'অণিমিসনয়ণে'—এক অণুর ওপরে তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতেন। চোখে এমন উষ্মাভাব সঞ্চারিত হতো যে বাচ্চারা ভয় পেয়ে যেত, চিৎকার করে উঠে সেখান থেকে পালাত। 'আচারাঙ্গ সূত্রে এর' বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, 'হন্তা! হন্তা! বহবে কন্দিসু' —এ কি? এ কি? এ কথা বলতে বলতে চিৎকার করতে করতে বাচ্চারা পালাত। কেন এমন হতো? এর ব্যাখ্যা কি? ভাষার সাহায্যে একে জানা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র অনুভবই আমাদের ঐ স্থিতিতে পৌঁছে সব কিছু বুঝতে সাহায্য করে। ভাষায় কেবলমাত্র এটুকু বলা হয়েছে: একটিমাত্র অণুর দিকে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে এবং দৃষ্টিকে রাখতে হবে অপলক। ব্যস্, ঐটুকু পর্যন্তই। কিন্তু ঐ স্থিতিতে পৌঁছেই ঐ ভাষার অর্থকে অনুভব করা যায়।

এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কথা জানি। উনি প্রেতাত্মাকে আনতে পারতেন। অনেক প্রেতাত্মাকে ডেকে আনতেন। কিছু দিন পরে উনি মারা গেলেন। তারপর ওঁর এক সঙ্গী তাঁরই প্রেতাত্মাকে ডাকলেন। প্রেতাত্মা এল। উনি বললেন, 'তুমি তো এখন পরলোকগামী, নিজের অনুভূতি বল।' প্রেতাত্মা বলল, 'মরার পর আমার যে অনুভব লাভ হয়েছে, জীবন্ত অবস্থায় তুমি তা পেতে পার না।'

মহাবীরের স্থিতিতে পৌঁছে যাবার পর যে অনুভূতি লাভ করা

যায়, ঐ স্থিতিতে না পৌঁছে তা লাভ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ঐ অনুভূতিকে বোঝাও অসম্ভব। কিন্তু সেগুলিকে বোঝানোর জন্য কিছু কিছু ব্যাপার আমি ব্যাখ্যা করব।

ত্রাটকের দুটি পরিণাম

ধ্যানকারী যে কোন মানুষ দেখতে পারেন, আমরা যদি একটি বিন্দুতে নিজেদের চোখকে স্থির রাখি, যদি ত্রাটক করে কে অপলক রাখি পলক না ফেলে দৃষ্টিকে স্থির রাখি, তাহলে শ্বাস মন্দীভূত ও শান্ত হয়ে আসবে। এক মিনিটের মধ্যে আপনি দেখবেন, আপনার শ্বাস একেবারে হারিয়ে যাচ্ছে। শ্বাস যেন একেবারে ভেতরে চলে যাচ্ছে, এমন একটা অনুভব হবে। পরবর্তী অনুভূতি হবে, মন যেন শব্দাতীত হচ্ছে, বিকল্পাতীত হচ্ছে। আমাদের যাবতীয় শব্দ সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এভাবে ত্রাটক করলে দুটি অবস্থার অনুভূতি জাগে। একটি হল, শব্দাতীত বা বিকল্পাতীত চিত্তের স্থিতি নির্মাণ এবং অপরটি হল, শ্বাসের সমাপ্তি, শ্বাস শান্ত হয়ে আসা।

মন্দ শ্বাসঃ উপায়-নির্দেশ

আপনি কিভাবে বলছেন, ভগবান মহাবীর তাঁর সাধন পদ্ধতিতে শ্বাস প্রসঙ্গে কিছুই বলেন নি? কেন বলেন নি? তার কারণ, ভাষার সাহায্যে আমাদের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। এজন্যই বলেছি, ভাষা দিয়ে নয়, মহাবীরের ব্যাপারটাকে অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হবে, তার সাধন-পদ্ধতির রহস্যকে উদঘাটন করতে হবে।

উপবাসের বিধান কেন? তা কি অনাহারে মৃত্যু বরণের জন্য? অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করলে কি লাভ হবে? তিনি খাবেন না বা অনাহারে থাকবেন, এ তো এক গৌণ কথা। কিন্তু, অনাহারে মৃত্যুবরণের জন্যই উপবাস নয়। কি হয় তাতে? আজকের শারীরশাস্ত্র বলে, খাওয়া বন্ধ করে দিন, শ্বাসের গতি শিথিল হয়ে আসবে। উপবাসকারীর শ্বাসের গতি খুব সহজেই মন্দীভূত হয়। কায়োৎসর্গ কি জন্য? এটিও শ্বাসের প্রক্রিয়া।

কায়োৎসর্গ : কখন, কতটা ?

জৈন মুনিদের দিনে বিশ-ত্রিশ বার কায়োৎসর্গের বিধান আছে, এ কথা আমরা ভুলে গেছি। বাইরে গেলেন, ফিরে এসে করতে হবে কায়োৎসর্গ। ভিক্ষার জন্য বেরোলেন, ফিরে এসে করতে হবে কায়োৎসর্গ। প্রতিলেখন এবং প্রতিক্রমণের পরেও ঐ কায়োৎসর্গ। যেখানেই আমাদের গমনাগমন, যেখানেই আমাদের প্রবৃত্তির উদ্ভব, সেখানেই প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে হবে কায়োৎসর্গ। কারুর সঙ্গে ঝগড়া হল তো কায়োৎসর্গ। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলেন তো কায়োৎসর্গ। আমাদের প্রায়শ্চিত্তের বহু রকম প্রবৃত্তি কায়োৎসর্গের ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রায়শ্চিত্ত চলত শ্বাসের আধার বা ভিত্তিতে। আট শ্বাসোচ্ছ্বাসের কায়োৎসর্গ, পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশো, পাঁচশো কি হাজার শ্বাসোচ্ছ্বাস কায়োৎসর্গের প্রক্রিয়া রয়েছে।

কিন্তু, এগুলি কি ? শ্বাসের পদ্ধতি নয় ? পুরোপুরি। যখনই কোন কথা বিস্মৃতির স্তরে চলে যায়, শব্দাতীত হয়, আমাদের সামনে থাকে মাত্র কয়েকটি নিয়ম, ঐ নিয়মগুলিকে ধরতে গেলে প্রচুর অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয় এবং সেই বিপদগুলিই আজ আমাদের সামনে রয়েছে।

সাম্য : শ্বাসের ভারসাম্য

সামায়িক কি ? সাম্য কি ? মনে যখন সমতার ভাব আসে, সমতার বিচার আসে, তখনই আমাদের শ্বাসের ভারসাম্য স্থাপিত হয়। শ্বাসের যে অসঙ্গতি এবং বৈষম্য ; তা সমাপ্ত হয়। সামায়িক, উপবাস, কায়োৎসর্গ, ধ্যান—এগুলি সবই হল শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া। ধ্যানের সম্বন্ধ কত বড় ? যেখানেই ধ্যানের গতি, সেখানেই প্রাণ চলে যাবে। মুনিদের বলা হয়েছে 'যুক্ত'। 'যুক্ত' কথাটির অর্থ কি ? বুদ্ধির সঙ্গে মন, মনের সঙ্গে প্রাণ এবং প্রাণের সঙ্গে শরীর—এগুলি পাশাপাশি চলে। যখন এতে কোন অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য বা

ভাবসাম্যহীনতা দেখা দেয় না, তখন ব্যক্তি হয় 'যুক্ত'। এই ভাব যার মধ্যে হয় না, সে হয় অ-যুক্ত।

ঋজু কে ?

'সোহী উজ্জুয়ভূয়স্য, ধম্মো সুদ্ধস্য চিট্টই'—কে শুদ্ধি প্রাপ্ত হয় ? যে ঋজু হয় সেই শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 'ঋজু' কথাটির অর্থ 'সরল'। কিন্তু এই চিন্তাধারা অপর্যাপ্ত—অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থে একে বুঝতে হবে। ঋজুর শুদ্ধি হয়, অর্থাৎ যিনি ঋজু হন, ঐ আত্মায় ধর্ম স্থান গ্রহণ করে। ঋজু কে হতে পারেন ? যাঁর কায়া ঋজু, যাঁর ভাষা ঋজু এবং যাঁর মন ঋজু, তিনি হন ঋজু। ঐ আত্মায় ধর্ম অধিষ্ঠান করে। শরীর ঋজু—এর অর্থ হল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মেরুদণ্ডের হাড়গুলি ঋজু রয়েছে। যাঁর গ্রীবা, মস্তক এবং মেরুদণ্ড ঋজু, তাঁকেই ঋজু বলা যায়। এই কথা এখন আমরা ভুলে গেছি। শরীরের ঋজুতার কথা বিস্মৃত হয়েছি। অথচ, স্থির জানবেন, শারীরিক ঋজুতা ছাড়া ভাষা এবং মনের ঋজুতা সম্ভব নয়। শরীরে রয়েছে কুটিলতা। আপনার মেরুদণ্ডের হাড়টি যদি কিছুটা বাঁকা থাকে, তাহলে আপনার বিচার-বোধেও বক্রতা দেখা দেবে। তাহলেই বুঝুন, শরীরের ঋজুতার গুরুত্ব কতটা। আচার্যশ্রীর সামনে যাই, যদি দেখি ওঁর চোখ সোজা রয়েছে, তাহলে কথা বলি, নইলে চুপ করে চলে আসি।

শরীরের বক্রতা মনের বক্রতা নিয়ে আসে। এই ঋজুতার প্রসঙ্গটিকে ভাল করে বুঝতে হবে। শরীরে ঋজুতা এলে ভাষায় সরলতা আসে। সেখানে কুটিলতা থাকে না, বক্রতা থাকে না। শরীরে সরলতা এলে মনেও সরলতা আসে, বক্রতা থাকে না।

আমাদের তিনটি নাড়ি আছে—ইরা, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না। সুষুম্নার সরলতাই হল বাস্তবে কায়ার সরলতা, ঋজুতা। এ ব্যাপারে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব, কারণ এটি খুবই বড় বিষয়। সুষুম্নার সরলতাই হল কায়ার ঋজুতা। শরীর ঋজু হলে ভাষায়

সরলতা আসে। ঐটি সম্পন্ন হলে মনের ঋজুতা আসে এবং ঐ তিনের সরলতা সম্পন্ন হলে আমাদের মন ও চিন্তার নিষ্পত্তি ঘটে। ঋজুতার ঐ স্থিতিতে বুঝতে পারবেন, ঋজু আত্মার শুদ্ধি ঘটে এবং 'ধর্ম' তাতেই অধিষ্ঠান করে। ঋজুতা না এলে এই পত্তের অর্থ আমাদের কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন : জ্বরের সময় নাভিতে যেমন ধ্যানকে কেন্দ্রিত করতে হয়, তেমনি অন্য আবেগের মুদ্রাগুলিতে ধ্যানকে কোথায় কেন্দ্রীভূত করতে হয়?

উত্তর : আবেগের স্থিতেতে ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করতে হয় শ্বাসের ওপরে। শ্বারের ওপরে ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করলে ঠিক যেভাবে ধ্যান কেন্দ্রীভূত হবে ঠিক তেমনভাবেই আমরা আবেগকে বিদায় দিতে পারব। শ্বাসের ওপর ধ্যান কেন্দ্রীভূত হলে শ্বাস শান্ত হতে শুরু কবে এবং শ্বাস শান্ত হওয়ার অর্থ, আবেগের শান্তি। ঐ সময়ে শ্বাসকে শান্ত করার জন্য আমাদের নাসাগ্রে বা নাকের অগ্রভাগে বা নিচে চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। নাকের নিচে যে ঠোঁট রয়েছে, যেখান থেকে শ্বাস আসে, সেখানে মনকে কেন্দ্রীভূত করুন। এমন করলে আপনা থেকেই শ্বাস শান্ত হতে শুরু করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আবেগও শান্ত হবে।

প্রশ্ন : সাধনার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কোন্ সাধন-পদ্ধতিকে স্বীকার করে জৈন সাধু আগে এগিয়ে যেতে পারেন?

উত্তর : সাধনার প্রসঙ্গ উঠলে সেখানে জৈন বা অ-জৈনের ভেদাভেদ করা যায় না। শুদ্ধ অর্থে সাধন-পদ্ধতি হল সাধনার পদ্ধতি। অধ্যাত্মে এর ভেদ নেই। ভেদ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক। এর আগের সভায় আমি বলেছি, অনেকে ভ্রান্ত ধারণাবশে মনে করেন, জৈন সাধনা-পদ্ধতি যোগ-পদ্ধতি নয়। তাই জৈন-যোগ তথা জৈন

সাধনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু কথা বিশেষ করে এখানে বলা প্রয়োজন। না হলে অধ্যাত্মের গভীরে যিনি যেতে চান, তাঁর কোন প্রশ্নই থাকে না। অধ্যাত্ম-সাধনার গভীরে জৈন সাধনা-পদ্ধতি, বৈষ্ণব সাধনা-পদ্ধতি বা তৃতীয় কোন সাধনা-পদ্ধতির ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যায়। দুধের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে দুধ কালো গরুর কিনা, ধূসর বা পঙ্গু গরুর কিনা, সে প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যায়। সেখানে দুধের ব্যাপারটাই বড়। সাধনার প্রশ্ন শুদ্ধ সাধনার প্রশ্ন। সেখানে দেখতে হবে, কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে মন শান্ত হয়, মনের পবিত্রতা বাড়ে, আমাদের সহজ অনুভূতিগুলি বিকশিত হয়। এটা দেখাই হয় মুখ্য ব্যাপার।

পদ্ধতি অনেক আছে। সকলের জন্যই একই পদ্ধতি কাজ করবে, এমন নয়। ব্যক্তিভেদে রুচি ভিন্ন হয়। ধারণ করার ক্ষমতাও পালটায়। পরমাণুর সংযোগ-ক্ষমতাও ভিন্ন হয়, কারণ শরীর-গঠনে ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই বিভিন্নতা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে, যেখানে সাধনার প্রশ্ন আসে সেখানে সাধনাই যেন মুখ্য রূপ পায়। এই সাধনা কোন শব্দের বন্ধনে আবদ্ধ সাধনা নয়। সাধনার পথে যখন আমরা এগিয়ে যাই, তখন এই সব কথাকে আমাদের ভুলে যেতে হয়।

ভগবান মহাবীর জৈন ছিলেন না, কিন্তু আজ আমরা জৈন। মহাবীর কোন পরম্পরারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, কারুর শিষ্যও ছিলেন না উনি। নিজে অনুভব করেছেন। যা ভাল লেগেছে, সেই আচরণ করেছেন। ঐ সময় নানা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মহাবীর পার্শ্ব-পরম্পরা অনুযায়ী চলেন নি, শ্রাবকও হন নি। ঐ কুলে জন্মগ্রহণ করেও পার্শ্বের অনুগামী হন নি। বলা হয়, সাধুদের কাছেও তিনি কখনও যান নি। ধর্মের প্রসঙ্গও শোনেন নি। যেমন ভাল লেগেছে, তেমন আচরণ করেছেন। আমাদের সাধন-ক্ষমতা যেমন বিকশিত হয়, নামের পেছনে আমাদের তেমন বিশেষ

কোন অর্থ জুড়বার প্রয়োজন পড়ে না। জৈন সূত্রগুলিতে, মহাবীরের বাণীগুলিতে সাধনা বা যোগের পদ্ধতি বিকশিত নয়, একথা ঠিক নয়। আসলে ঐগুলি আমরা বিস্মৃত হয়েছি এবং একটা ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। ঐ বিস্মৃতি বা ভ্রান্তিকে দূর করার জন্য মাঝে-মাঝে জৈন সাধনা পদ্ধতি, জৈন যোগ বা জৈন আগমের উল্লেখ করা হয়, নইলে এই কথার কোন পার্থক্য দেখা যেত না।

আচার্য শ্রী বলেছেন—যতক্ষণ ক্রমের পরিপক্কতা না ঘটছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিকে কোন না কোন সাধনা পদ্ধতি অবলম্বন করতেই হবে। আগে এগিয়ে গেলে ঐ পদ্ধতির নামটি বিযুক্ত হবে। ঐ সত্য পথে উনি চলতে থাকবেন। চলতে চলতে যে পদ্ধতিতে মন বসবে, সেই পদ্ধতিই ওকে সঠিক দিকে নিয়ে যাবে। আমাদের মুনি তুলিচন্দজীর ধ্যান-ধারণা ছিল এই ধরনের। তিনি সাধনার কোন বিশেষ লক্ষ্য নির্ধারণ করেন নি। কিন্তু চলতে চলতে উনি একটা রাস্তা পেয়ে গিয়েছিলেন। এমন অবস্থা তো হতেই পারে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, শুরুতে কোন না কোন পথে চলতেই হবে।

প্রশ্ন : সাধনা-মার্গে ব্যক্তির কি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন? আমাদের বাতাবরণে বৌদ্ধিকতার প্রেরণা যতটা, সাধনারও প্রেরণাও কি ততটা? সাধনায় কি প্রশিক্ষণ অনিবার্য নয়?

উত্তর : আমাদের চেতনার স্তর অনেকগুলি। আমাদের স্তরীয় বিকাশ ঘটে। বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন নেই, এমন কথা বলব না। বৌদ্ধিক স্তরটি এমনিতেই প্রয়োজনীয় এবং সাধনামার্গে বেশি করে প্রয়োজন। যে সাধকের বৌদ্ধিক স্তর উন্নত, তাঁর পক্ষে আধ্যাত্মিক সাধনার তত্ত্বগুলিকে অনুধাবন করা খুবই সুবিধেজনক ও সহজ হয়। অন্যদিকে যাঁর বৌদ্ধিক স্তরটি নিম্নগামী, তাঁর বিকাশের পথে নানা বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়। এমনও মানুষ আছেন যাঁরা বৌদ্ধিক স্তর ছাড়াই সাধনার

শীর্ষে পৌঁছুতে পারেন। কিন্তু এমন বিশেষ ব্যাপার খুব সামান্য ক্ষেত্রেই ঘটে। সাধারণ ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক স্তরের রূপদান খুবই প্রয়োজনীয়। বৌদ্ধিক স্তর যাঁর ভাল হয়, তিনি অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থায় পেঁ াছে যান। ঐন্দ্রিয় স্তর, মানসিক স্তর এবং তার পরে আসে অতীন্দ্রিয় স্তর। এই স্তরগুলি আসা খুবই জরুরী।

এই প্রশ্ন হল প্রশিক্ষণের। এটিও খুব প্রয়োজন। মনে রাখবেন, আধ্যাত্মিক ব্যক্তির পক্ষে বৌদ্ধিক হওয়া আবশ্যক হোক বা নাই হোক, কিন্তু বৌদ্ধিক ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিক হওয়াটা একান্ত প্রয়োজন। মুনিদের পক্ষে তো এমন হওয়া খুবই প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের কথাটাও আপনা থেকেই জরুরী হয়ে পড়ে, কারণ আমাদের যাবতীয় ক্ষমতা অর্জন করে নিতে হয়। জ্ঞানের অভাব ঘটলে আমরা ঐ ক্ষমতাগুলিকে ব্যবহার করতে পারি না।

আমাদের ফুসফুসে শ্বাস প্রবেশের জন্য কম করে প্রায় ছ হাজার ছিদ্র রয়েছে। একটি ফুসফুসে বায়ু-কোষের সংখ্যা হল এক অর্ব্বুদ বা দশ হাজার লক্ষ। ছিদ্র রয়েছে ছ হাজার, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এক-দেড় হাজারের বেশি ছিদ্রে বায়ু পৌঁছয় না। বাকি সাড়ে চার হাজার, পাঁচ হাজার ছিদ্র নিষ্কর্মা অবস্থায় পড়ে থাকে। যদি ছয় হাজার ছিদ্রের সবগুলিতেই বাতাস পেঁ াছে দেওয়া যায়, তাহলে চেতনা যে কতটা বিকশিত হবে তা ভাবা যায় না। অনুভব ক্ষমতাও তাহলে কত বেড়ে যেত। জ্ঞানের অভাবের জন্যই যে এমন হয় না, এ কথা স্পষ্ট। এক অরব বায়ু-কোষে বাতাস পৌঁছে দেওয়া, ফুসফুসের ছ হাজার ছিদ্রে বায়ু পাঠানো এক বিরাট উপলব্ধি। এই জ্ঞান যাঁর আছে, তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি ছিদ্র বা বায়ু-কোষে বাতাস পেঁ াছে দিতে পারেন। নইলে বাতাস পেঁ াছয় খুবই কম।

আমাদের মস্তিষ্কে কতগুলি জ্ঞান-তন্তু, কতগুলি ছিদ্র ও প্রকোষ্ঠ রয়েছে? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে আমাদের মস্তিষ্কে।

একজন মানসশাস্ত্রী বলেছেন, এক একটি প্রকোষ্ঠের জ্ঞানতন্তুগুলিকে ঠিকমত সাজালে তা দিয়ে ভারত তো কোন্ ছার, সাড়া পৃথিবীকে ভরে দেওয়া যায়। কিন্তু ঐ প্রকোষ্ঠগুলির কথা জ্ঞানতন্তুগুলির শতকরা এক ভাগ তো দূরের কথা, শতকরা আধ ভাগকেও আমরা বিকশিত করতে পারি না।

সাধনার দ্বারা নতুন জ্ঞান লাভ হয়। নতুন স্মৃতি জাগ্রত হয়। নতুন অনুভূতি আসে। কিভাবে তা হয়? কিছু কিছু প্রকোষ্ঠ জাগরিত হলেই মনে হয় অনেক বড় উপলব্ধি এসে গেল। সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠগুলিকে জাগানোর কথা বাদ দিন, এগুলির শতকরা পঁচিশ ভাগকেও যদি আমরা জাগরিত করতে পারি, তাহলে কি সুন্দর হবে বলুন তো! আমাদের ক্ষমতা ভারি অদ্ভুত। আমাদের শরীরের ক্ষমতা, মনের ক্ষমতা, জ্ঞান-তন্তুর ক্ষমতা অপরিমিত, কিন্তু প্রশিক্ষণের অভাবে, জ্ঞানের অভাবে, আমরা তাকে কাজে লাগাতে পারি না।

প্রশিক্ষণের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি, আমাদের এখানে যে শিক্ষণ-পর্যায় শুরু হয়েছে, আচার্যশ্রী যে কার্যক্রম শুরু করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে প্রশিক্ষণের জন্যই শুরু করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের প্রেরণা জাগবে, আমাদের চিন্তাশক্তি বাড়বে। চিন্তার মধ্যে যে জিজ্ঞাসা জাগবে, যে জ্ঞান-পিপাসা জাগবে, সেই পিপাসাকে তৃপ্ত করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। এজন্যই প্রশিক্ষণের ব্যাপারটি শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, অত্যন্ত অনিবার্য এবং প্রয়োজনীয়।

আচার্যশ্রী বলেছেন—প্রশিক্ষণের যে ফল আমাদের সামনে আসে, তা প্রত্যক্ষ। এ বার গত পাঁচ-ছয় মাসে আমরা কিছু প্রশিক্ষণ-পর্ব চালিয়েছি। এর ফলাফল আমাদের সামনে যেভাবে এসেছে তা হল: যাঁরা আমাদের বিরোধী ছিলেন, সাধুসন্তের কাছে যাঁরা কখনও আসতেন না, আসতে চাইতেন না, এসব ব্যাপারে

কোন কথাই বলতে চাইতেন না, তাঁরাও সাধনা-প্রিয় হয়েছেন, আমাদের উপাসক-শ্রেণীতে তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। এজন্যই প্রশিক্ষণের কাজটিকে আমি অতি প্রয়োজনীয় বলে মানি এবং এ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটিকেও আমাদের ভাবতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আগের সভায় আপনি বিবেক-প্রতিমার কথা বলেছেন। এই বিবেক কি ?

উত্তর ঃ 'বিবেক' কথাটির অর্থ হল, দুটি বিষয়কে পৃথক করা, বিভক্ত করা। যা পেয়েছি তাকে বিভক্ত করতে করতে এগিয়ে চলা। আমাদের সম্পূর্ণ সাধন-পদ্ধতির, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ হল এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিবেকের সাহায্যে চলতে হবে, বিবেক পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে। শরীর, মন, ভাষা, শ্বাস, সূক্ষ্ম শরীর এবং সংস্কার— এগুলির বিবেক করতে হবে, এগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে। বিবেক বাদ দেবার প্রসঙ্গে এত কথা আসে। যা আমাদের স্থূল ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করে তাকে বাদ দিতে হবে। এ হল আমাদের বিবেকের কথা। এখন প্রশ্ন হল, বিবেক কিভাবে অর্জন করব ? বিবেকের প্রথম বিন্দু হল, সম্যক্ দর্শন বা অন্তর্দৃষ্টির নির্মাণ। অন্তর্দৃষ্টি নির্মাণের নামই হল বিবেক। শরীর যে আমাদের অস্তিত্ব নয়, অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের এই জ্ঞান সুদৃঢ় হয়। যা আমাদের শরীর, আমরা তা নই। শরীর আমাদের অস্তিত্ব থেকে পৃথক বস্তু। শরীর এবং অস্তিত্বের এই যে ভিন্নতা বোধ, তারই নাম সম্যক দর্শন।

এখন প্রশ্ন হল, বিবেকের সাধনা কিভাবে করব। শ্বাসের যে সাধনার কথা এর আগে বলেছি, তা হল বিবেকের সাধনার প্রথম বিন্দু। যিনি শ্বাসের সাধনা শুরু করেন, তিনি শ্বাসের সাধনা করতে করতে এমন একটা স্থিতিতে পৌঁছে যান যে মনে হয়, শরীর আলাদা পড়ে রয়েছে, আমি কোথাও আলাদা পড়ে আছি। আপনি শ্বাসকে ঠোঁটের ওপরে নাকের নিম্নভাগে দেখুন এবং মনকে কেন্দ্রীভূত করুন।

আধ ঘন্টা, এক ঘন্টা, দু ঘন্টা—সময় কাটতে থাকুক, আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না, জপ বা ধ্যান করতে হবে না, মালা জপতে হবে না, শুধু মনকে কেন্দ্রীভূত করুন শ্বাসের ওপরে। আপনার মনে হবে, কিছু একটা যেন আলাদা হয়ে যাচ্ছে, আমি আলাদা হয়ে যাচ্ছি। দীর্ঘ সময় অনুশীলনের পর এই কথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমাদের আত্মা এবং স্থূল ব্যক্তিত্ব—উভয়কে যুক্ত করে শ্বাস। মন চলে যায়, বাক্য চলে যায়, স্থূল শরীর চলে যায়—তাহলে বাকি থাকে কি? শ্বাস।

যোগীর উচ্চ ভূমিকায় প্রথমে মনকে বন্ধ করতে হয়, তারপরে বাক্যকে এবং সবশেষে শরীরকে। তিনটি জিনিসই বন্ধ হয়ে গেল, তাহলে বাকি রইল কি? শ্বাস। আত্মা এবং শরীর—উভয়ের সংযোগকারী যে শৃঙ্খলা, উভয়ের মাধ্যম হল শ্বাস। শ্বাসকে যদি আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারি, তাহলে আত্মাকে এবং স্থূল শরীরকে—উভয়কেই পৃথক করতে পারি।

কেউ কেউ স্বাধ্যায়ও করেন না, কিছুই করেন না। তাঁদের জন্য এক সোজা পথ আছে। তাঁরা কেবল শ্বাসের ওপরে ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করুন। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁরা টের পাবেন, শরীর হালকা হয়ে যাচ্ছে, আকাশে উড়ে যাচ্ছে, একটা কিছু যেন আকাশে উড়ছে। পুরনো পদ্ধতিতে এই ছিল আমাদের বিবেক-প্রতিমা। রাত বারোটার পরে বিবেক-প্রতিমা স্বীকার করা হতো এবং তা চলত সূর্যোদয় পর্যন্ত। কায়োৎসর্গের সঙ্গে তাতে বিবেক-প্রতিমাকে স্বীকার করা হতো এবং নিজের অস্তিত্ব তথা স্থূল শরীরের ভিন্নতা তাতে স্পষ্ট প্রতীত হতো।

৩.

শরীর-দর্শন

- শরীরের উর্ধ্বভাগকে দেখা
- শরীরের মধ্যভাগকে দেখা
- শরীরের নিম্নভাগকে দেখা
- শরীর-দর্শনের ফল—
  - অনাসক্তির বিকাশ
  - উত্তেজনা-বিসর্জন
  - মনের স্থিরতা

দৃশ্য এক : দৃষ্টিকোণ অনেক

আমাদের আলোচিত বিষয় হল চেতনার উর্ধ্বারোহণ। চেতনার উর্ধ্বারোহণের জন্য শ্বাস, শরীর এবং মনকে বোঝা খুবই জরুরী। এগুলিকে না বুঝলে চেতনার উর্ধ্বারোহণের কথা বোঝা যাবে না। শ্বাসের সম্বন্ধে এর আগেই কিছু আলোচনা করেছি। আমাদের শরীর হল শ্বাস, ইন্দ্রিয়, মন এবং চেতনার এক আয়তন। শরীর-দর্শনের দৃষ্টিকোণ অনেক। এক ব্যক্তি কামুক। সে শরীরকে দেখে—শরীরের রং-রূপকে দেখে, শরীরের আকারকে দেখে, শরীরের গঠন দেখে। তার নিজের একটি দৃষ্টিকোণ আছে। এক চিকিৎসকও শরীরকে দেখেন, তাঁরও একটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ আছে। তিনিও দেখেন। শরীরের এক একটি অঙ্গকে দেখেন। এক সাধকও

শরীরকে দেখেন, জানেন—তাঁরও এক নিজস্ব দৃষ্টিকোণ আছে। তাহলে দৃশ্য একটি, কিন্তু দৃষ্টিকোণ দেখা যায় অনেক। যিনি দেখছেন তাঁর দৃষ্টিকোণ ভিন্ন হয়, কিন্তু দৃশ্য হয় এক। নিজ নিজ দৃষ্টি অনুসারে সবাই সব কিছুকে দেখেন?

টলস্টয়ের কাছে এক ব্যক্তি এলেন। উনি এক ধনী ব্যক্তির নামে প্রচণ্ড নিন্দা করছিলেন। খুব নিন্দা হল। প্রাণ ভরে ওকে গালিগালাজ করলেন। টলস্টয় বললেন, আমি তোমাকে একটা গল্প শোনাচ্ছি। এক ছিল চোর। চুরি করতে বেরোল সে। রাতে অনেক ঘুরল, কিন্তু চুরি করার সুযোগ কোথাও পেল না। লোকে জেগে ছিল, তাই সুযোগ হল না চুরি। তুমি জান, চুরি সেখানেই হয় যেখানে ঘুম আছে। জাগরণ যেখানে, সেখানে চুরি হয় না। অনেক লোক জেগে ছিল, তাই চোর চুরি করতে পারল না। এদিক ওদিক ঘুরছিল, ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তবুও চুরি করার সুযোগ এল না। ক্লান্তির পর, বিশ্রাম নেবার জন্য গাঁয়ের বাইরে গেল এবং একটা গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ল। সারা রাত জেগে ছিল, তাই শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। সূর্য উঠল, তবু তার ঘুম ভাঙ্গল না।

সূর্য উঠলে লোকে পথে বেরোল। এক মদ্যপায়ী এল এক দিক থেকে। সে দেখল, গাছের নিচে কে একজন শুয়ে আছে। লোকটির চারদিক সে ঘুরে ঘুরে দেখল, তারপর বলল—'দেখ! কত বড় মদ্যপায়ী! কি পরিমাণ মদই না খেয়েছে! নেশায় এমন মশগুল যে রোদ উঠেছে, তবু ওর ঘুম ভাঙ্গে নি! পাগল কোথাকার, এখনও শুয়ে আছে!' এই উক্তি করে সে চলে গেল।

একটু পরে ওখানে আর একটি লোক এল। লোকটি একজন জুয়াড়ী। সে চোরটিকে দেখে বলল, 'মনে হচ্ছে জুয়ার দানে হেরে গেছে। সারা রাত ধরে জুয়া খেলে হেরে এসেছে। এখন হতাশ হয়ে শুয়ে আছে। আরে বাপু, আগে খেলতে গেলি কেন? খেলায়

ঠিকমত দান দিলি না কেন? বেওকুফ কোথাকার, এখনও শুয়ে রয়েছে!' এই বলে সে চলে গেল।

একটু পরে তৃতীয় ব্যক্তিটি এল। সে চোর। সে ভাবল, 'লোকটা এখনও শুয়ে আছে, মনে হচ্ছে আজ রাতে কিছুই চুরি করতে পারে নি। হয়ত আমার কোন ভাই হবে মনে হচ্ছে। অসফল হওয়ায় নিরাশ হয়ে শুয়ে আছে।' এই বলে সে চলে গেল।

আরও পরে আর এক জন মানুষ এলেন। উনি হলেন সন্ন্যাসী। লোকটিকে দেখে বললেন, 'আহা, কি সুখেই না ঘুমোচ্ছে! কত নিশ্চিন্ত! কোন চিন্তা নেই। মনে হচ্ছে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ, তাই শুয়ে পড়েছে এভাবে। শয্যা বা কোন কথার জন্য অপেক্ষা করে নি, এভাবেই মাটিতে শুয়ে রয়েছে। খুবই উচ্চ স্তরের সাধনাকারী বলে মনে হচ্ছে। এমন মানুষকে নমস্কার করা উচিত।' উনি লোকটিকে নমস্কার করে চলে গেলেন।

এখানে দৃশ্য ছিল একটি, কিন্তু দৃষ্টিকোণ অনেক। একই দৃশ্য দেখে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করল। এ হল এক বিরাট বড় সত্য। একই জিনিসকে আমরা অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকি।

শরীর এক : দৃষ্টিকোণ অনেক

শরীরও হল একটি দৃশ্য। তাকেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। একটি হল সৌন্দর্যের দৃষ্টি, যা হল স্থূল দৃষ্টি। স্থূল দৃষ্টিতে শরীরই প্রথমে আমাদের সামনে আসে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে চিকিৎসকের এক সূক্ষ্ম দৃষ্টি। তিনি ওপরের রং, আকার এবং প্রকারকে দেখেন না, শরীরের গঠন দেখেন। শরীরের গঠন-প্রণালীকে দেখে নিজের উপযোগিতার দৃষ্টিতে তিনি দেখেন। তৃতীয় দৃষ্টিকোণ হল সাধকের। তা হল শরীরের সূক্ষ্মতম দর্শন। চিকিৎসকও যা দেখতে পান না, সাধক তাকেই দেখেন। আমাদের শরীরে সাধনার

এত কোণ আছে, সাধনার এত তথ্য আছে, এত চাবিকাঠি আছে যে, যদি আমরা ঐগুলিকে ঘোরাতে পারি তাহলে অনেক কিছু লাভ করা সম্ভব।

স্থূল দর্শনের প্রসঙ্গে আমার কিছু বলার নেই। সূক্ষ্ম দর্শনের প্রসঙ্গেও যেটি চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ, সে সম্বন্ধেও আজ কিছু বলার নেই। ঐ ব্যাপারেও আমাদের অনেক কিছু জানার প্রয়োজন থাকলেও এখন কিছুই বলব না। আজ আমরা তৃতীয় দৃষ্টিতে শরীরকে দেখব। শরীরকে দেখব সাধনার দৃষ্টিতে। সাধনার দৃষ্টিতে শরীর কতটা উপযোগী, কেন এর উপরে এতটা জোর দেওয়া হচ্ছে? এর কারণ হল, আমাদের মনের, আমাদের ইন্দ্রিয়ের, শক্তির, তথা যাবতীয় শক্তির কেন্দ্র হল এই শরীর।

আমাদের মন আছে। কিন্তু, মন এল কোথা থেকে? আমাদের বাক্য আছে। বাক্য কোথা থেকে এল? জৈন দর্শন জানেন এমন যে কোন মানুষ জানেন, মনের কোন অস্তিত্ব নেই। বাক্যের কোন অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব আছে একমাত্র শরীরের। এক দিক থেকে দেখলে মন এবং বাণী হল শরীরের উপভেদ—মূল নয়। একটি যোগ হল কায়া। যোগ তিনটি নয়, একটি—সেটি হল কায়া। কায়ায় যোগ আছে। মন এবং বাক্য উভয়ই তৈরি হয় কায়ার দ্বারা। মনের জন্য যে অণু প্রয়োজন, যে সামগ্রী প্রয়োজন, তা আকর্ষিত হয় শরীর দ্বারা। বাক্যের জন্য যা প্রয়োজন, তারও আকর্ষণ হয় শরীর দ্বারা। মন হল মন্যমান। মনন-এর আগে মন হয় যা, মনন-এর পরেও মন হয় না। ভাষা হল ভাষ্যমান। বলার পরে ভাষা হয় না, বলার আগেও ভাষা হয় না। ভাষা এবং মন—দুয়েরই অস্তিত্ব শরীরের ওপর নির্ভরশীল, কায়ার ওপর নির্ভরশীল, কায়যোগের ওপর নির্ভরশীল। এরা মূলত কায়ারই প্রবৃত্তি।

জীব শরীর উৎপন্ন করে। শরীর বীর্য উৎপন্ন করে এবং বীর্য মন, বাক্য এবং কায়ার হালচাল উৎপন্ন করে। মূল অস্তিত্ব হল

শরীরের। সমস্ত শক্তির কেন্দ্র, যাবতীয় শক্তির অধিষ্ঠান এবং সমস্ত শক্তির আয়তন অর্থাৎ আমাদের আত্মার যত রকম অভিব্যক্তি হতে পারে, সব অভিব্যক্তির একটিই চক্র রয়েছে—তা হল শরীর।

পাওয়ার হাউসে জেনারেটর বিদ্যুৎ তৈরি করে। শরীর হল আমাদের যাবতীয় শক্তির জেনারেটর বা উৎপাদক যন্ত্র। এই বিদ্যুৎযন্ত্রই আমাদের যাবতীয় বিদ্যুৎ তৈরি করে। ওখান থেকেই তা প্রবাহিত হয় সর্বত্র।

আমরা এই দৃষ্টিতে শরীরকে দেখি না। যদি দেখি, তাহলে দেখব অনেক অদ্ভুত জিনিস আমাদের শরীরে বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে মেরুদণ্ডের হাড় সম্বন্ধে কিছু বুঝতে হবে। শরীর-শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ঐ অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধনার দৃষ্টিতে তার গুরুত্ব আরও বেশি।

শ্বাসের তিনটি প্রণালী

আমাদের শ্বাসের প্রণালী তিনটি—একটি বাঁয়ে, একটি ডানে এবং একটি মধ্যে। বাঁ দিকের প্রণালীটিকে বলা হয় চন্দ্রস্বর বা ইড়া, আর ডানদিকের প্রণালীকে বলা হয় সূর্যস্বর বা পিংলা। মধ্যবর্তী একটি প্রাণধারাও রয়েছে, তার নাম সুষুম্না। একটা টিউব বা নল যেমন থাকে, আমাদের শরীরে সুষুম্নাও রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে। মেরুদণ্ডের হাড় হল পুরোপুরি শূন্যগর্ভ। ঠিক টিউবের মত। ঐ টিউবে যে শূন্য স্থান থাকে, সেটিই হল সুষুম্না। ওখান থেকেই প্রাণধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত জ্ঞানতন্তুগুলিকে জাগ্রত করে, প্রতিভাকে জাগ্রত করে এবং চেতনাকে ঊর্ধ্বগামী করে।

শরীর হল ত্রি-লোকের মিলনক্ষেত্র

ধ্যানের সময় মহাবীর ওপরে দেখতেন, মাঝখানে দেখতেন, নিচে দেখতেন। এগুলি কি, সে প্রসঙ্গ এখন থাক। আমাদের এই যে শরীর, এর তিনটি ভাগ ঃ

১. ঊর্ধ্বভাগ

২. মধ্যভাগ

৩. নিম্নভাগ

বিভাগটি করা হয় নাভি থেকে। নাভি হল মধ্যলোক। নাভির ওপরের অংশ হল ঊর্ধ্বলোক, নাভির নিম্ন অংশ হল নিম্নলোক। আমাদের শরীরের এই হল ত্রি-লোক। যিনি এই ত্রিলোক দর্শন করেন, তিনি হন পুরোপুরি সাধক। নাভির নিচে রয়েছে কামকেন্দ্র, আর নাভির ওপরে থাকে জ্ঞানকেন্দ্র। আমাদের প্রাণধারা যখন নিচে যায়, তখন চেতনা হয় নিম্নগামী। প্রাণধারা যখন ওপর দিকে যায় তখন চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ হয়। চেতনা আরও ওপরে চলে যেতে পারে। একে ওপরে বা নিচে নেওয়াটা আমাদের ইচ্ছাধীন—তা নির্ভর করে আমাদের সঙ্কল্পশক্তি এবং জ্ঞানের ওপরে। যিনি ঊর্ধ্ব লোককে বা হৃদয়-চক্রকে জানেন, বিশুদ্ধি চক্র ও আজ্ঞা-চক্র যাঁর জ্ঞাত, যিনি সূর্য চক্রকে জানেন, তিনি নিজের চেতনাকে আরও ওপরে নিয়ে যেতে পারেন।

বিবেক-প্রতিমা

চেতনাকে আরও ওপরে নিতে হলে শরীরের গঠনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে হবে। দেখতে হবে, আমাদের জ্ঞানকেন্দ্র কোথায়, জ্ঞান-গ্রন্থিগুলি কোথায়। সারা শরীরেই যে জ্ঞানকেন্দ্র রয়েছে, তা ভাববেন না। আত্মা সারা শরীরে ব্যাপ্ত আছে, এ কথাটা ঠিক। চেতনার ঊর্ধ্বারোহণের বা সাধনার খুব বড় সূত্র হল আত্মদর্শন। আচার্য যোগীন্দু বলেছেন—যেখানেই দৃষ্টিপাত করছি, সেখানেই আত্মাকে দেখা যাচ্ছে। এ এক বিরাট সূত্র। পায়ের দিকে তাকালে আত্মাকে দেখতে পাচ্ছি, মাথার দিকে তাকালে আত্মাকে দেখা যাচ্ছে। যেদিকে তাকাচ্ছি, সেদিকেই আত্মাকে দেখা যাচ্ছে। এই যে যেখানে-সেখানে আত্মাকে দেখা, যে কোন জায়গায় আত্মাকে দেখা, শরীরের প্রতিটি অণুতে আত্মাকে দেখা—আত্মদর্শনের এই দৃষ্টিকোণ

সম্পূর্ণভাবেই ঊর্ধ্বারোহণের দৃষ্টিকোণ। এই ব্যাপারটি যিনি অনুধাবন করতে পারেন, তিনি সর্বত্রই আত্মাকে দেখতে থাকেন—ঐ ব্যক্তিটি তখন হন সম্যক্ দ্রষ্টা। তিনি ভেদ-জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তাঁর মধ্যে বিবেক-সাধনা জাগ্রত হয়। এই হল বিবেকের সাধনা।

প্রশ্ন ছিল, বিবেক-প্রতিমা কি। এ হল বিবেকের সাধনা। শরীরের প্রতিটি অণুতে আত্মাকে দর্শন করার নামই হল বিবেক প্রতিমা। যা দেখা গেল আপনি যদি তাকে আরও গভীরে দেখেন, তাহলে মনে হবে যেন কিছু স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। অন্তর থেকে জ্যোতির আভাস হচ্ছে। দেখার অর্থ হল এটাই, এই হল দেখার ক্রিয়া। ঠিকভাবে দেখার চেষ্টা যদি আমরা করি তো শরীরের ভেতরের অনেক কিছু দেখতে পারব। শরীরের ভেতরের যাবতীয় ক্রিয়াও তখন আমরা জানতে পারব।

আত্মদর্শন কি? কি ভাবে?

'আত্মদর্শন' শব্দটি আমাদের কাছে খুব সাধারণ বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে এটি অসাধারণ। প্রচলিত হয়ে গেছে বলে এর যথাযথ মূল্য আমরা দিই না। কিন্তু বাস্তবে এই শব্দটির পেছনে কত চিন্তা, কত গভীর চিন্তা নিহিত রয়েছে, তা উদ্ঘাটিত হলেই তা জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর।

ভগবান মহাবীর বলেছিলেন, 'আত্মাকে আত্মার মাধ্যমেই জানুন আত্মাকে আত্মার মাধ্যমে দেখুন।' দুটি কথাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আত্মাকে আত্মার মাধ্যমে জানি না, আমরা জানি অন্যের শব্দের ভিত্তিতে। আত্মাকে আমরা আত্মার মাধ্যমে দেখি না। দেখি অপরের কোন ইঙ্গিতের আধারে। যদি বাস্তবে আত্মার মাধ্যমে আত্মাকে জানা যায়, নিজের অনুভব দিয়ে জানা যায় এবং ধ্যানের গভীরে বসে দেখা যায় তাহলে আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হবে তা হাজার শাস্ত্র পড়েও হবে না। আত্মাকে যদি আমরা আত্মা দিয়ে দেখি, আত্মচেতনার গভীরে প্রবেশ করে দেখি, তাহলে

আত্মার যে দর্শন লাভ হবে তা অন্য কোন উপায়ে লাভ করা সম্ভব নয়।

আত্মদর্শন শাব্দিক দর্শন নয়। আত্মদর্শন হল চেতনার সেই স্তরের দর্শন যা আমাদের ইন্দ্রিয় এবং মনের অতীত। আমরা শরীর এবং শরীরের ক্রিয়াকে দেখি। আত্মাকে দেখা আমাদের পক্ষে সহজ হয় না। আমরা সংস্কারকে দেখি। যেসব ধারণা এবং সংস্কার নির্মিত হয় সেগুলিই আমরা দেখি, তাদের সাহায্যে দেখি। কিন্তু সংস্কার, ইন্দ্রিয় এবং মন আত্মার দর্শনের বাধক হয়। আমরা যখন সংস্কার এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত হই তখনই ঐ দর্শন সম্ভব হয়। এসবের পরে যে দর্শন হয় তা হল আত্মার দর্শন, চেতনার দর্শন এবং আমাদের আন্তরিক সহজ ভাব, নির্মলতা এবং স্বচ্ছতার দর্শন।

পরিবর্তনের মূল হল কম্পন

মণ্ডিতপুত্র ভগবান মহাবীরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— 'ভন্তে! সংস্কার কেন নির্মিত হয়? এবং কিভাবেই বা তা তৈরি হয়?' ভগবান বলেছিলেন—সংস্কার নির্মিত হয় সংস্কারেরই নিমিত্ত। আর তা হয় ক্রিয়া থেকে। প্রাণীমাত্রেরই স্পন্দন ও কম্পন ব্যতীত কোন সংস্কার নির্মিত হয় না। কম্পনের অনেকগুলি ক্রিয়া হয়, সংস্কার নির্মিত হয় তার পরে, পরিণতি হয় এবং বিভিন্ন ভাবের পরিণমন হয়।

যা অকম্পিত, যাতে কম্পন বা স্পন্দন নেই, তার কোন পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তনের মূল হল কম্পন, ক্রিয়া। ক্রিয়া ছাড়া কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যাবতীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয় ক্রিয়ায়, ক্রিয়াশীলে এবং ক্রিয়াশীল দ্বারা। মানুষ ক্রিয়া করে, তবেই কম্পন হয়। ক্রিয়ার মূল আধার হল শরীর। শরীর না থাকলে কোন ক্রিয়াই হতে পারে না। শরীরের ক্রিয়া না হলে কোন ক্রিয়াই হতে পারে না। এই শরীরের ক্রিয়া যত তীব্র হবে, কম্পনও তত তীব্র হবে। সংস্কারের নির্মাণও তত তীব্র হবে।

শরীরকে স্থির ও শান্ত করার মূল্য হল, শরীর যত স্থির ও শান্ত হবে, শরীর-কৃত যাবতীয় ক্রিয়া—তা সে বাক্য, মন বা শ্বাস যে সম্পর্কেই হোক না কেন—শান্ত হয়ে যায়। এজন্যই ভগবান মহাবীর বলেছেন, অ-ক্রিয়ার দ্বারা নয়, ক্রিয়ার দ্বারা সংস্কার নির্মিত হয়। ক্রিয়া যখন বন্ধ হয়ে যায়, ঐ স্থিতিতে সংস্কারেরও বিলুপ্তি ঘটে।

শরীর হল দরজা

আমাদের শরীর হল আস্রব বা দরজা। দরজা খোলা আছে, তাই আমরা সবাই একত্রিত হতে পেরেছি। যদি দরজা খোলা না থাকে, তাহলে আমরা একত্রিত হতে পারি না। দরজা খোলা থাকলে তবেই পশু বা মানুষের পক্ষে আগমন সম্ভব হয়। ধুলোর ঝড় আসতে পারে, ধুলো আসতে পারে, আবার হাওয়াও আসতে পারে। কিন্তু দরজা বন্ধ থাকলে কারুর পক্ষেই আসা সম্ভব নয়। আমাদের শরীর হল একটা দরজা। নৌকা জলে ভেসে রয়েছে। একটা ফুটো হয়ে গেল। নৌকোয় জল ভর্তি হয়ে গেল, তা ডুবতে লাগল। কেন নৌকো ডুবল? তার কারণ তা ছিদ্র (আস্রব)-সমন্বিত হয়ে গেছে। সেই ছিদ্র দিয়ে জল এসেছে। জল আসতে নৌকো ভারি হয়ে গেছে। আর, ভারি হতেই তা ডুবতে শুরু করেছে। ঐ সময় নৌকায় যদি কুশলী কাণ্ডারী বা মাঝি থাকে, তাহলে সবচেয়ে আগে সে ঐ ছিদ্রকে বন্ধ করার চেষ্টা করবে। বন্ধ করবে ছিদ্রকে, জল আসাও বন্ধ হয়ে যাবে। ভেতরে যে জল ঢুকেছে, তাকে সে হেঁচে বের করে দেয়। নৌকো আবার ভেসে ওঠে।

এই শরীর হল নৌকো। কখনও তা ডোবে, কখনও ভাসে। যখন এর সব ছিদ্র খুলে যায়, দরজার মুখ বড় হলে, তখন বাইরে থেকে এত সব কিছু ভেতরে আসে যে তা ডুবতে শুরু করে। এই ডোবা নৌকোর ডোবা নয়। এ হল দরজা এবং ছিদ্রের ডোবা। ঐগুলিই সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটিকেও ডুবিয়ে দেয়। এই শরীরের

ছিদ্রগুলিকে ঢাকা, দরজাগুলিকে বন্ধ করা, ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করাই আমাদের সাধনা।

নিশ্ছিদ্রতার মূল্য

ছিদ্রযুক্ত নৌকো ডোবে এবং ছিদ্রবিহীন নৌকো ভাসে। বাইরে থেকে সব কিছু গ্রহণকারী ছিদ্রযুক্ত শরীর ডোবে এবং বাইরের সব কিছুকে ত্যাগকারী নিশ্ছিদ্র শরীর ভাসে। শরীরের ক্রিয়া সূক্ষ্ম ও স্থির হলে সেই সময়ে ধ্যানের স্থিতি নিষ্পন্ন হয়। সব স্থির হয়, শান্ত হয়। তবেই ধ্যান তীব্র হয়। শরীর স্থির হলে শক্তি এবং উষ্ণতা বাড়ে, ধ্যানের শক্তি অনেকটা বাড়ে এবং অর্জিত সংস্কার-গুলিকে নষ্ট করার অদ্ভুত ক্ষমতা উৎপন্ন হয়।

মণ্ডিতপুত্রের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলেছিলেন, 'দেখো, আগুন জ্বালার সময়ে কেউ যদি আগুনের মধ্যে এক আঁটি খড় দিয়ে দেয় তাহলে কি হবে? মণ্ডিতপুত্র বললেন, 'ভন্তে! খড়টা জ্বলে যাবে।' 'গরম তাওয়ার উপরে কেউ যদি জল-বিন্দু নিক্ষেপ করে তো কি হবে?' 'ভন্তে! জল বাষ্প হয়ে শুকিয়ে যাবে।' আগুন খড়ের আঁটি জ্বালিয়ে দেয় এবং গরম তাওয়া জলবিন্দুকে শুকিয়ে দেয়। এই অপ্রকম্প অবস্থায়, শরীরের স্থির অবস্থায়, ছিদ্রগুলিকে আটকে দেবার অবস্থায় শরীরে যে স্থিতি উৎপন্ন হয় তা সংস্কারকে জ্বালিয়ে দেয়।

শরীর স্থির—সব স্থির

শরীরের স্থিরতা এলে তবেই এগুলো হয়। শরীর স্থির না হলে এসব হতে পারে। তাই সবচেয়ে আগে দরকার, শরীরের স্থিরতার ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করা। কারণ, যা মূল, যদি তার ওপরে ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করতে না পারা যায় তাহলে ওপরের অন্য জিনিসগুলোর ওপরে ধ্যানকে কেন্দ্রিত করে লাভ কি হবে?

এক সন্ন্যাসী চলেছিলেন। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একটা লতা দেখলেন। এর আগে তিনি ঐ লতা দেখেন নি। ঐ

লতার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে খেলেন, তেতো লাগল। ফুল চেখে দেখলেন, তেতো লাগল। ফল খেলেন, তাও তেতো। সন্ন্যাসী ভাবলেন, এ কেমন ব্যাপার, সবই তেতো লাগছে! উনি আবার ঐ গাছের খানিকটা মূল নিয়ে খেয়ে দেখলেন তাও তেতো। তখন সন্ন্যাসী বললেন—পাতার দোষ কি? ফুল আর ফলেরই বা কি দোষ? মূলই যখন তেতো, তখন পাতা ফুল ফল কেন তেতো হবে না? যখন আমাদের মূল বা শরীরই তেতো, তখন তাতে মিষ্ট ফল কি করে হবে? শরীর হল মূল। মন এবং বাক্য হল তার পাতা, ফুল এবং ফল। শরীরের তেতো ভাব যদি দূর না হয় তাহলে অন্যগুলির তিক্ত ভাব মিটবে কি করে? শরীর যদি চঞ্চল হয় ঐগুলি স্থির হবে কি করে? শরীর চঞ্চল রয়েছে, অথচ আমাদের শ্বাস, বাক্য এবং মন শান্ত ও স্থির হয়ে যাবে, এ কথা যেন আমরা কখনই কল্পনা না করি।

কায়বিপস্যনা

বৌদ্ধরা শরীরকে স্থির করার জন্য 'কায়বিপস্যনা' নামে এক বিশেষ মার্গের ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কায়ার প্রতি. শরীরের প্রতি আমাদের মমত্ব এবং আসক্তি থাকে, ততক্ষণ স্থিরতা আসতে পারে না। কায়াকে স্থির ও শান্ত করতে চাই। কিন্তু আসক্তি ও মমত্ব যদি লোপ না পায়, তাহলে স্থিরতা আসবে কি করে? হতেই পারে না। বৌদ্ধরা একটি পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। কায়াকে দেখ। কায়াকে দর্শন কর। তাঁরা সাধকদের মৃতদেহের কাছে নিয়ে যেতেন এবং তাঁদের দেখাতেন। এই দেখ, এই হল মাংস, এই হল শোণিত, এই হল মজ্জা। চিকিৎসক যেমন নিজের ছাত্রদের এক একটি অংশ দেখান এবং শেখান, ঠিক তেমনি ওঁরা নতুন সাধককে সমস্ত জিনিস দেখাতেন এবং বোঝাতেন। আর তারপর তাদের জিজ্ঞেস করা হতো, এই

কথাগুলিকে তো তোমরা অনুভব করলে, এবার বল, এই শরীরের সার কি? সার কোথায়?

শরীর প্রেক্ষার লাভ

এভাবে শরীর দর্শনের দ্বারা শরীরের প্রতি অনাসক্তি আসে। জৈন সাধকরা অশৌচ ভাবনার সাহায্যে শরীরের প্রতি অনাসক্ত থাকার অভ্যাস করাতেন। মহারাজ শ্রেণিক এবং মহারাণী ধারিণী মেঘকুমারকে বলেছিলেন—তুমি প্রব্রজিত হতে পারবে না। মেঘকুমার উত্তর দিয়েছিলেন—আমি কি এই শরীরের আধারে এখানে বেঁচে থাকব? আমার শরীরের স্থিতি কি? এই শরীর হল পিত্তের দরজা, বমনের দরজা, শুক্র-শ্লেষ্মার দরজা, তুনিয়ার যত অশুদ্ধ পদার্থ আছে, সবগুলিরই দরজা। একদিন এই শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। কদিন আগে বা কদিন পরে অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে। এই শরীরের আধারে আমি কি নিজের শাশ্বতের সাধনাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেব?

শরীর সম্বন্ধে বাস্তবিক বোধ যাঁর জন্মায়, তিনি শরীরের প্রতি আসক্ত হন না। যে পথগুলি বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে কিংবা যা চঞ্চলতা উৎপন্ন করে, তিনি সেই পথে আসেন না। যে পথ শরীরের প্রতি আসক্তিকে নষ্ট করে, সেই পথে চলারই সাধনা তিনি করেন। শরীরের প্রতি আসক্তি ও মমত্ব বিসর্জিত হলে স্বয়ং শরীরই তখন বিসর্জিত হয়। আমাদের মানসিক স্থিরতার পথে এবং মানসিক স্থিরতার দিকে প্রতিবন্ধক শরীর বিসর্জিত হলে থাকে কেবল শরীর। সে বেচারি আর কি এমন গণ্ডগোল করবে? শরীর থাকলে কোন বিপদও হয় না। শরীর ত্যাগ করার অর্থ কিন্তু মৃত্যু বরণ নয়। শরীর ত্যাগের অর্থ, আমাদের চঞ্চলতাকে যেন সমাপ্ত করে দেয়। চঞ্চলতার দিকে যেন আমাদের নিয়ে না যায়। আসক্তি ত্যাগ করব। আসক্তি ত্যাগ করলেই যে শরীর আমাদের চঞ্চল করে দিত, তার মৃত্যু ঘটবে।

মানসিক চাপ তৈরি হয় কল্পনা থেকে। কল্পনা তৈরি হয় মমত্ব থেকে, আসক্তি থেকে। আমরা যখন শ্রমদান করি, কাজ করি, তার পরে একটা অ-শেষের অনুভূতি আসে। কিছু করাই শেষ নয়, এই অনুভূতি না থাকলে মন হালকা হয়ে যায়, শরীর হালকা হয়। কাজের অনেকটা বাকি আছে—এই চিন্তা আমাদের মস্তিষ্কে এবং মনে এত বোঝা চাপিয়ে দেয় যে, আমাদের কাজ করার ক্ষমতা অনেক কমে যায়। অ-শেষ বা শেষ না হওয়ার এই অনুভূতি মমত্ব এবং মানসিক চাপের বিসর্জন ঘটায়। শরীরের স্থিরতার এটি একটি বড় কারণ। শেষের অনুভূতি কিন্তু আমাদের ওপর যাবতীয় বোঝা চাপায়।*

মৃত্যুর সময় রাবণ বলেছিলেন, আমার মনে তিনটি কাজ শেষ করার ইচ্ছা ছিল। দুনিয়ায় এমন কোন্ মানুষ আছেন, মৃত্যুর সময় যাঁর মধ্যে শেষের অনুভূতি না জাগে, বা জীবদ্দশায় যদি কেউ শেষের অনুভূতি না করেন, প্রতিটি মুহূর্তেই অ-শেষের অনুভূতি করতে থাকেন—অর্থাৎ, কিছু করাই আমার শেষ নয়, বর্তমান মুহূর্তে যা পাচ্ছি তা হচ্ছে, আগামী মুহূর্তের জন্য কিছুই শেষ নয়—এমন অনুভূতি তাঁরই মধ্যে জাগতে পারে যিনি মমত্ব ত্যাগ করেছেন এবং শরীরের প্রতি নিরাসক্ত হয়েছেন।

এসব দৃষ্টিকোণকে মাথায় রেখে যদি আমরা শরীরের ওপরে বিচার করি, তাহলে এমন একটা স্থিতিতে পৌঁছতে পারব যখন শরীরের ক্রিয়া-অক্রিয়ার ওপরেই যে আমাদের মনের ক্রিয়া-অক্রিয়া, মনের চঞ্চলতা এবং স্থিরতা নির্ভরশীল, এ কথা বোঝা সহজ হবে। এজন্যই শরীরকে আমরা গৌণ হিসেবে ধরতে পারছি না। শরীরের মূল্যও কম করতে পারছি না। সাধনাক্ষেত্রে এদের মূল্য আমাদের নির্ণয় করতে হবে। সাধনার ক্ষেত্রে গতি আনতে চান, অগ্রসর হতে চান, অথচ যদি শরীরের সঠিক মূল্যায়ন না করেন তাহলে বুঝতে

হবে, সাধনাকে তিনি প্রতিকূল দিকে বা বিপরীত দিকে প্রয়োগ করতে চলেছেন।

প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, কায়া স্থির হলে মন স্থির হয়ে যায় এবং কায়া চঞ্চল হলে মন চঞ্চল হয়। ধ্যানের সময় শরীর স্থির থাকে, কিন্তু মন চঞ্চল থাকে। ভজন, কীর্তন, জপ ইত্যাদি করার সময় শরীর চঞ্চল থাকে, কিন্তু মন স্থির হয়ে যায়। আপনার দৃষ্টিতে এগুলি কি করে হয় ?

উত্তর : আমরা মনকে অহেতুক অপরাধী বানিয়ে রেখেছি। চঞ্চলতার ক্ষেত্রে মনের ততটা দোষ বা অপরাধ নেই, যতটা আমরা ভাবি। বেচারী মন হল বাহক। সে হল অভিব্যক্তির সাধন। আমাদের সামনে ইলেকট্রিক বালব রয়েছে। বিদ্যুৎপ্রবাহ এলে ঐ আলো জ্বলে ওঠে। বালব বিদ্যুৎ তৈরি করে না, কিন্তু তাকে প্রকট করে। মন চঞ্চলতা তৈরি করে না, তাকে প্রকট করে। চঞ্চলতা মনের নয় এবং মনের ভেতরেও তা থাকে না। চঞ্চলতা হল স্মৃতি এবং সংস্কারের। স্মৃতি আমাদের মস্তিষ্কের কোঠরে সঞ্চিত থাকে। আমাদের স্মৃতিকোষ উত্তেজিত হয়, বৃত্তিগুলি জাগ্রত হয়, মন তারই অভিব্যক্তি দেয়। এজন্যই মনের ওপরে আমরা সব দোষ চাপিয়ে দিই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, চঞ্চলতা সৃষ্টিতে মনের দোষ কোথায় ? আমাদের কায়ার স্থিতি ঠিক না থাকলে চঞ্চলতা দেখা দেয়। যদি আমরা সংস্কার বা স্মৃতি অর্জন না করি এবং যদি সেগুলি একটি ধারার মত আমাদের ভেতরে এসে দ্বিতীয় একটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে বাইরে চলে গেলে মন চঞ্চল হবে না। শরীর স্থির হলে মন চঞ্চল হয়, এ কথাটা বুঝতে আমাদের ভুল হতে পারে। শরীরের স্থিরতা সাধনা করুন বা না করুন, এটা বোঝা খুব সহজ নয়। আমার স্থিরতার মুদ্রায় বসতে পারি, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরের

সঙ্গে মনের যোগ না হয়, মন থেকে শব্দ এবং বিকল্প নিযুক্ত না হয়, উভয়ে সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্থিরতার সাধনা সম্ভব হয় না। শরীরের স্থিরতার জন্য যেমন তাতে গতিহীনতার প্রয়োজন, তেমনি যাতে আসক্তির বেগ না থাকে, সেটাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আসক্তির বন্ধনটি যদি সংযুক্ত থাকে, মমত্বের দড়ি দিয়ে যদি তাকে টানতে থাকি তাহলে শরীরের স্থিরতা সম্পাদিত হয় না, সঠিক অর্থে শরীর বিসর্জিতও হয় না। শরীরের অপ্রকম্পতা কিভাবে সম্পাদিত হয় তা-ও বোঝা আমাদের প্রয়োজন। এই সম্পাদন-কার্যের জন্য শরীরস্থ অঙ্গগুলিকে নির্দেশ দেওয়া খুবই দরকার। আপনি ভাবছেন, শরীরের অঙ্গগুলিকে নির্দেশ দিলে কি হয়। অঙ্গগুলি ঐ নির্দেশ মানবে কিনা। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন হচ্ছে। এটা আজ কেবল কল্পনা নয়, প্রয়োগ ক্ষেত্রেই এর উত্তর নিহিত আছে। আমরা যেমন অঙ্গকে নির্দেশ দিই, সেগুলি আমাদের নির্দেশ মানতে শুরু করে। কোষ্ঠবদ্ধতার ক্ষেত্রে যিনি আদেশের পরিবর্তে নিজ অন্ত্রকে মিষ্টি সুরে নির্দেশ দেন, তার মলত্যাগ-ক্রিয়া সহজ হতে শুরু করে। অন্যান্য অঙ্গগুলির ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার ঘটে। আপনি জানতে চাইবেন, কেন এমন হয়।

এর একটি কারণ আছে। ভগবান মহাবীরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—ভন্তে! আমাদের মন সজীব, না নির্জীব? চেতন, না অচেতন?

ভগবান বলেছিলেন—মন জীব নয়, অ-জীব। মন চেতন নয়, অচেতন। বাক্যের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ভগবান বললেন, বাক্য অ-জীব এবং অচেতন। কায়ার প্রসঙ্গে যখন প্রশ্ন করা হল তখন ভগবান বললেন—কায়া সজীব, আবার নির্জীব। কায়া চেতন, আবার অচেতন। কায়া চেতন কিভাবে হয়? তা পরমাণবিক। অণুগুলোর, পরমাণুগুলোর একটা সংঘাত হয়। তাহলে তা সজীব ও চেতন হয় কিভাবে?

কিন্তু এতে গভীর অর্থ আছে। কায়ার সঙ্গে আমাদের চেতনার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে শরীরের প্রতিটি অণুতে চেতনা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। চেতনা ছাড়া কায়ার প্রবৃত্তি হয় না এবং কায়া ছাড়া চেতনার অভিব্যক্তি হয় না। অভিব্যক্তির সবচেয়ে বড় এবং সর্বপ্রথম সাধন হল শরীর। এই নৈকট্যের কারণে, এই আত্মিকতার কারণে শরীরকে চেতনও বলা হয়। যেখানে চেতনার প্রবেশ, অণু অণুতে চেতনা ব্যাপ্ত হওয়ার ফলে কায়াকে আমরা যে নির্দেশ দিই, তা কায়া নয়, চেতনা সেই নির্দেশ প্রাপ্ত হয় এবং চৈতন্যময় যে অণুগুলি আছে তা আমাদের নির্দেশ স্বীকার করে, মেনে নেয় এবং আমরা যেদিকে তাদের নিয়ে যেতে চাই, সেখানে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। নির্দেশের ব্যাপারটাকে যদি আমরা ঠিকভাবে বুঝি এবং ধ্যানের আগে নিজের শরীরকে ঠিকমত নির্দেশ দিই এবং দেবার অভ্যাস করি, তাহলে কায়ায় আশ্চর্যজনকভাবে স্থিরতা আসতে শুরু করে। ঐ স্থিতিতে আমাদের মন এবং বাক্য একেবারে শান্ত হয়ে যাবে। মনের স্থিরতার জন্য কায়ার স্থিরতা প্রয়োজন। ঠিক তেমনি কায়ার স্থিরতা বোঝা এবং কায়ার স্থিরতার ঠিকভাবে সাধনা করা জরুরী। ঠিকভাবে এই সাধনা করলে কায়া স্থির হবার পরেও মন আর চঞ্চল থাকবে না। কায়া স্থির হলে মনও স্থির হয়ে যায়। ভজন, কীর্তন, জপ ইত্যাদিতে মন স্থির হয় না, এক দিক-গামী হয়। দিক-গামী হওয়া এক ব্যাপার, আর স্থির হওয়া ভিন্ন ব্যাপার। তাই এই দুই ব্যাপারে আমাদের ভ্রান্তি থাকা উচিত নয়। আমাদের ব্যাপ্তির বিপরীত ব্যাপ্তি যেন না হয়। যেখানে কায়ার স্থিরতা আছে, যেখানে মনের স্থিরতা আছে এবং যেখানে কায়ার চঞ্চলতা আছে, সেখানে মনের স্থিরতা নেই।

প্রশ্ন : অহংকার এবং অহংবোধের সঙ্গে কার সম্পর্কে আছে— মনের, না শরীরের? যদি মনের সঙ্গেই সম্বন্ধ থাকে তাহলে শরীর শিথিলকরণে লাভ কি?

উত্তর : শরীরের প্রবৃত্তি এবং সেই সঙ্গে শ্বাসের সংস্কার সাধনের ফলে যে আঘাত লাগে, তাতে স্মৃতি জাগ্রত হয় এবং স্মৃতি থেকে জাগ্রত অহংকার এবং অহংবোধ মনের ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। মনের অহংকার এবং অহংবোধের জাগরণ আমরা টের পাই, কিন্তু এ তো অভিব্যক্তি। ঐ ধারায় এদের প্রবাহিত হওয়া। কিন্তু এগুলি মন থেকে সৃষ্ট নয়, মন থেকে আগত নয়। নদীর প্রবাহধারায় কেউ যদি কাঠ জমিয়ে দেয় তাহলে আমরা কিন্তু একথা বলতে পারব না, ঐ ধারা থেকে কাঠের জন্ম হয়েছে। আসলে কাঠের জন্মদাতা হল অন্য কেউ। তার খোঁজ করতে হবে ভিন্ন পথে। অহংকার এবং অহংবোধের এই যে জন্ম, তা মনে হয় নি, মনে প্রবাহিত হচ্ছে মাত্র। এই কথাটাকে ঠিক ভাবে বুঝতে পারলে আমরা এ কথাও বুঝতে পারব যে, শরীর শিথিলকরণের ফলে বৃত্তিগুলির ওপর, সংস্কারের ওপর বা স্মৃতির ওপর কোন আঘাত পড়ে না এবং ঐ আঘাত ছাড়া অহংকার ও অহংবোধের ভাবনাও জাগ্রত হয় না। ঐগুলি জাগ্রত না হলে মনের ধারায় ওদের প্রবাহও হয় না। এভাবে যদি আমরা মূল পর্যন্ত বা গভীরে যেতে পারি তাহলে শরীরের চঞ্চলতা এবং স্থিরতার ওপরে আমাদের সংস্কার, প্রবৃত্তি, অহংকার এবং অহংবোধ প্রকটিত হওয়া বা না হওয়ার অনেকটাই যে নির্ভর করে, তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে।

৪.

চিত্তের নির্মাণ

- চিত্তের নির্মাণ ভিন্ন কেউ বেঁচে থাকতে পারে না।
- কোন্ ধরনের চিত্ত নির্মাণ করব?
- আমরা যেমনটি হতে চাই, তেমন চিত্ত নির্মাণ করুন
- চিত্ত-নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হল—
  - ধ্যেয়র চিন্তা
  - ধ্যেয়র সঙ্গে উদাত্ম হওয়া

অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব

আচার্য হেমচন্দ্র লিখেছেন, বস্তুকে যখন সংক্ষেপ করা হয় তখন তা অপর্যায় হয়ে যায়। পর্যায়কে স্বীকার না করলে বস্তু স্থিতিস্থাপক হয়ে যায়। আবার, বস্তুকে বিবেচনা করলে দ্রব্য সমাপ্ত হয়, কেবল শেষ পর্যন্ত পর্যায় রয়ে যায়। দুটি অবস্থা আছে—একটি হল, পর্যায়ের অবস্থা, আর দ্বিতীয়টি হল, দ্রব্যের অবস্থা বা বস্তুর অবস্থা। এই দুই অবস্থায় আমাদের জীবন সংঘটিত হয়। একটি হল অস্তিত্ব, অপরটি হল ব্যক্তিত্ব। অস্তিত্ব চায় হতে এবং ব্যক্তিত্ব চায় কিছু হতে। অস্তিত্বের অনুভূতি হল কেবল কিছু হওয়ার অনুভূতি। আমি আছি—এ ছাড়া আর কোন অনুভব হয় না। এই অস্তিত্বের অনুভূতিতে আমাদের পূর্ণ চেতনা সক্রিয় হয়। অনন্ত চেতনা সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমি একটা কিছু—এই হল আমাদের ব্যক্তিত্বের অনুভূতি। এতে আমাদের খণ্ড চেতনা সক্রিয় হয়। আমাদের

চেতনার এই দুটি অবস্থা আছে—যোগের ভাষায় এই দুই অবস্থাকে চিত্তাতীত অবস্থা এবং চিত্ত-নির্মাণের অবস্থা বলতে পারি।

চিত্তের দুই অবস্থা

চিত্তাতীত অবস্থায় চিত্ত থাকে না। অন্যটি অর্থাৎ চিত্ত নির্মাণের অবস্থা হল চিত্ত পর্যায়ের অবস্থা। শুদ্ধ আত্ম-দ্রব্যের অবস্থা হল চিত্ত-পর্যায় অবস্থা। আর, পর্যায়ের অবস্থা, যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলা হয় 'অনেরি' (অন্য) আত্মার অবস্থা, সেটিই হল চিত্ত-পর্যায়ের অবস্থা বা চিত্ত-নির্মাণের অবস্থা। চিত্ত এবং মনের একটি পর্যায় চলতে থাকে।

মন এবং চিত্ত এক নয়

সাধারণভাবে আমরা মনে করি চিত্ত এবং মন এক, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। অনুযোগ-দ্বার সূত্রে 'তচ্চিত, তন্মনা, তল্লেশ এরং তদ্-অধ্যবসায়'—এই ধরনের এক ক্রমপর্যায় চলতে থাকে। এই পর্যায়টি খুব সুন্দর। কখনও কখনও এদের পর্যায়বাচক শব্দ মনে হয়। কিন্তু এরা পর্যায়বাচক শব্দ নয়, উত্তরোত্তর অবস্থার সূচক। অধ্যবসায় হল আমাদের চেতনার সূক্ষ্ম পরিণতি। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয়েছে অবচেতন মন। অবচেতন মনের যে স্থিতি, তারই নাম হল অধ্যবসায়। আমাদের অধ্যাবসায় লেশ্যাকে প্রভাবিত করে এবং লেশ্যার দ্বারা মন তৈরি হয়. এবং তার ওপরে চিত্ত-নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত করে। চিত্ত হল বুদ্ধি, তা পরিবর্তনশীল নয়, স্থায়ী। মন পরিবর্তনশীল। মন উৎপন্ন হয় লেশ্যার দ্বারা। সাংখ্যদর্শন এবং যোগদর্শনে বলা হয়েছে, সত্ত্ব, রজঃ এবং তম—এই হল তিনটি গুণ এবং এই প্রকৃতি হল ত্রিগুণাত্মিকা। এই প্রকৃতি থেকেই মন উৎপন্ন হয়। চিত্ত উৎপন্ন হয়। জৈন দর্শনে যাকে লেশ্যা বলা হয়েছে, মনের উৎপত্তি হয় তা থেকেই। মনের যাবতীয় ক্রিয়া এবং যাবতীয় তন্ত্র হল ভৌতিক তন্ত্র। তাতে আপনা থেকেই চেতনা থাকে না। চেতনা উৎপন্ন হয় চিত্ত থেকে। মন, ইন্দ্রিয়,

স্মৃতি এবং প্রত্যভিজ্ঞা—এইগুলি হল যাবতীয় তন্ত্র। চেতনা তাতে সংক্রামিত হয় চিত্তের সাহায্যে। মন পরিবর্তনশীল। মন উৎপন্ন হয় লেশ্যা দ্বারা। অধ্যবসায় যে যে রকমের হয়, সেই রকমের বহিঃস্থ লেশ্যা তৈরি হয়। লেশ্যা তো থেকেই যায়। তার বর্ণে পরিবর্তন হয়। আজকের যোগের, ভাষায়, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম 'অরা' (Aura)। প্রতিটি মানুষের বাইরে অরা বা আভামণ্ডল উৎপন্ন হয়। প্রতিটি মানুষের চারপাশেই অরা থাকে। পরিপূর্ণ-ভাবে বিকশিত হলে চারদিকে তা ছ ফুট করে ছড়িয়ে পড়ে। এই 'অরা'-র আধারেই আমরা নির্ণয় করতে পারি, মানুষটি কেমন, তার স্বভাব কেমন, তার মনোভাব কেমন, সে সুস্থ আছে, না অসুস্থ ইত্যাদি।

ভারতীয় যোগ-শাস্ত্রে জ্যোতির আধারে ধ্যান করার কথা বলা হয়েছে এবং ধ্যান সম্পন্নকারী বলেন, আমি জ্যোতি দেখছি। এই জ্যোতি কি? এই জ্যোতি হল ঐ 'অরা'। জ্যোতিতে ধ্যান কেন্দ্রীভূত করলে আমরা অরার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি। নিজের প্রভামণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর ফলে সবচেয়ে আগে নিজ তেজোলেশ্যা থেকে উৎপন্ন হয় তেজস, তারপরে পাওয়া যায় তেজস অরা। এই তেজস অরাই আমাদের সামনে সবচেয়ে আগে ব্যক্ত হয়।

লেশ্যা এবং মন

যোগ-দর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও বলেছেন—মনের উৎপত্তি হয় তিনটি গুণ থেকে। শুক্ল, কৃষ্ণ এবং রক্ত—এই তিনটি হল মনের প্রকৃতি। জৈন দর্শনে লেশ্যার (চৈতন্যের ভাবধারা) সংখ্যা ছয় বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কৃষ্ণ (কালো), নীল এবং পায়রার রং—এই তিনটিকেই কৃষ্ণ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলে চালানো যায় এবং পদ্মকে লাল রূপের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শুক্ল লেশ্যার বর্ণ হল শুক্ল।

জীব থেকে উৎপন্ন হয় শরীর, শরীর থেকে তৈরি হয় বীর্য এবং বীর্য থেকে উৎপন্ন হয় যোগ। লেশ্যা থেকে উৎপন্ন হয় মনের যোগ। এই লেশ্যা হল শক্তির একটি বড় কেন্দ্র। মূলারাধনায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যবসায় শুদ্ধ হলে লেশ্যা শুদ্ধ হয়। আবার, বাইরের লেশ্যা শুদ্ধ হলে ভিতরের লেশ্যাও শুদ্ধ হয়। পুরোপুরি চক্র বিশেষ। অধ্যবসায়ের মাধ্যমে চলে আমরা চিত্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। একের পর এক শুদ্ধির পর্যায়গুলি আসতে থাকে। বাস্তবে এই লেশ্যা, প্রভা, প্রভামণ্ডল (অরা)—এরাই আমাদের মনকে তৈরি করে। এর থেকেই নির্মিত হয় মন। কারণ, মন তো পরিণামী মাত্র, তা স্বাস্থ্য তত্ত্ব নয়। মন পরিবর্তনশীল। একটি পর্যায় মাত্র। কষায় আত্মা থেকে কষায় মন তৈরি হয়েছে। নিমিত্তের দ্বারা কষায়-মন সমাপ্ত হয়েছে। পরক্ষণে কোন অনুকূল আবহাওয়া এসেছে, হর্ষ-মন নির্মিত হয়েছে। পরের ক্ষণে আবার কোন স্থিতি এল, শোক-মন নির্মিত হল। পরের মুহূর্তে এমন একটি কারণ এল যে ভয়-মন নির্মিত হল। একটি দিনের মধ্যে এভাবে হাজার হাজার মন নির্মিত হয়। আমাদের যত অনুভূতি আছে, যত পর্যায় আছে, মনও ততগুলি তৈরি হয়। একটি মনের নির্মাণ ঘটলে ঐ সময় ঐ বিশেষ অবস্থার অনুভব আমরা করি।

'কিছু হওয়াটা' গুরুত্বপূর্ণ কথা

দুটি অবস্থার কথা তাহলে এখন স্পষ্ট হয়ে গেল—একটি হল, চিত্তাতীত অবস্থা এবং অপরটি হল, চিত্ত নির্মাণের অবস্থা। আমাদের চিত্ত নির্মাণের কাজটি চলতেই থাকে এবং সংখ্যাতীত অবস্থার মধ্যে আমরা সঞ্চারণ করতে থাকি। একটি দিনে কত রকম অবস্থা যে চলে আসে তার ইয়ত্তা নেই। কারণ, পর্যায়ের পরিবর্তন হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে চিত্তের নির্মাণ ঘটতে থাকে। প্রশ্ন হল, বৃত্তাকারে এই যে বর্তুলাকার পর্যায়টি চলছে তাকে কি সেভাবেই চলতে দেব, না চিত্ত-নির্মাণের ব্যাপারটিকে নিজের অধীন করে নেব। যেমন

চাইব তেমন চিত্ত তৈরি করব। 'দশবৈকালিক'-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের উল্লেখ আছে। শব্দটি হল: 'হোকামেণং'—যা হতে চাই। 'কিছু হতে' চাই। এবং আমার পক্ষে 'কিছু হওয়া'টা জরুরী। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না চিত্তাতীত অবস্থায় সাধনা করা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না কিছু তো হতেই হবে। এখন, আমি কি হব, তা আমাকে বেছে নিতে হবে এর ভেতর থেকে। ভগবান মহাবীর বেছে নিয়েছিলেন। যত সাধক ছিলেন, তাঁরা সকলেই বেছে নিয়েছিলেন, কি হতে হবে তাঁদের। বেছে না নিলে কেউই কিছু হতে পারেন না। যিনি সাধক হন, তাঁকেও বেছে নিতে হয়. কি হতে চান তিনি। তারই ভিত্তিতে তিনি চিত্ত-নির্মাণের কাজটি শুরু হয়। এই পরিবর্তনশীল মনের অবস্থা থেকে আমাদের এমন জিনিস তৈরি করতে হবে, এমন সঘন নির্মাণ করতে হবে যাতে ঐ অবস্থাই আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে এবং এমন সাধন তৈরি হয় যেন দ্বিতীয় নির্মাণের অবস্থাটিকে উনি ভাঙ্গতে না পারেন, তা টক্কর খেতে না পারে। এই হল সঘন অবস্থা নির্মাণ। যা ত্রাতা হতে পারে বা কবচের কাজ করতে পারে।

চিত্তের নির্মাণ: সুখ-দুঃখের হেতু

চিত্ত নির্মাণের স্থিতির সঙ্গে সকলেই পরিচিত, কেউই অপরিচিত নন। যেমন চিত্ত নির্মিত হবে, তা তার পক্ষে তেমন সুখের বিষয় হবে। জনকয়েক জেলে মাছ ধরতে গেল। খুব জোরে বৃষ্টি পড়তে লাগল। ঐ বৃষ্টির জন্য তারা নিজের কাজ করতে না পেরে এক বাগানে গেল। বৃষ্টি আরও জোরে পড়তে লাগল। বাইরে বেরোতেই পারা যাচ্ছিল না। তাই তারা মালীকে বলল, শোবার জায়গা করে দাও। মালী তাদের জায়গা করে দিল। জেলেরা শুয়ে পড়ল। খুবই কষ্ট হচ্ছিল ওদের। শুলেও তাই তাদের কারুর চোখেই ঘুম আসছিল না। একটু পরে বিছানায় উঠে বসে বলল—ভীষণ দুর্গন্ধ আসছে, তাই ঘুম হচ্ছে না। পরস্পর

কথাবার্তাও বলল এই নিয়ে। তারপর মালীকে বলল—আমাদের ঘুম আসছে না। মালী বলল—কেন, বাড়ি তো ঠিকই আছে। এক বিন্দু বৃষ্টিও ভেতরে আসছে না। নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়। জেলেরা শুয়ে পড়ল, কিন্তু খানিক পরে ফের উঠে বসে বলল— কোথা থেকে যেন দুর্গন্ধ ভেসে আছে, এইজন্য ঘুম আসছে না। মালী বলল—দুর্গন্ধ তো কোথাও নেই, বরং এদিকে ফুল পড়ে আছে, তার সুগন্ধ আসছে। মালীটি ছিল বুদ্ধিমান। সে বলল—তোমাদের কাছে কি রয়েছে? ওরা বলল—মাছ রাখার কয়েকটা টুকরি আছে। মালী বলল—তোমাদের এভাবে ঘুম আসবে না। তোমরা টুকরি-গুলোকে নিজের মুখের ওপর রাখ, ঘুম আসবে। জেলেরা মালীর কথামত কাজ করতেই ওদের ঘুম এল।

এই হল চিত্তের নির্মাণ। জেলেদের চিত্ত এমন তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে মাছের বাসনাই হয়ে উঠেছিল তাদের সবচেয়ে প্রিয়। তাতেই তারা আনন্দ উপভোগ করত। ফুলের সুগন্ধ তাই ওদের কাছে হয়েছিল দুর্গন্ধ, আর মাছের গন্ধ হল সুগন্ধ।

জেলেদের কথাই বা বলি কেন, এমন চিত্ত তো কত মানুষেরই হয়। অনেক লোক আছেন খাবার সময় যুদ্ধ না করলে যাঁদের খাবার হজম হয় না। তাঁদের চিত্তের নির্মাণ ঐ রকম। ঐ সময় ওঁদের সংস্কার পরিপূর্ণ হয়। কেবল ঐ অবস্থাতেই ওঁদের আনন্দ অনুভূত হয়, অন্য সময়ে হয় না।

চিত্ত নির্মাণের প্রক্রিয়া

প্রতিটি মানুষই চিত্ত নির্মাণ করেন এবং চিত্তের নির্মাণ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। প্রশ্ন হল, আমরা কিভাবে চিত্ত নির্মাণ করব। যিনি 'কিছু হতে' চান, নিজে কিছু হতে চান, কিছু পেতে চান, তাঁকে এই নির্বাচন-পর্বটি সারতেই হবে। যা সহজে পাওয়া যায়, তার খেলনা হতে চাই না। যদি কিছু তৈরি করতে চান, তাহলে এই নির্মাণের চেষ্টা আপনাকে করতেই হবে। কিছু প্রক্রিয়ায়

তাকে আমরা তৈরি করতে চাই। এইজন্যই সবচেয়ে আগে আমাদের ধ্যেয়র নির্বাচন করে স্থির করতে হবে, আমরা কি হতে চাই। এক অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হতে চান। একটি ধ্যেয় তৈরি হল যে, ওঁকে সুস্থ-চিত্ত তৈরি করতে হবে। যিনি ব্রহ্মচারী থাকতে চান, তাঁকে ব্রহ্মচারী-চিত্ত তৈরি করতে হবে। কেউ যদি প্রসন্ন থাকতে চান তাহলে তাঁকে প্রসন্ন-চিত্ত নির্মাণ করতে হবে। এভাবে আমাদের যা আকাঙ্ক্ষিত, সেই ধ্যেয়টিকে আমাদের আগে বেছে নিতে হবে। ধ্যেয় যখন স্থির হয়ে গেল, তারপর ধ্যেয় পর্যন্ত পৌঁছনোর কাজ। কিভাবে পৌঁছব? এজন্য আমাদের একটি কল্পনার চিত্র তৈরি করতে হবে। ধ্যেয় পর্যন্ত পৌঁছতে চান, এমন যে কোন মানুষকেই ঐ চিত্রটি তৈরি করতে হবে। ব্রহ্মচর্যের স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছুতে হলে স্থূলিভদ্রের চিত্র তৈরি করতে হবে। এমন এক ব্যক্তির চিত্র তৈরি করতে হবে যাঁর মধ্যে আমাদের ধ্যেয় সম্পূর্ণ সাকার হয়। আমাদের চিত্র কাল্পনিক হোক, সেই চিত্র আমরা নেব এবং ধ্যানের মুদ্রায় বসব। শরীরকে একেবারে শূন্য করে দিলাম। ঐ চিত্ত এবং কল্পনাকে সাকার করলাম। কল্পনাকে সাকার করার পর আমরা প্রাণায়াম শুরু করলাম। ভাবী চিত্তের নির্মলতার জন্য, তার সঙ্গে সম্বন্ধে স্থাপনের জন্য রেচক এবং বাহ্য কুম্ভক হল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। প্রাণকে রেচন করে আমরা কুম্ভক করলাম। বাহ্য কুম্ভক। প্রাণকে আমরা যত বাইরে রাখব, ততই চিত্ত নির্মল হবে। চিত্ত নির্মল হলে তার প্রতিবিম্ব দ্রুত পড়ে যায়। চিত্তের নির্মলতার জন্য রেচক এবং বাহ্য কুম্ভক খুবই সুন্দর প্রক্রিয়া। প্রাণ যত বাইরে থাকবে তার তত নাড়ি-শুদ্ধি হবে এবং চিত্তেরও শুদ্ধি ঘটবে। পতঞ্জলি চমৎকার-ভাবে এর প্রতিপাদন করেছেন।

প্রাণের পৃথকীকরণে এবং ধারণায় চিত্ত প্রসন্ন হয়। এই পৃথকী-করণ হল রেচক এবং ধারণা হল বাহ্য কুম্ভক। উভয় স্থিতিকে আমাদের পেতে হবে। যেমন স্থূলিভদ্রের চিত্র আমরা সামনে

নিয়েছি। কল্পনায় ওদের পেছনে দৌড়বার প্রয়োজন নেই। তারা মূর্ত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যময় হয়ে আমাদের সামনে রয়েছে। রেচক করা হল, কুম্ভক করা হল, তারপর একবার তাদের দেখলাম। আবার রেচক করা হল, এবং আবার ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করা হল। এভাবে দু বার, চার বার, দশ বার, পঞ্চাশবার একই কাজ করা হল। দু-চার দিনের মধ্যেই এমন অনুভূতি এল যে ওদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। একেই বলা হয় তন্মূর্তিযোগ। তন্ময় হয়ে যেতে হবে। এই স্থিতিতে এবম্ভূতনয়-এর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রেচক এবং বাহ্য কুম্ভক বার বার করতে থাকলে ঐ রকম চিত্ত নির্মিত হতে থাকবে। চিত্তের নির্মাণ হবে, পর্যায়ের নির্মাণ হবে। কারণ, আমরা যখন স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকি তখন আমাদের কোন নিমিত্তের আবশ্যকতা থাকে না। এগুলি সব হল বৈভাবিক পর্যায়। চিত্তের নির্মাণ ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন, তা সর্বদাই বৈভাবিক পর্যায়—স্বাভাবিক পর্যায় নয়। এই বৈভাবিক পর্যায়ের প্রয়োজনীয়তা আমাদের রয়েছে এবং তা হল অপর বৈভাবিক পর্যায়ের সমস্যাগুলিকে অতিক্রমণের জন্য।

সুস্থ চিত্ত নির্মাণের জন্য যোগাচার্যরা চিন্তা করেছেন। একটা ছোট উদাহরণ দিই। খাওয়ার পরে কেউ বুঝলেন হজম ঠিক হয় নি, অগ্নিমান্দ্য হয়েছে, তাহলে কি করতে হবে? সেজন্য নির্দেশ দেওয়া হল, ভোজনের পরে আপনি সূর্যের ধ্যান করুন। সূর্যের কল্পনা করুন। অগ্নির কল্পনা করুন। এতে তেজের কল্পনা হবে। মনের পরিণতি হবে তেজোময়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি হল নির্মাণের, অর্থাৎ পূরকের। আমরা যে ধরনের চিত্ত নির্মাণ করতে চাই, তাতে তেজ-প্রধান তত্ত্বের প্রয়োজন পড়ে। অথবা শীত-প্রধান তত্ত্বের। শরীরে উত্তাপ নেওয়া, চিত্তপর্যায়কে উষ্ণতা দ্বারা উত্তেজিত করার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হলে আমাদের ডান স্বরের মাধ্যমে, ডান

নাসিকা থেকে শ্বাস নিয়ে কুম্ভক করতে হবে এবং কুম্ভক করে বাম নাসিকা দিয়ে তা বের করে দিতে হবে। বার বার এই পর্যায়টিকে অনুশীলন করুন। যতবার সম্ভব ততবার করুন। ডান স্বর থেকে নিন এবং বাঁ স্বর থেকে ত্যাগ করুন। পঞ্চাশ বার এরকম করে দেখুন। ঠাণ্ডার সময়েও, শীতকালেও, ঘাম বেরোতে শুরু করবে। এমন গরম স্বর তৈরি হবে যে ঐ অবস্থায় আপনি যে কোন অবস্থা তৈরি করতে পারবেন। তিব্বতেও এই প্রয়োগ প্রচলিত। সেখানে হিট-যোগেরও প্রয়োগ চলে। শীতের সময়ে সাধক তাঁর শিষ্যকে বরফের উপর শুইয়ে দেন এবং তাকে বলেন, ঘাম এনে দাও। শরীর থেকে যাবতীয় বস্ত্রকে অপসারিত করেন, তার পূরকের প্রয়োগ করেন। সূর্য স্বর দিয়ে শ্বাস নিতে শুরু করেন। প্রয়োগ করতে করতে যখন ঘাম বেরিয়ে আসতে থাকে, তখন শিষ্য ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

'আচারাঙ্গ সূত্রে' বলা হয়েছে, শীতের যে সময়ে অন্য লোক আশ্রয়ের সন্ধান করতেন, সেই সময় ভগবান মহাবীর বিনা বস্ত্রে বাইরে বেরিয়ে ঘুরতেন। ওঁর কি শীত অনুভব হতো না? হতো। কিন্তু কিছু কিছু প্রক্রিয়া আছে যার সাহায্য নিয়ে উনি শীতকে জয় করতেন। মনে করুন, পথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এমন এক পরিস্থিতি এল যে ঠাণ্ডার ভাবটা খুব বেশি হয়ে গেল। বাড়ি তখনও আসেন নি। খুব ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কি করবেন? একটি উপায় আপনি অবলম্বন করতে পারেন এবং উপায়টি হল যোগের সহজ ফরমূলা প্রয়োগ। ঐ সময় সূর্যের মত তেজোময় পদার্থের স্মৃতি বার বার মনে আনুন। বার বার স্মরণ করুন। মনকেও ঐ ভাবে তৈরি করুন। আপনার সঙ্কট বহুলাংশে দূর হয়ে যাবে। শীতের অনুভূতি খুব কম হবে এবং এমন একটা অনুভূতি হবে যে, আপনি যতটা গরম ভাব আপনি পেয়ে গেছেন।

ঠিক এই ভাবেই যদি আপনি শীত-চিত্ত নির্মাণ করতে চান,

তাহলে বিপরীত রূপটি প্রয়োগ করুন। শ্বাস নিন চন্দ্র স্বর দিয়ে, কুম্ভক করুন এবং সূর্য স্বর দিয়ে শ্বাস ত্যাগ করুন। বাঁ দিক নিয়ে ডান দিক থেকে ত্যাগ করুন। এই পর্যায়টিকে বার বার অনুসরণ করতে হবে। এক-দু বারে কিছু হবে না। কম করে বিশ-ত্রিশ, চল্লিশ-পঞ্চাশ বার করুন, তাহলে বুঝবেন ঠিক ঐ ধরনের চিত্ত নির্মিত হচ্ছে। বার বার করতে থাকুন। দেখবেন, বেশ ঠাণ্ডার অনুভূতি জাগছে। আরও একটি প্রক্রিয়া আছে, কিন্তু খুব শীতে তা করা উচিত নয়। শীতলী প্রাণায়াম, শীতকারী প্রাণায়াম এবং ভুজঙ্গী প্রাণায়াম—এই তিন প্রাণায়াম আমাদের শীত-চিত্ত নির্মাণ করে।

মনে করুন পেট খুব গরম হয়েছে, ভেতরটা যেন জ্বলছে মনে হচ্ছে। ভুজঙ্গী প্রাণায়াম করলে সঙ্গে সঙ্গে আপনার পেট ঠাণ্ডা হবে। এই প্রাণায়ামে সম্পূর্ণ মুখ খুলে খুব জোরে শ্বাস নিতে হয়। তখন এত ঠাণ্ডা লাগবে যে মনে হবে যেন মুখ দিয়ে গলার মধ্যে কোন ঠাণ্ডা জিনিস যাচ্ছে। গরম খুব বেড়েছে, ঐ সময় ঠাণ্ডা কোন জিনিসের কথা স্মরণ করুণ, যেমন বরফ, হিমালয় প্রভৃতি। তখন শীতল অনুভূতি শুরু হয়ে যাবে।

'বিশেষাবশ্যক ভাষ্যতে' জীবের অনুগ্রহ এবং উপঘাত সম্বন্ধে একটি আলোচনা আছে। উভয়ই সম্পন্ন হয় অণুর দ্বারা। মনের প্রসঙ্গে ওখানে আলোচনা করা হয়েছে যে, মন যদি ইষ্ট অণু গ্রহণ করে তবে জীবের অনুগ্রহ হয় এবং যদি অনিষ্ট অণু গ্রহণ করে তাহলে উপঘাত হয়। আপনি যদি প্রচুর চিন্তা করেন, অনেক শোক করেন, প্রচুর ঈর্ষা করেন, তাহলে ঐ ধরনের অণু গ্রহণের ফলে আপনার শরীর ও মনের ওপর এমন বাজে প্রভাব পড়বে যে আপনার শরীর ও মন দুই-ই খারাপ হতে শুরু করবে। উভয়ের পরিণতিই খারাপের দিকে এগোবে, অর্থাৎ উপঘাত হতে শুরু করবে। যদি আপনি প্রসন্নতা, মৈত্রী প্রভৃতি সুন্দর বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তাহলে আপনার মন সুন্দর হতে থাকবে, চিত্তও সুস্থ হতে শুরু করবে। ভোজনেরও

অনুগ্রহ এবং উপঘাত হয়। ভালো খাদ্য ভোজনে শরীর সুস্থ হয়, নীরোগ হয়, ভালো হয়। কিন্তু কুখাদ্য গ্রহণে শরীর বিকৃত হতে শুরু করে। স্থূল অণুগুলির প্রভাব-ক্ষমতাই যদি এত হয় তাহলে সূক্ষ্ম অণুগুলি তো আরও বেশি আমাদের প্রভাবিত করতে পারে। যাবতীয় অনুগ্রহের মূল হল, অনুগ্রহে সক্ষম সামগ্রীগুলি গ্রহণ এবং তারই আধারে চিত্ত-নির্মাণ। চিত্ত-নির্মাণের এই হল প্রক্রিয়া।

দুটি অবস্থা নির্মাণের আলোচনা আমরা করেছিলাম—একটি হল চিত্তাতীত অবস্থা এবং অপরটি হল, চিত্ত নির্মাণের অবস্থা। চিত্ত-নির্মাণ তো আমাদের হয়ই। কোন্ ধরনের চিত্ত নির্মাণ করব, সেটাই আমাদের স্থির করতে হবে। তৃতীয় যে প্রসঙ্গটি আসছে সেটি হল, যা আমাদের ধ্যেয়, তার অনুকূল সামগ্রীগুলিকে বেছে নিয়ে সেই ধরনের চিত্ত আমরা তৈরি করব। চতুর্থ কথাটি হল, চিত্ত-নির্মাণের প্রক্রিয়া নিয়ে। ঐ নির্মাণের প্রক্রিয়া কি হবে? এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধন হল, ধ্যেয়র কল্পনা বা ধ্যেয়র চিন্তা।

যথা ধ্যানবলাদ্ ধ্যাতা, শূন্যীকৃত্য স্ববিগ্রহম্।
ধ্যেয়স্বরূপাবিষ্টত্বাৎ, তাদৃক্ সম্পদ্যতে স্বয়ম্ ॥

—আবেশের প্রক্রিয়া হল ধ্যেয়র স্বরূপে আবিষ্ট হয়ে যাওয়া। আবেশ আসছে, আমাদের মনে ক্রোধ দেখা দিচ্ছে। মনে আবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গ উঁকি দিচ্ছে। আবিষ্ট হওয়ার অর্থ, একের অপরের মধ্যে প্রবেশ করা। নিজের শরীরকে তৈরি করা হয়েছে শূন্য এবং সামনে রয়েছে ধ্যেয়, এর মধ্যে আবিষ্ট হওয়া শুরু করা হল। ওর ভেতরে প্রবেশ করা শুরু করা হল। ভেতরে প্রবেশ করতে করতে এতটা প্রবেশ করা হল, ধ্যেয় এবং ধ্যাতা এক হয়ে গেল। এই হল গুণ-সংক্রমণের সিদ্ধান্ত। যোগীর দেহে ঐ রকম ধ্যান করলে গুণ-সংক্রমণ ঘটে. অর্থাৎ ধ্যেয়র যা গুণ তা তাঁর মধ্যে সংক্রামিত হয়। মহাবীরের সমস্ত গুণ আছে। মহাবীরের ধ্যানে আমরা যদি আবিষ্ট

হই তাহলে মহাবীরের সমত্ব আমাদের ভেতরে প্রকটিত হতে শুরু করবে। এই হল গুণ সংক্রমণের সিদ্ধান্ত।

যখন এই ধরনের চিত্ত নির্মাণ হয় তখন আপনা থেকেই বিকৃত মানসিকতা নির্মাণ স্থগিত হয়ে যায় এবং এভাবে আমরা নিজস্ব সাধন-পথ তৈরি করে নিয়ে নিজেদের মনের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারি। আমাদের জীবনধারণের জন্য, আমাদের সাধনার জন্য যে ধরনের চিত্ত-নির্মাণ প্রয়োজন, যে ধরনের পর্যায় তৈরি করা দরকার, সেই ধরনের পর্যায় তৈরি করে সেই পর্যায়ে চলতে চলতে আরো পর্যায়াতীত স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারি।

প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন: চিত্ত এবং মন—এই দুটি জিনিস কি আলাদা?

উত্তর: আমাদের যোগ্যতা অনুসারে চেতনার যে পর্যায় বিকশিত হয় তা হল চিত্ত এবং মন হল চিত্ত দ্বারা নির্মিত ক্রিয়া-সঞ্চালন-তন্ত্রের মুখ্য উপকরণ। এতে বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে শুরু করে স্মৃতি প্রত্যভিজ্ঞতা পর্যন্ত এক সম্পূর্ণ চক্র এসে যায়। ক্রিয়া সঞ্চালনের এক মুখ্য তন্ত্র হল, যার সাহায্যে আমরা বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি। ঐ পর্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়া সঞ্চালন করে মন। মন পরিবর্তনশীল। মন উৎপন্ন হয়, নষ্ট হয়। এই মুহূর্তে তৈরি হয়, আবার নষ্টও হয়। মনন-এর আগে মন হয় না, আবার মনন-এর পরেও মন হয় না। মন উৎপন্ন হতে থাকে এবং চিত্ত তার ওপর স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ চালাতে থাকে।

ধ্যানে বসে আমরা ভাবি, একটা বিষয়ের ওপর মনকে কেন্দ্রীভূত করব, কিন্তু মন কেন্দ্রীভূত হয় না। ভেতর থেকে কেউ যেন বলে, মনকে ওর ওপর কেন্দ্রীভূত কর। তাহলে মন কি দুটো কাজ করছে? তর্কশাস্ত্রে যেমন বলা হয়, অভিনেতা যতই কুশলী হোন না কেন, নিজের কাঁধে তিনি চড়তে পারেন না। মন দুটি কাজ কি করে

করবে? মন হল চঞ্চল, সেই চঞ্চলই নির্দেশ দিচ্ছে স্থির হতে— এই দুই বিপরীত ব্যাপার কি করে সম্পন্ন করতে পারে? বাস্তবে আমরা যদি দেখি তাহলেও দেখব, মন এবং চিত্ত এক নয়। মনের সক্রিয়তা আছে। মন চঞ্চল হয় এবং চঞ্চল হওয়াই তার কাজ। চিত্ত, বুদ্ধি বা বিবেক তাকে এই নির্দেশ দেয়—'স্থির হও'। আমরা স্থিরই হতে চাই, কিন্তু মন তো তার কাজ করে যায়। যদি মন নিজের কাজই করে, তাহলে সে স্থির থাকবে কি করে? মন যে স্থির হয় না, বাস্তবেও তা আমরা দেখি। তাহলে কি হবে? এর সুন্দর উত্তর দিয়েছেন এক বৌদ্ধ সাধক। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কিভাবে মন স্থির করব। তিনি বলেছিলেন—স্থির কি করবে? উৎপন্নই কোরো না, প্রতিষ্ঠাও কোরো না। উৎপন্ন না হওয়াই স্থিরতা। যে জিনিস চঞ্চল, যার স্বভাবই হল চঞ্চল হওয়া, যার অর্থই হল সক্রিয়তা বা ক্রিয়া করা, ক্রিয়াতন্ত্রকে সঞ্চালিত করা, সে কিভাবে স্থির হবে? এর অর্থ হল, মন উৎপন্ন কোরো না।

আমরা মৌন হই। তখন বলি, ভাষাকে আমরা স্থির করেছি। ভাষাকে আমরা কিভাবে স্থির করলাম? ভাষা উৎপন্নই করলাম না। ভাষা হল ভাষ্যমান। যদি না বলি, তাহলে ভাষা হবে কি করে?

মনের অনুৎপাদনই হল মনের স্থিরতা। মন পরিবর্তশীল, চিত্ত হল মনের স্থায়ী নিয়ন্ত্রণকারী বৌদ্ধিক চক্র। বৃত্তিগুলির কাজও মনের চঞ্চলতা। মনের জিম্মায় অনেক কাজ। যে বৃত্তিগুলি বিকশিত হয় তাকে বহন করাও মনের কাজ। মন এত বড় সংবাদ-বাহক এবং এত বড় ভার-বহনকারী খচ্চর যে তা প্রচুর ভার বয়ে থাকে।

একটি লোকের একটি খচ্চর হারিয়ে গিয়েছিল। সে পীরের কাছে গিয়ে বলল— আমার খচ্চরটি যদি পাই তাহলে এক টাকায় তাকে বেচে দেব। মানত করা হল এবং সংযোগবশতঃ খচ্চরটি পাওয়া গেল। এখন সমস্যা হল, একশো টাকার জিনিসটা

এক টাকায় কিভাবে বেচা যায়? মস্ত বিপদ দেখা দিল। কিন্তু মানত করা হয়েছে—এখন উপায়? লোকটিও ভাবল, কি করা যায়। একটা বিড়াল এনে তাকে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে দিল। বাজারে গিয়ে বলল— এই নাও, খচ্চর বিক্রি করছি। এক টাকায় খচ্চর, আর একশো টাকা দাম হল খচ্চরের উপরে বসা বিড়ালটার। নেবার হলে নিন। কিন্তু দুটো জন্তুই নিতে হবে—খচ্চরের সঙ্গে বিড়ালটিকেও। আলাদা আলাদা চাইলে পাবেন না।

ঠিক এই রকমই হল একশো টাকার বৃত্তিগুলি এবং এক টাকার মনের খচ্চর। দুটিই এক সঙ্গে রয়েছে। নিলে দুটোকেই এক সঙ্গে নিতে হবে। আলাদা আলাদা ভাবে পাওয়া যাবে না। বৃত্তিগুলিকে যেমন আলাদা পাওয়া যাবে না, মনকেও তেমনি আলাদা পাবেন না। মনের কাজ অনুরূপভাবে বেশ লম্বা-চওড়া। এজন্যই মন সক্রিয় হয়। মনের কোন দোষ নেই। সক্রিয়তার কারণ হল, সংসারের যাবতীয় ক্রিয়াতন্ত্রকে সঞ্চালন করাই হল মনের নিজস্ব সহজ নৈসর্গিক কাজ।

প্রশ্ন হল, বাইরের সঙ্গকে আমরা ছাড়ব কেন। এই যে বাড়ি, কাপড়-চোপড়, অন্যান্য জিনিসপত্র—এগুলিকে ছাড়ব কেন? ছাড়ার প্রয়োজন কোথায়? ওখানে বলা হয়েছে, এগুলির সঙ্গ না ছাড়লে কষায়ের উত্তেজনা বাড়বে। কষায় উত্তেজিত হলে অধ্যবসায় বিকৃত হবে। অধ্যবসায় বিকৃত হলে লেশ্যা অশুদ্ধ হবে। লেশ্যা অশুদ্ধ হলে অশুদ্ধ মন নির্মিত হবে। অশুদ্ধ মন তৈরি হলে চিত্ত বিকৃত হবে।

প্রশ্ন ঃ সূক্ষ্ম শরীর এবং 'অরা' কি এক নয়?

উত্তর ঃ অরা এবং সূক্ষ্ম শরীর দুটি আলাদা জিনিস। সূক্ষ্ম শরীর হল তেজস এবং কর্ম। অরা (লেশ্যা বা প্রভামণ্ডল) হল তেজস শরীর থেকে নির্গত প্রকাশ-রশ্মি। কর্ম-শরীর হল ভাবাত্মক শরীর। মানুষ মরে যায় এবং মরার সময় তার মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়—যেমনটি হয় কেউ হঠাৎ আত্মহত্যা করলে। মনে তীব্র

চিন্তা ছিল, কিন্তু পুরো হল না। দুর্ঘটনায় মারা গেল লোকটি। বলা হয়, এমন লোক ভূত হয়। দেখছে, বলছে, বারবার প্ল্যানচেটের সাহায্যে আত্মাকে অবতরণ করানো হচ্ছে, আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, আত্মাকে ডাকা হচ্ছে। কিছু কথা সে বলে। কিছু কথা সত্য প্রমাণিত হয়, আবার কখনও হয়ও না। এই সম্পূর্ণ ক্রমপর্যায়টি আত্মারও নয়, মূল শরীরেরও নয়। এ হল অপার্থিব শরীরের ক্রম। মূল শরীর থেকে যায়। আত্মা চলে যায়, কিন্তু তার সংস্কার থেকে যায়।

প্রশ্ন ঃ জৈন আগমে 'যোগবহন' নামে একটি শব্দ আছে। প্রাচীনকালে যোগের কোন বিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল কি, নাকি আজকাল যেমন আছে তেমনিই ছিল তা?

উত্তর ঃ আজকাল যোগবহনের পর্যকে আগম-অধ্যয়নের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্র পড়লে তার সঙ্গে খানিকটা আয়ংবিল করতেই হবে। অমুক অমুক তপস্যা করতে হবে। যোগবাহনের অর্থের সঙ্গে ব্যাপারটা খানিকটা অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও খুব পুরনো কথা নয়। এ হল যোগবহনের কল্পনা, উত্তরকালীন কল্পনা। আগমের ব্যবস্থা হলে অঙ্গ-উপাঙ্গের যে ব্যবস্থা হয় সেই অনুপাতে এই ব্যবস্থার বিধান হয়। কিন্তু যোগবহনের মূল অর্থ তা নয়। একটু গভীরে গেলে অর্থটা বুঝতে পারা যাবে। জৈন-পরম্পরায় ভাবনাযোগ, সংবর ধ্যান-যোগের প্রক্রিয়া খুব বড়। জায়গায় জায়গায় পাওয়া যায়—'জ্ঝাণ-কোট্‌ঠোবগত্র।' এই ধ্যান-প্রকোষ্ঠটি কি? এটিই হল চিত্ত-নির্মাণ। ধ্যান প্রকোষ্ঠে যাওয়া হল এক ধরনের চিত্ত-নির্মাণ প্রক্রিয়া। মহাপ্রাণ ধ্যান এবং সংবরধ্যানযোগেরও একটিই প্রক্রিয়া আছে— তা হল চিত্ত-নিরোধের প্রক্রিয়া বা আনাপানকে সূক্ষ্ম করার প্রক্রিয়া। শ্বাসকে এত সূক্ষ্ম করা হয় যে আনাপানকে সূক্ষ্মকারী মধ্যবর্তী চোদ্দটি পূর্ব বা বিশাল জ্ঞানরাশিকে স্মরণ করা সম্ভব হয়। ঐ প্রক্রিয়ায়, ঐ অর্থে এই শব্দ সম্ভবপর বলেই মনে হয়। কিন্তু

পরবর্তীকালে অন্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঐ প্রক্রিয়াটি পরিত্যক্ত হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বলতে হয়, আচার্য ভদ্রবাহু এবং স্থূলিভদ্রের পরে আমাদের ধারায় অনেক বড় পরিবর্তন ঘটেছে। কিছু কিছু অসুবিধে দেখা দিয়েছে। অনেকটা পরিবর্তন এসেছে। আমরা নিজেরাই অনুভব করব, আমাদের শ্বেতাম্বর ধারার চেয়ে দিগম্বর ধারায় ধ্যান-পদ্ধতি অনেক সুরক্ষিত রয়েছে। ধ্যানের সম্বন্ধে দিগম্বর আচার্যগণের যত গ্রন্থ আছে শ্বেতাম্বর আচার্যদের তত নেই। ওঁদের সাধনার চমৎকার ধারা অব্যহত রয়েছে। পরবর্তী ধারাগুলিতে ক্রিয়ার সংখ্যাধিক্য ঘটছে। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা যায়, যোগবহনের মৌলিক ধারাটি আমরা বিস্মৃত হয়েছি এবং পরবর্তীকালে সেখানে অন্য ধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ঃ মন এবং মস্তিষ্কের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ মন হল ভাবনা-প্রধান এবং মস্তিষ্ক হল চিন্তা-প্রধান। আমাদের ব্যবহারিক চেতনার তিনটি অঙ্গ—ভাবনা, চিন্তা এবং ক্রিয়া। আমাদের প্রবৃত্তির মুখ্য অঙ্গ হল এই তিনটি জিনিস। ভাবনার স্থান হল হৃদয়, চিন্তার স্থান হল মস্তিক এবং ক্রিয়ার স্থান হল সারা শরীর।

প্রশ্নটি হল মন আর মস্তিষ্কের। এক দিক থেকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে, মন আর মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে এক অতি গভীর সম্বন্ধ। মন নিজেই হল চিন্তার একটি অঙ্গ। কারণ আমরা যে বিষয় গ্রহণ করতে চাই তার সংবেদন পৌঁছয় মস্তিষ্ক পর্যন্ত। আমাদের মন-পরিব্যাপ্তির কেন্দ্রটি হওয়া উচিত বৃহৎ মস্তিষ্ক। বৃহৎ মস্তিষ্কে যে সংবেদন পৌঁছয় সেখানে এর অনুভব সম্পূর্ণ হবার পর তার পর্যালোচন হয়। ঐ পর্যালোচন-কার্যটি সম্পন্ন করে মন। মন এবং মস্তিষ্ক, উভয়ই একই ক্রিয়ায় সম্বন্ধযুক্ত। শরীরশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান মনকে মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া বলে। এই উক্তির সঙ্গে

আমরা একমত না হলেও, কিন্তু এ কথা মানব মনের প্রবৃত্তির সাধক অঙ্গ হল মস্তিষ্ক। এখানে থেকেই যাবতীয় ক্রিয়ার সঞ্চালন হয়। মস্তিষ্ক বিকৃত হলে মনের ক্রিয়াও বিকৃত হয়। মস্তিষ্ক সুস্থ হলে মনের ক্রিয়াও সুস্থ হয়। দুয়ের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্বন্ধ।

এখন প্রশ্ন হল ভাবপক্ষের ব্যাপারটি নিয়ে। আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুব বেশি। আর কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে মজ্জাদণ্ডের সঙ্গে। মজ্জাদণ্ডের কাজ হল ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা ভাবনাকে ত্যাগ করা।

এক ছিলেন সন্ন্যাসী। স্ত্রী-পুরুষ সবাই ঐ সন্ন্যাসীর পিছু লেগে থাকতেন। মজ্জাগত কিছু জিনিস তিনি দিতেন এবং তারই প্রভাবে তারা সংস্কারমুক্ত হতো। কিছুকাল পরে ধরা পড়ে গেলেন। খোঁজ করা হল। উনি বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মজ্জার অংশ বেরিয়ে না না যাচ্ছে, ততক্ষণ বিচার পরিবর্তিত হবে না। এজন্যই শ্রাবকের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তাঁর মজ্জা ধর্মের প্রেমে অনুরক্ত। ভাবনাত্মক জিনিস যত দেওয়া হয়, তার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে হৃদয়-চক্রের ওপরে। ওটি হল ভাবনার মুখ্য কেন্দ্র। মস্তিষ্কের নিচে মেরুদণ্ড থেকে এর নিয়ন্ত্রণ হয়। মেরুদণ্ড এবং মস্তিষ্কের মাঝে গলার যে অংশটি আছে তাকেই বলা হয় মজ্জাদণ্ড। মাংস পর্যন্ত যে জিনিস পৌঁছয়, তার এত প্রভাব পড়ে না। যা মজ্জাগত এবং অস্থিগত হয় তার প্রভাবই পড়ে খুব জোর। বোন টি. বি-র প্রভাব বেশি পড়ে। অস্থির চেয়েও এগিয়ে যখন তা মজ্জায় পৌঁছয় তখন তার প্রভাব হয় ভয়ঙ্কর। এই সংস্কারই হল মজ্জার ব্যাপার। কাজটা মনের নয়, তার নিচের স্তরের। রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি যত ভাবনা আছে, তার ওপরে নিয়ন্ত্রণ আনাই হল মেরুদণ্ড, মজ্জাদণ্ড এবং কণ্ঠমণির কাজ। ভাবনা এবং চিন্তা দুই-ই আলাদা আলাদা হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : বলার চেয়ে প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখাই কি

বেশি উচিত নয়? প্রয়োগ করার ব্যাপারেও আমাদের কিছু চিন্তা আছে কি?

উত্তর : প্রশ্ন ঠিকই আছে, কিন্তু আমি তো কোন যাদুকর নই যে একটা লাঠি ঘুরিয়ে দেব আর সব কিছু সিদ্ধ হয়ে যাবে। ঐ প্রক্রিয়া শ্রেষ্ঠও নয়। সাধককে বলে দিতে হয়, এই এই ভাবে কাজ করুন। করতে হবে আপনাকে নিজেকে এবং বাস্তবে সেটিই হল সমুচিত প্রক্রিয়া। ব্যক্তিকে নিজেকেই করতে হবে। কেউ কেউ সেরকম করেও থাকেন। চিকিৎসকের মত হৃদয়ের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তারপরে রইল চিত্ত-নির্মাণের, চিত্তাতীত অবস্থা নির্মাণের প্রশ্নটি। আপনারা জানেন, আমাদের কিছু কিছু কষ্টকর। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, কেবলমাত্র সংবর-এর পথে আমাদের গেলে চলে না, স্মৃতিকে ছেড়ে যেতে হয়, স্মৃতির অতীত হতে হয়। ঐ পর্যন্তই আমাদের গন্তব্যপথ। তবুও আমাদের নির্জরার সাধনার (জরাতীত) পথে অগ্রসর হতে হবে। কিছু কিছু জটিলতা আছে। এই জটিলতাগুলিকে অতিক্রম করতে হবে। জঙ্গল পার হতে হলে আমাদের বাহনের ওপরেও চড়তে হয়, নদী পার হতে হলে নৌকের ওপরে চড়তে হয়। যিনি দুর্বল, অথচ দু-তিন ঘণ্টা বসে ধ্যান করতে চান, শরীরে ক্ষমতা নেই, বসতে পারছেন না, তিনি ধ্যান করবেন কি করে? এমন ব্যক্তির পক্ষে সুস্থ চিত্ত তৈরি করা, অর্থাৎ সুস্থ শরীর তৈরি করাটা খুবই প্রয়োজন। তাহলে শরীর ঐ পরিস্থিতি সহ্য করার উপযুক্ত হবে, তারপর ধ্যেয় বিষয়ের অনুশীলন করতে হবে। স্থিতিকে পার করতে হবে, কিন্তু তাতে যেন জড়িয়ে না যান। চিত্ত নির্মাণ করার ক্ষমতা যিনি অর্জন করেন তিনি জড়িয়ে পড়েন না। প্রায়ই দেখা যায়, পরবর্তী চিত্ত নির্মাণের জন্য তিনি এগিয়ে চলেছেন।

৫.

চঞ্চলতার সংযোগস্থলে

- প্রথম চঞ্চলতা হল স্মৃতি।
- দ্বিতীয় চঞ্চলতা হল কল্পনা।
- তৃতীয় চঞ্চলতা হল ভবানা।
- স্থিরতা কি?

  স্মৃতি না হওয়া, কল্পনা না হওয়া ভাবনা না হওয়া।

চাণক্য এবং বৃদ্ধা

মহামন্ত্রী চাণক্য পথ চলছিলেন। এক গ্রামে থামলেন। আহারের জন্য এক বৃদ্ধার ঘরে গেলেন। বৃদ্ধা যথোচিথ আতিথ্য করলেন। অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানো ভারতীয়দের রীতি, ঠিক সেই রীতি মেনেই বৃদ্ধা চাণক্যকে অভ্যর্থনা জানালেন। আহারের জন্য চাণক্য বসলেন। বৃদ্ধা খিচুড়ি পরিবেষন করলেন। চাণক্য খেতে বসে খিচুড়ির মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিলেন। খিচুড়ি ছিল গরম। হাত পুড়ে গেল। তখুনি হাত তুলে নিয়ে হাত নাড়তে লাগলেন। বৃদ্ধা তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তুমি কি চাণক্যের মতই মহামূর্খ নাকি?' চাণক্য নিজের নাম শুনলেন, বেশ অবাক হয়ে হয়ে গেলেন। আমি মূর্খ! চাণক্য এবং মুর্খ—কিভাবে হয় তা? চাণক্য ছিলেন সে যুগের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত এবং বিদ্বান ব্যক্তি। শুধু ঐ যুগের নয়, ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চাণক্য একজন এমন মানুষ, যাঁর তুলনা আজও মেলা ভার। সেই চাণক্যকে

বৃদ্ধা বলছেন মূর্খ ! চাণক্য খুবই আশ্চর্য হলেন। বললেন—'মা ! চাণক্য মূর্খ হলেন কি করে ? বৃদ্ধা জানতেন না, তাঁর সামনে কে বসে আছেন। সামনে যিনি আছেন তিনি এক অতিথি—এইটুকুই জানেন তিনি। বৃদ্ধা বললেন—'তুমি জানো না, চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য পাটলিপুত্র আক্রমণ করছেন ? পাটলিপুত্রের দিকে দ্রুত এগোচ্ছেন। কিন্তু ওঁরা সোজা পাটলিপুত্রের দিকে যাচ্ছেন। মহানন্দ খুবই শক্তিশালী, মার খেয়ে পিছু হঠছেন। কি রকম মূর্খ আর জ্ঞানহীন দেখ ! ওঁর এই বোধ নেই যে, প্রথমে চারপাশের অঞ্চল জিতে নিতে হয়, আশপাশের অঞ্চল জিতে শক্তি বাড়িয়ে নিতে হয়, তারপর রাজধানীর ওপরে আক্রমণ চালাতে হয়। তুমিও এই ধরনের মূর্খ। খিচুড়ির মাঝখানে প্রথমে হাত দিয়েছ। প্রথমে খিচুড়ির চারপাশের যে জায়গাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সেখানে হাত দিতে হয়, ঐ জায়গার খিচুড়ি খেতে হয়। খেতে খেতে মাঝখানটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তারপর ওখানটা খেতে হয়। কিন্তু তুমি তো সোজা মাঝখানেই হাত দিয়েছ। তাহলে তুমি কি ঐ চাণক্যের মত মূর্খ নও ?'

সোজা মনকে ধরবেন না

বৃদ্ধার কথায় চাণক্যের এমন সুন্দর শিক্ষা হল যে উনি আর মূর্খ রইলেন না। এটা একটা গল্প। কিন্তু এটা বলার একটা কারণ আছে। আগের অধ্যায়ে আমি যখন শ্বাস ও শরীরের বিষয়ে বলছিলাম, তখন কিছু শ্রোতার, শ্রোতাদের অনেকাংশের মধ্যে মনে প্রশ্ন জেগেছে, যেখানে মনকে কিভাবে শান্ত করা যায়, কিভাবে মনকে একাগ্র করা যায় তা নিয়ে আলোচনা চলছিল, সেখানে কথা বলছি শরীর ও শ্বাস সম্বন্ধে—অথচ আমাদের ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে মনের ওপর।

যদি আমরা প্রথমে মনের ওপরেই আমাদের ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করতে চাই তাহলে আমরা চাণক্য যেভাবে খিচুড়ি খেয়ে মূর্খ হয়ে-

ছিলেন, ঐ রকমই মূর্খে পরিণত হব। প্রথমে মনকে স্পর্শ করার প্রয়োজন নেই। আমরা যদি ধ্যান করতে চাই এবং ধ্যানে স্থির হতে চাই, তাহলে প্রথমেই মনের ওপরে যাবতীয় চিন্তাকে সংযুক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রথমে যে খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়ে আছে, সেটাই খেতে হবে। আমাদের জেনে নিতে হবে, মনের আশেপাশে কি কি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া হয়। শ্বাসকে না বুঝেই যদি আমরা সরাসরি মনকে স্থির করার চেষ্টা করি তাহলে তা মূর্খতারই সামিল হবে।

কিভাবে তা সম্ভব তা বুঝতে হলে আমাদের একটু বিস্তৃত আলোচনায় যেতে হবে। মনের স্থিতি এবং ক্রিয়াকে বোঝা আমাদের পক্ষে খুবই জরুরী। একে স্থির করতে হবে। সেজন্য প্রথমে বোঝা দরকার, এটা কি? ক্রিয়া কি, প্রক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া কি? শরীরকে না বুঝে তা বোঝা সম্ভব নয়।

মনের পর্যাপ্তি প্রসঙ্গে আচার্যরা বেশ কিছু কথা বলেছেন। ইন্দ্রিয়ের এ সম্বন্ধে বলেছেন। নিবৃত্তি ইন্দ্রিয় এবং উপকরণ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে বলছেন। কিন্তু আজকের মনোবিজ্ঞান এবং শরীরশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থগুলিতে সম্বন্ধে কিছুই পড়ানো হয় না—ফলে এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রস্ফুটিত এবং বিকশিত হয় না। আমরা যদি প্রাচীন সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞানের তুলনামূলক অধ্যয়ন করি, তাহলে এই বিষয়গুলি যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠবে তেমনি তা বুঝতেও সুবিধে হবে।

দুটি জ্ঞানকেন্দ্র : মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড

মন চঞ্চল। কিন্তু চঞ্চলতা কি তা আমাদের আগে বুঝতে হবে। চঞ্চলতাকে না বুঝতে পারা পর্যন্ত মনকে স্থির করার যাবতীয় প্রচেষ্টাই বিফল হয়ে যাবে। তাই আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে, চঞ্চলতা কি। এজন্য আমাদের শরীরে যেতে হবে, কারণ আমাদের শরীরই হল জ্ঞানের মাধ্যম।

শরীরে দুটি জ্ঞানকেন্দ্র আছে—একটি হল মস্তিক বা বৃহৎ মস্তিষ্ক, এবং অপরটি হল, মেরুদণ্ড। এই দুটি হল প্রধান কেন্দ্র। আমাদের

সারা শরীরে তন্তুর জাল বিছানো রয়েছে। তন্তুগুলি দু রকমের—একদল জ্ঞান-গ্রহণকারী, অপর দল জ্ঞান বহনকারী। মূলার শেকড়ে আঁশের মত জিনিস আছে, সেগুলি মাটির রস আকর্ষণ করে, রসকে টেনে নেয়। ঠিক ঐ রকম আমাদের তন্তুগুলির মধ্যেও একরকম আঁশ থাকে, সেগুলি বিষয়কে গ্রহণ করে এবং পরবর্তী জ্ঞানবাহী তন্তু গৃহীত বিষয়কে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পেঁাছে দেয়। পরবর্তী এই তন্তুগুলির নাম জ্ঞানবাহী তন্তু (Sensory nerves)। বৃহৎ মস্তিষ্কের মধ্যভাগকে বলা হয় কর্টেক্স (Cortex)। জ্ঞান গ্রহণ-কারী তন্তু বা স্নায়ুগুলি বিষয়কে যেমন গ্রহণ করে, জ্ঞানবাহী স্নায়ু তেমনি তাঁকে নিয়ে যায় এবং মস্তিষ্কের কর্টেক্স পর্যন্ত পেঁাছে দেয়। তবেই অনুভব হয়, প্রত্যয় হয়।

দুটি ব্যাপার আছে—একটি জ্ঞানের, অন্যটি চেষ্টার। মস্তিষ্কে দুটি কেন্দ্র আছে—একটি জ্ঞানকেন্দ্র (Sensory centre), অপরটি চেষ্টাকেন্দ্র বা ক্রিয়াকেন্দ্র (Motor centre)। জ্ঞান-কেন্দ্রের কাজ হল জ্ঞান গ্রহণ করা। অনুভবের আদেশটি দেয় চেষ্টাকেন্দ্র বা ক্রিয়াকেন্দ্র। তারপর কাজ সম্পন্ন হয়। পায়ে কাঁটা ফুটল, যেখানে কাঁটা লাগল, সেখানের অনুভূতি মস্তিষ্ক পর্যন্ত পেঁাছল। সেখান থেকে হাতের কাছে নির্দেশ এল, কাঁটাটাকে তুলে ফেল। চেষ্টাকেন্দ্র সক্রিয় হল। ক্রিয়াকেন্দ্রের আদেশ পেতেই ক্রিয়াবাহী স্নায়ুগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে কাঁটাকে তুলে দিল। ঘটনা থেকে ক্রিয়া পর্যন্ত যাবতীয় অংশের এই হল প্রক্রিয়া।

প্রত্যয় বা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান

জ্ঞান এবং ক্রিয়ার জন্য এই হল আমাদের শরীরের প্রক্রিয়া। শীতকাল, আমরা বসে আছি। শীতল বাতাস বইছে। আমাদের ঠাণ্ডা লাগছে। এই লাগাটাই হল প্রত্যয় বা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি বা জ্ঞান হচ্ছে। এটা হল ইন্দ্রিয়ধর্মী জ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম প্রত্যয় (Percept)। ইন্দ্রিয়ের

এটি হল সঠিক অনুভূতি। এই অনুভূতি হওয়ার পর যা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, ইন্দ্রিয়ের যে জ্ঞান অর্জিত হল, তার সঙ্গে মন যুক্ত হয়। এরপর আমাদের প্রত্যয় হয়, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান লাভ হয়, তারপর আবার মন যুক্ত হয়। আমাদের ভাষায় এর নাম প্রথম 'ব্যঞ্জন'। ব্যঞ্জনের অর্থ হল, বিষয়ের অণু গৃহীত হয়ে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছনো। এর পরেই ব্যঞ্জনের বোধ অনুভূত হয়। মনের যোগ নয়, কেবল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানই থাকে। সেখানে আসার পথে এর সঙ্গে মন যুক্ত হয় এবং তা মানসিক বিষয়ে পরিণত হয়। এবং আমরা এগিয়ে চলি। মনের সঙ্গে সংযুক্ত ঐ সব বিষয়ে তর্ক, নৈরাশ্য ও ও হতাশা আসে। নির্ণয়ের পর ধারণা আসে, অনুভব ও শক্তির সঞ্চয় হয়।

শক্তি-সঞ্চয় পর্যন্ত আমরা একটা বিশেষ অবস্থায় পৌঁছে যাই। প্রত্যয় থেকে হয় শক্তি-সঞ্চয় অর্থাৎ ধারণা। এরপর কি হয়? এর পর শুরু হয় মনের কাজ। ধারণা হয়ে গেছে। আমাদের মস্তিষ্কে রয়েছে ধারণার প্রকোষ্ঠ। প্রত্যয় এসে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় —কখনই তা সামনে থাকে না। আমরা একটি মানুষকে দেখলাম। মানুষটি চলে গেল। কিন্তু প্রত্যয় বা নির্বিকল্প জ্ঞান নিজস্ব সংস্কার রেখে যায়। মস্তিষ্কে এক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা সেখানে সঞ্চিত থেকে যায়। প্রত্যয় তো চলে গেল, এরপর কি হবে? আমাদের মনে একটি প্রতিমা তৈরি হল। অপর কোন উত্তেজনা সামনে এল, ঐ ধারণা আবার জাগ্রত হল। একেই আমরা বলি স্মৃতি। সংস্কারের জাগরণের ফলে সৃষ্ট সংবেদনকেই বলা হয় স্মৃতি। বাসনার মধ্যে লুক্কায়িত সংস্কার জাগ্রত হল, স্মৃতিতে পরিণত হল। সংস্কার এবং বাসনার একটি নাম হল অবিচ্যুতি। যা কখনই চ্যুত হয় না। যার অনুভব হয় তার কখনই চ্যুতি ঘটে না। স্থায়ী হয়ে যায়। আমাদের সামনে তা স্পষ্ট হয়, স্মৃতি হয়ে যায়। এছাড়া আমাদের চঞ্চলতা আর কি?

চঞ্চলতার তিনটি কারণ

মনের তিনটি ক্রিয়া আছে—স্মৃতি, বিচার এবং কল্পনা। এরই নাম হল চঞ্চলতা। স্মৃতি না থাকলে চঞ্চলতা আসতে পারে না। ধ্যানে বসলে একটির পর একটি অনুভব স্মরণে আসে। মনে হয় যেন দরজার পাল্লা খুলে গেছে, নালা খুলে গেছে, জল প্রবাহিত হয়ে চলে আসছে সেখানে। স্মৃতির নালা খুলে যায়, দরজা খুলে যায়, আর তা ভরে দেয় সব কিছু। এই হল আমাদের চঞ্চলতা।

দ্বিতীয় চঞ্চলতা হল কল্পনা। আমরা সংকল্প ও বিকল্প করতে থাকি, কিন্তু কল্পনা কি? কল্পনা হল স্মৃতিরই এক পরিণাম বা ফলাফল। স্মৃতি না থাকলে কল্পনা হতে পারে না। কল্পনা হল স্মৃতিরই এক রূপ।

মনোবিজ্ঞান তিনটি জিনিসের কথা স্বীকার করে—স্মৃতি, প্রতিমা বা ছায়া এবং কল্পনা। আমরা একটা বড়ি দেখলাম, এগিয়ে গেলাম। বাড়ি ছেড়ে এলাম, কিন্তু নির্দিষ্ট সেই বাড়ির ছায়া আমাদের চোখের সামনে চলে আসে, প্রতিমা হয়ে যায়। প্রতিমা কি? স্মৃতি যেমন হবে তেমনি প্রতিমা তৈরি হবে। কল্পনা করে আমরা কিছু না কিছু নতুন জিনিস সঙ্গে জুড়ে দিই। গরমে বসে আছে একটি লোক। দারুণ গরম হাওয়া বইছে। ঘামে শরীর ভিজে একাকার। এই হল আমাদের প্রত্যয়। গরম চলে গেল। সন্ধ্যা এসে গেল, আবহাওয়া শীতল হয়ে গেল। স্মৃতিতে তখনও ঘুরছে—আঃ, কি গরমই না ছিল! কি পরিমাণ ঘামই না তখন বেরিয়েছিল! এই এক প্রতিমার আগমন ঘটল আমাদের সামনে। আবার দেখুন, কল্পনায় কি হয়। কোন বন্ধু এল। আরে ভাই, কি বলছ,আজ কি ভয়ঙ্কর গরমই না ছিল! কি গরমই না ছিল, যেন আগুন বৃষ্টি হচ্ছিল। এই আগুন কথাটিকে এখন জুড়ে দেওয়া হল। বৃষ্টির কথা জোড়া দেওয়া হল, আগুনকেও জোড়া হল—গরমের কথা চলে গেল। আগুন বৃষ্টি হচ্ছিল, আগুন আর বৃষ্টি

দুয়ের কথাই এক। এমনই হয় আমাদের কল্পনা। কল্পনা, স্মৃতি এবং বিচার - চঞ্চলতার এই হল তিন রূপ। তিনটিই হল মনের ক্রিয়া। তিনটি আলাদা নয়। মনের একই প্রক্রিয়া এবং শৃঙ্খলার মধ্যে তিনটি সম্পন্ন হয়। মনের ক্রিয়ার স্মৃতি, বিচার ও কল্পনা হয়। তিনটিই হয় মনের ক্রিয়ায়। তিনটিই চলে একই সঙ্গে। এরই নাম হল চঞ্চলতা।

স্মৃতির প্রতিফলন, কল্পনার তরঙ্গ এবং বিচারের শৃঙ্খলা—এরই নাম চঞ্চলতা। চঞ্চলতা, মনের ক্রিয়াশীলতা, সংস্কারের ক্রিয়াশীলতা—এ সবই হল একই কথা। এগুলি তো মনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মনের কাজ হল গতিশীলতা। তার কাজ বসে থাকা নয়। মনের কাজ হল গতিশীল হওয়া এবং গতিশীল থাকা। আমরা যখন মন তৈরি করব, মনকে রাখব, তখনও মন গতিশীল থাকবে এবং ঐভাবেই মন চলবে।

স্থিরতা কি ?

এখন প্রশ্ন উঠবে স্থিরতা প্রসঙ্গে। স্থিরতা কি, তার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। স্মৃতি, কল্পনা এবং বিচার না থাকাই হল স্থিরতা। ব্যাপারটা খুবই কঠিন। আমাদের অভ্যাস তৈরি হয়। একটি সংস্কার বা পরিশুদ্ধি সংস্কারই থেকে যায়, আর এক সংস্কার অভ্যাসে পরিণত হয়। যে সংস্কার গভীর হয়, সেটাই অভ্যাসে পরিণত হয়। একই কথাকে বার বার মনের মাঝে ঘোরাতে থাকুন, বার বার স্মরণ করুন, চিন্তাধারাকে বার বার কেন্দ্রীভূত করুন, দেখবেন তা সংস্কারের আগে অভ্যাসের রূপ নিয়েছে। অভ্যাসে পরিণত হবার পর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে আমরা চাই আর না চাই, ঐ কাজ করতেই হয়। কারণ অভ্যাসের মধ্যে সংস্কারের প্রগাঢ়তা থাকে।

স্মৃতির প্রতি অসহায়ত্ব

একটি গল্প আছে। গল্পটি খুব সুন্দর ঢংয়ে মনের স্থিতিকে প্রকাশ

করেছে। তিন বন্ধুর প্রত্যেকের এক একটি অভ্যাস ছিল। একজনের অভ্যাস ছিল বার বার চোখে হাত দেওয়ার, চোখ চুলকোনোর। দ্বিতীয় জনের অভ্যাস ছিল শরীর চুলকোনোর। তৃতীয়জনের অভ্যাস ছিল বার বার জলে হাত ডোবানোর। তিনটি অভ্যাসের কোনটিই কাজের নয়, কোন ব্যবহারও নেই এদের। কিন্তু অভ্যাস কখনও ব্যবহার-অব্যবহারের নিয়ম মানে না। সেখানে সংস্কার ও স্মৃতির প্রগাঢ়তার প্রশ্নটিই বড়। যে স্মৃতি প্রগাঢ় রূপ নেয়, যে সংস্কার গাঢ় হয়, ব্যক্তি সেই কাজ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, করে। ওদেরও এরকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। অন্যের কাছে তা খারাপ লাগত। আশেপাশের লোকেরা তা নিয়ে অনুযোগ করত, কিন্তু কি করবে? ওরা তো সংস্কারের দাস হয়ে পড়েছিল। তবু এক ব্যক্তি একদিন প্রস্তাব দিল, তোমরা যদি তোমাদের ওসব অভ্যাস ছেড়ে দাও তাহলে তোমাদের পুরস্কার দেব। প্রত্যেকে এক হাজার টাকা করে পাবে, কিন্তু এক দিনের মধ্যে একবারের জন্যও চোখে হাত দিতে পারবে না, শরীর চুলকোতে পারবে না, জলে হাত ডোবাতে পারবে না।

একদিকে টাকার লোভ, অন্যদিকে অভ্যাস ও সংস্কারের প্রগাঢ়তা। কিন্তু লোভ ছিল বেশি, তাই তিনজনেই ঐ প্রস্তাব স্বীকার করে নিল। ঐ ব্যক্তি ওদের তিনজনকে একটা নৌকোয় বসিয়ে দিল। নৌকোয় ঐ তিনজনের সঙ্গে আরও কিছু লোক রইল। নৌকো চলতে লাগল। কিন্তু বাস্তবে স্মৃতি যখন তীব্র হয়ে ওঠে, তখন তা মানুষকে দুর্বল করে দেয়, তার সঙ্কল্প ক্ষীণ হয়ে আসে। স্মৃতি প্রবল হল। সংস্কার জেগে উঠল, তাকে আটকানো গেল না। একজন ভাবল, কি করব, এভাবে তো হবে না। সে বলল, 'আজ আমি আপনাদের একটা ঘটনার কথা বলি। আমার এক মামা ছিল, মামার ছিল একটি ছাগল। ছাগলটার কান এত বড় ছিল যে

যখন সে তাকাত তখন কান দিয়ে চোখছুটোকে এভাবে মলে দিত।' এই বলে সে নিজের চোখ রগড়ে নিল।

দ্বিতীয়জন ভাবল, আরে, এ তো নিজের কাজ করে নিল! তার স্মৃতি আরও জেগে উঠল। সে বলল, 'তুমি কি বোকার মত কথা বলছ? আমি তো এর চেয়েও বড় ঘটনার কথা বলতে পারি। আমার এক ঠাকুরদা ছিল। সে ছিল খুব বড় পালোয়ান। সকালে উঠে আখড়ায় যেত, আখড়া থেকে মাটি নিয়ে নিজের শরীরে মালিশ করত, রগড়াত—এভাবে।' নিজের শরীর এই ফাঁকে সে রগড়ে নিল।

তৃতীয় জনেরও স্মৃতি জেগে উঠল। সে বলল, 'তোমারা তুজনেই বোকা। কই, তোমাদের দাদা আর মামা? মৃত ব্যক্তিদের কথা বলে কি লাভ? তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে হয়।' শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের নামে সে নিজের তু হাত জলে ডোবাল।

এগুলো কি? জলে হাত ডুবিয়ে ওর কোন আনন্দ হয় নি। চোখ রগড়ে প্রথমজন কিছুই পায় নি। শরীর রগড়ে দ্বিতীয়জন কিছু পায় নি, শরীর চুলকেও তার কিছু লাভ হয় নি। এ হল স্মৃতির আবেগ। স্মৃতি যখন তীব্র হয়, ঐ স্মৃতি তখন অভ্যাসের রূপ নেয়। যখন তা উত্তেজনার সঞ্চার করে, তখন ব্যক্তি সব কিছু ভুলে স্মৃতির অধীন হয়ে যায়। বলা যায়, চঞ্চল হয়ে ওঠে, ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঐ ক্ষোভ, উত্তেজনা এবং ঐ চঞ্চলতাই হল স্মৃতির কারণ। কল্পনার কারণেও এরকম হয়। বিচার-প্রবাহেও হয় এ রকম।

উত্তেজনার তুটি কারণ

কেন উত্তেজনা হয়? এর তুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হল, বিষয়ের সান্নিধ্য এবং দ্বিতীয় কারণটি আন্তরিক। কোন একটা ঘটনা বা বিষয় সামনে এল, চোখ তা দেখল, চোখের সংবেদন পৌঁছল মস্তিষ্ক পর্যন্ত, মন পর্যন্ত এবং মনের চঞ্চলতা বেড়ে গেল। এ হল বাইরের উত্তেজনা। আর রয়েছে ভেতরের উত্তেজনা।

আমাদের কাছে তারও গুরুত্ব অনেক। তা হল বায়ু এবং প্রাণ। শ্বাস এবং বায়ু। এই হল আন্তরিক উত্তেজনা। আমাদের শরীরের যাবতীয় কার্য বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হয়। বায়ু যদি না থাকে, শ্বাস যদি না থাকে, তাহলে শরীর তো একেবারে স্তম্ভের মত জড়পদার্থে পরিণত হবে। জ্ঞানবাহী এবং চেষ্টাবাহী স্নায়ু না থাকলে ঐ রকম অবস্থা দেখা দেবে।

জ্ঞানবাহী স্নায়ু যদি কেটে দেওয়া যায় তাহলে হাত চেষ্টা করবে, কিন্তু জানতে পারবে না। চেষ্টাবাহী স্নায়ুকে কেটে দিলে হাত জানতে পারবে, কিন্তু চেষ্টা করতে পারবে না। মনোবিজ্ঞানে ব্যাপারটিকে প্রয়োগ করে দেখা হয়েছে। এক ব্যক্তির চেষ্টাবাহী স্নায়ুকে কেটে দেওয়া হল। ব্যক্তিটির সামনে দৃশ্য রয়েছে, সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কোন কাজ করার ক্ষমতা তার নেই। কিছু করতেও পারছে না। হাতকে চালাতে পারছে না। জ্ঞানবাহী স্নায়ু এবং চেষ্টাবাহী স্নায়ু—উভয়ই পাশাপাশি মিলিত হয়। আবার, কল্পনা ও স্মৃতিরও যোগ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাজ সম্পন্ন হয়। ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বায়ুর দ্বারা।

বায়ু এবং ক্রিয়া

পূজ্যপাদ বিদ্যানন্দি সুন্দরভাবে লিখেছেন—

প্রয়ত্নাদ্ আত্মনো বায়ুঃ, রাগদ্বেষপ্রবর্তিতাৎ।
বায়োঃ শরীরযন্ত্রাণি, বর্তন্তে স্বেষু কর্মসু॥

আত্মার প্রযত্ন থেকে বায়ু সৃষ্টি হয়। ঐ বায়ুর দ্বারাই শরীরের যাবতীয় যন্ত্র সঞ্চালিত হয়, যাবতীয় ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। বায়ুর প্রচণ্ড গুরুত্ব আছে। শরীর এবং বায়ুকে যদি আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারি তাহলে চঞ্চলতা এবং স্থিরতা উভয়কেই ঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হবে। চঞ্চলতাকে দূর করে স্থিরতাকে লাভ করতে পারি। কিন্তু শরীর ও বায়ুকে ঠিকমত না বুঝলে কিছুই লাভ করা সম্ভব হবে না।

চোদ্দটি পূর্ব আছে। তার মধ্যে একটি হল 'প্রাণাবায়'—যার মধ্যে ছিল সারা প্রাণের বিবেক। ছিল বায়ু-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও তথ্য। প্রাণ ও অপান-সম্পর্কিত বিশ্লেষণ। আজ সেসব কিছুই নেই। এই বিশ্লেষণের গুরুত্ব যদি আমরা বুঝি, যদি ঠিকভাবে প্রাণকে বুঝতে পারি, শরীরের গঠন বুঝতে পারি, তাহলে মন কেন স্থির হয় না, সে ব্যাপারে আমাদের ভাবতেই হবে না। মনকে ধরার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের শেষ অঞ্চলটি জয় করে নিলে যেমন ঢাকা আপনা থেকেই হাতে চলে আসে, আমাদেরও তেমনি আপনা থেকে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যেন মনের চারদিক ঘেরাও হয়ে যায়। চারদিক ঘেরাও হলে মন আর কোথায় যাবে? সে তো চলতেই পারবে না।

ব্যানবায়ু এবং সঙ্কল্প-বিকল্প

প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান—এই পাঁচটি বায়ুকে মুখ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। ব্যানবায়ু ব্যাপ্ত থাকে আমাদের ত্বকে। তিব্বতের যোগীরা এই ব্যাপারে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা জননেন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী অঞ্চলকে ব্যানবায়ুর মুখ্য কেন্দ্র বলে ধরে থাকেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ব্যানবায়ুর প্রধান কেন্দ্র ওখানেই। সংকল্প এবং বিকল্প কি? ব্যানবায়ুর সঙ্গে মনের যোগ হলে তার নাম হয় সঙ্কল্প এবং বিকল্প। মনকে ব্যানবায়ু থেকে সরিয়ে নিন, সঙ্কল্প এবং বিকল্প তৈরিই হবে না।

'জালন্ধর বন্ধ'-এর পরিকল্পনা এই জন্যই। ব্যানবায়ুকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে জালন্ধর-কে বন্ধ করতে হয়, কণ্ঠে সংযম আনতে হয়। কণ্ঠে সংযম আনার অর্থ হল, ব্যানবায়ুর ওপরে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আনা।

লাড়নুর কথা বলছি। এক ব্যক্তি বসে ছিলেন। উনি বললেন—এখান থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে একটা মঠ আছে। আমি ওখানে গিয়ে এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার

এখানের ধ্যান-পদ্ধতি কি ? উনি বললেন—আমি তো বিশেষ কিছুই জানি না। আমাদের ধারা হল, ধ্যান করার জন্য যখন মনকে স্থির করতে চাই তখন গলার সঙ্গে চিবুককে আটকে রাখি এবং ধ্যান করি। এতে মন শান্ত ও স্থির হয়।

আমি ওকে বললাম, তুমি আসল কথাটাকে ধরতে পেরেছ। কারণ ব্যানবায়ুর সঙ্গে মনের সংযোগ ঘটলে সঙ্কল্প-বিকল্প তৈরি হয়, স্মৃতি জেগে ওঠে। শরীর চেষ্টা শুরু করে। ব্যানবায়ুকে নিয়ন্ত্রণে আনার সবচেয়ে মৌলিক এবং সুন্দর উপায় হল, কণ্ঠের ওপর সংযম করা। কণ্ঠের ওপরে সংযম করলে সঙ্কল্প, বিকল্প এবং কল্পনা কোথা থেকে আসবে ? তারা আসতেই পারবে না। আপনা থেকেই সঙ্কল্প, বিকল্প এবং কল্পনা সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং মনের স্থিরতাও সাধিত হবে আপনা থেকে।

খেচরী মুদ্রা এবং সংবর

শরীরকে না বুঝলে মনের স্থিরতার উপায় আমরা বুঝব কি করে ? চারপাশের সম্বন্ধে কিছুই বুঝলাম না, শরীরকে বোঝা হল না, শ্বাসকে বোঝা হল না, তাহলে কেবলমাত্র মনকে স্থির করার ব্যাপার আমরা কখনই বুঝতে পারব না। প্রক্রিয়াকে না বুঝলে কখনই মূল ব্যাপারকে বোঝা যায় না। আরও একটা কথা আমি আপনাদের বলব। মাদ্রাজে একটি লোকের দেখা পেয়েছিলাম। ভদ্রলোক জৈন, শ্রীমৎ রায়চন্দের পরম্পরায় বিশ্বাস রাখেন। উনি বললেন—মহারাজ ! কি করব ? আজ আমাদের জৈন সম্প্রদায়, এবং বলা উচিত যে, জৈন মুনিরাও ধ্যানের পরম্পরা থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছেন। ওঁরা জানেনই না, আমাদের পরম্পরাটি প্রকৃতপক্ষে কি। আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কি ধ্যান করেন ? হ্যাঁ, করি। কোন্ পরম্পরা অনুসারে করেন ? জৈন-পরম্পরা অনুসারে করি। আমি বললাম—জৈনদের পরম্পরাটি কি ? উনি বললেন—গুরুর কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি, জৈনদের ধ্যান করার সহজ

পরম্পরা হল, জিভকে উলটে দাও। বসে পড়। মন স্থির এবং শান্ত হয়ে যাবে। একেই হঠযোগে বলা হয়েছে 'খেচরী মুদ্রা'। জৈন পরম্পরায় একে বলা হয়েছে—সংবর করা। কিভাবে তা সম্ভব? জিভকে উলটে দিয়ে বসে পড়, তাহলেই হবে। মনের সংবর, বাক্যের সংবর এবং কায়ার সংবর। মনোগুপ্তি, বচনগুপ্তি এবং কায়গুপ্তি আপনা থেকেই তখন সাধিত হবে।

কথাটা খুবই সুন্দর। খেচরী মুদ্রার প্রসঙ্গ আমি জানতাম। কিন্তু জৈনদের মধ্যে যে এই প্রক্রিয়াটি রয়েছে তা আমি আমার ঐ মাদ্রাজে বাসরত ভাইয়ের কাছ থেকে শুনলাম। প্রক্রিয়াকে না বুঝলে মূল বিষয়কে কখনই অনুধাবন করা যায় না। এর উদ্দেশ্যও স্পষ্ট। যাবতীয় বায়ুর মধ্যে মূল বায়ু হল প্রাণ। ব্যান ইত্যাদি বায়ুগুলি সবই হল গৌণ, মূল হল প্রাণ। জিভ উলটে দিলে কি হয়? জিভকে যে মুহূর্তে উলটে দেওয়া হয়, প্রাণবায়ু উপর মস্তিষ্কে চলে যায়। প্রাণবায়ু ওপরে যাওয়ার অর্থ হল—মানসিক বিকল্পের শান্তি। মহাপ্রাণ ধ্যানের এই হল প্রথম ধাপ। ভদ্রবাহু স্বামী মহাপ্রাণ ধ্যান করেছিলেন। আচার্য আষাঢ়ভূতি মহাপ্রাণ ধ্যানের সাধনা করেছিলেন। এই মহাপ্রাণ ধ্যানের সাধনা কি? বায়ু এবং প্রাণকে মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া। কেন্দ্রীভূত করতে হবে একটি বিন্দুতে, যাতে প্রাণের যাবতীয় ক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে যায়। জিভকে উলটে দেবার মূল কারণ, মহাপ্রাণ ধ্যানের প্রথম পাদটির সাধনা। আপনার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, আর কিছু করারও দরকার নেই। যেই আপনি জিভ উলটে বসলেন, অমনি আপনার প্রাণবায়ু আপনা থেকেই ওপরে যেতে শুরু করবে। ঐ অবস্থায় যদি কেউ এক ঘণ্টা থাকেন তাহলে তিনি কতই না আনন্দ পাবেন! জিভ উলটে এক ঘণ্টা বসে থাকা খুবই কঠিন সাধনা। গরম দারুণ বেড়ে যাবে। চলা-ফেরার সময়ে এই কাজ করলে স্ফোটকের উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু শান্ত অবস্থায় করলে প্রাণবায়ু ওপরে চলে যায়। তখন আর এই

প্রশ্ন থাকে না, মনকে কিভাবে শান্ত করব, মনের বিকল্প কিভাবে মিটবে, চঞ্চলতা কিভাবে দূর হবে। চঞ্চলতা কিভাবে যাবে, এই প্রশ্ন আবার উঠতে পারে। চঞ্চলতাকে নিয়ে আসতে হয়। এ ব্যাপারে দুটি উদাহরণ আমি আপনাদের দিয়েছি—একটি হল খেচরী মুদ্রার বা জিভ উলটে বসে থাকার এবং অপরটি জালন্ধর বন্ধের বা কণ্ঠকূপের সংযম করার। এতে শ্বাসবায়ু বিজিত হয়, প্রাণবায়ু ওপরে যায়। আমাদের শরীরের সব সম্বন্ধের কথা আমরা জানি না। কিন্তু শরীর এবং প্রাণের যাবতীয় সম্বন্ধগুলি যদি আমরা বুঝে নিই এবং কিছুটা অভ্যাস করি তাহলে এই মনের প্রশ্ন, মনের চঞ্চলতার প্রশ্ন, স্মৃতির প্রতিফলনের প্রশ্ন এবং বিচারের প্রশ্ন আমাদের একে-বারেই থাকে না।

মনের শূন্য অবস্থা

বর্ণিত যাবতীয় প্রক্রিয়াগুলিতে মনকে শূন্য করা একটি বড় প্রসঙ্গ। চেতনার উদঘাটনের জন্য মনকে শূন্য করা খুবই প্রয়োজন। মনের দুটি অবস্থা হয়—শূন্য এবং পরম শূন্য। মনের শূন্যতার জন্য শরীর এবং বায়ুর উপরে ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করা খুবই প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে শ্বাস এবং শরীরের কথা আলোচনা করেছি। এই দুটি যখন ঠিক হয়ে যায়, মন তখন আপনা থেকেই শূন্য হয়ে পড়ে। মনের জন্য আলাদা কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই, মন আপনা থেকেই শূন্য হয়ে যায়। আজ আমরা শূন্যকে পূর্ণ করার চেষ্টা করি নি, পূর্ণকে শূন্য করার চেষ্টা করেছি।

আচার্য শ্রী বলছেন—যদি আমরা আগে কারণটাকে মিটিয়ে ফেলি, তাহলে কাজকে মেটানোর চেষ্টা করার কোন প্রয়োজনই পড়ে না। সবচেয়ে ভাল হয়, যদি কারণগুলিকে মেটানোর চেষ্টা আমরা করি। যখন নিমিত্ত থাকবে না, উপাদান থাকবে না, উভয়ের মিশ্রিত যোগাযোগ না হলে, কার্যেরও নিষ্পত্তি হবে না। এজন্যই যদি আমরা মনকে শান্ত করার চেষ্টা করি অথচ মনের

বিচলিত হবার কারণগুলিকে তেমনভাবেই রেখে দিই, তাহলে তিন কালেও মন কখনই শান্ত হবে না। এইজন্যই আজ আমরা কার্যকে বাদ দিয়ে কারণকে শান্ত করার প্রচেষ্টা করতেই বিশেষভাবে বলেছি। এখন এই বিষয়ে কিছু প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন।

প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন ঃ শরীরে যে চঞ্চলতা দেখা দেয় তা কেবল শরীর থেকেই হয় না। হাতকে এগিয়ে দিলে আমরা সুখস্পর্শের কল্পনা অনুভব করি। চোখ এগিয়ে গেলে তার পেছনেও মনের কিছু কল্পনা থাকে। শরীর যে কোন ক্রিয়াই করুক না কেন, মনকে বাদ দিয়ে তা হয় না। মন এগিয়ে চলে শরীরের সঙ্গে। তাই আমার মনে হয় শরীরের চেয়ে যদি আমরা মনকে শান্ত করার চেষ্টা করি তাহলে যাবতীয় ক্রিয়া আপনা থেকেই শান্ত হয়ে যাবে। অনুগ্রহ করে বিষয়টিকে স্পষ্ট করুন।

উত্তর ঃ মনের ওপর ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করার পক্ষপাতী যাঁরা তাঁরা প্রায়ই অজুহাত হিসেবে বলেন, মন স্থির থাকে না। হাজার হাজার সাধারণ মানুষও এই প্রশ্ন করে থাকেন। তাঁরা ধ্যান করার চেষ্টা করেন, কিন্তু চঞ্চলতা যায় না। এর কারণ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সংস্কার-কোষগুলিকে বুঝতে না পারি. সংস্কার-কোষের ওপরে সংঘটিত উত্তেজনাকে বুঝতে না পারি এবং সংস্কার-জাগরণ প্রক্রিয়ার সম্পাদন কিভাবে সম্ভব তা ধরতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত মনকে শূন্য করা সম্ভব হয় না। চঞ্চলতা আসে শরীরের মাধ্যমে বা স্মৃতির মাধ্যমে। স্মৃতি এবং শরীর, দুই-ই তখন খুব কাছাকাছি চলে আসে। কাছাকাছি শব্দটির অর্থ বলি। আমাদের স্মৃতির কোষগুলি থাকে মস্তিষ্কে। কেবল মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নয়, জৈন আগমের দৃষ্টিতে বিচার করলেও দেখা যাবে, আমাদের যাবতীয় বীর্য এবং শক্তি উৎপন্ন হয় আণবিক শক্তির আধারে। মস্তিষ্ক হল আমাদের মনঃপর্যাপ্তি

আবার, মস্তিষ্কই হল মনের শক্তিকেন্দ্র। প্রাণের শক্তি উৎপন্ন হয় মস্তিষ্ক এবং স্মৃতির প্রকোষ্ঠ থেকে। স্মৃতির প্রকোষ্ঠকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। মনোবৈজ্ঞানিকরা তা প্রয়োগও করেছেন। একটি কুকুরের জ্ঞানবাহী স্নায়ু কেটে দেওয়া হল। চোখ তার খোলা রয়েছে, সে দেখছে, কিন্তু কি দেখছে তা সে জানে না। বুঝতে পারছে না কিছুই, কেবল দেখছে। যেমন আজকাল ক্রোধবাহী তন্তুকে কেটে দিলে রাগ আর হয় না। রাগের উপকরণ সামনেই রয়েছে, কিন্তু রাগ আসবে না। শরীর এবং মন দুয়ের সম্মিলিত ক্রিয়া হল পর্যাপ্তি এবং প্রাণ। পর্যাপ্তি ছাড়া প্রাণের কার্য হয় না। পর্যাপ্তি ছাড়া প্রাণের প্রয়োগও সম্ভব হয় না। উপকরণ ইন্দ্রিয় খারাপ, নির্বৃত্তি ইন্দ্রিয় খারাপ। আমরা দেখতে পাব না, শুনতেও পাব না। আমরা কিছুই করতে পারব না। নির্বৃত্তি, উপকরণ এবং লব্ধির উপযোগ যখন ঘটে, তখনই এমন হয়। উপযোগকে আমরা চতুর্থ কক্ষের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। উপযোগ হল মনের চঞ্চলতা। যাবতীয় উপযোগ নয়, কেবল ইন্দ্রিয়ের উপযোগ। উপযোগ কখন হয়? নির্বৃত্তি আছে, উপকরণ আছে, কিন্তু কানের পর্দা ফেটে গেছে, তখন আপনি বাজনা বাজান আর সাইরেন বাজান যা-ই করুন, কান কিছুই শুনতে পাবে না। শুনতে না দিলে মনও ক্ষুব্ধ হবে না।

মনের চঞ্চলতার তিনটি সূক্ষ্ম সংবেদন হল—

১. ত্বকের সংবেদন
২. শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংবেদন
৩. চক্ষুর সংবেদন

এই তিনটি জিনিস আমাদের প্রভাবিত করে।

ত্বকের সংবেদন হল এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এটিই আমাদের মনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়টি হল শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তৃতীয়টি দর্শনের। ত্বকের সংবেদনকে শূন্য করে দিন,

শ্রুতি এবং চক্ষুর সংবেদনও শূন্য করুন। তাহলে কত রূপ, কত শব্দ, কত স্পর্শ চলে আসবে, আমাদের মনের ওপর কোনই প্রভাব পড়বে না। মনে কোন ক্ষোভও সৃষ্টি হবে না। জলের মধ্যে একটি ঢিল ছুঁড়ে দিন, কয়েক হাজার তরঙ্গ সৃষ্টি হবে। এই যে ঢেউ ওঠা, তা সম্ভব হচ্ছে ঢেলার জন্য। আমাদের মনে যে তরঙ্গ ওঠে —রাগের তরঙ্গ, দ্বেষের তরঙ্গ, ইচ্ছার তরঙ্গ, বাসনার তরঙ্গ—সব তরঙ্গই উঠছে উত্তেজনা পেয়ে। প্রজ্ঞাপনা সূত্রে খুব বিস্তৃতভাবে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, নিমিত্ত ছাড়া ভালো ভালো শক্তিও নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে, আবার খারাপ শক্তিও নিষ্কর্মা হয়ে যায়। যা নিমিত্ত, তা আমাদের উপাদানকে অভিব্যক্তি দেয়, এ কথাটাকেও আমরা গৌণ বলে মনে করতে পারি না। নিমিত্ত ছাড়া অভিব্যক্তি হতে পারে না। বিদ্যুতের ধারা অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু আলো জ্বলছে না, তার প্রকাশও সম্ভব হচ্ছে না। আলোর প্রকাশ তখনই সম্ভব হয় যখন অভিব্যক্তি প্রকাশকারী বাল্‌বটি থাকে। নিমিত্ত আমাদের সামনে উপাদানকে রাখে।

এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, মনকে শান্ত করতে পারলে এ সব আপনা থেকে ঠিক হয়ে যায়। আমাদের সামনে কোন অসুবিধে নেই— আলাদা ভাষায় বলছি না। কিছু লোক আছেন যাঁরা মনের ওপরে সোজা আঘাত করেন। কিন্তু এটা খুশি করার প্রসঙ্গ। আগে থেকে যাঁরা শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছেন, তাঁরা এমন কাজ করতে পারেন। এত শক্তি তাঁরা অর্জন করেছেন যে সোজা আক্রমণ চালিয়েছেন এবং বিজয়ী হয়েছেন। এগুলো খুব সামান্য কাজ নয়, সামান্য কথাও নয়। আসল কথা হল, নিমিত্তের ওপরে ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করা, নিমিত্তের সমস্যাগুলির সমাধান করা এবং উপাদানগুলিকে বশে নিয়ে আসা।

গভীরভাবে কর্মশাস্ত্রকে পড়লে আমরা আশ্চর্য হব। উদয়কালেই আমরা আগত কর্মফলকে শেষ করে দিই। কিন্তু স্থিতি বা নিমিত্তে

তথা দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাবের পরিবর্তন ঘটলে আগত কর্মকে তা বিফল করে দেয়, সংক্রামিত করে। ভেঙ্গেচুড়ে কাজকে পালটে দেয়। কর্ম পাপ কাজকে বাঁধল। অশুভ অণুর সঞ্চয় ঘটাল। তখন তীব্র প্রচেষ্টা শুরু হল শুভ ভাব আনার ; শুভ ভাব যাবতীয় অণুকে পুণ্যে বদলে দিল। সংক্রমণ করল। আমরা নিমিত্তকে রীতিমত গৌণতা দিই, কিন্তু ব্যাপারটা ততটা গৌণতার নয়। নিমিত্তের স্থান অনেকটা শুভ। আমরা 'অশ্রুত্ব কেবলী'র মত কথাকে বাদ দেব। এমন অনেক সময় হয়,যিনি ধর্মের কথা শোনেনই নি, কোন নিমিত্তের আশ্রয় নেন নি, অথচ তিনি 'কেবলী' হয়েছেন, উৎকৃষ্ট সাধকে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু অশ্রুত্বা-কেবলীর ব্যাপারটা কোন প্রক্রিয়া হতে পারে না প্রক্রিয়া হবে 'শ্রুতা-কেবলী'-এর—যিনি শুনে কেবল-জ্ঞানী হয়েছেন। ব্যবস্থার দিক দিয়ে বিচার করলে এই এই কথার ওপরে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে যে, শরীর এবং শ্বাসের প্রক্রিয়াতেই আমাদের চলতে হবে। প্রক্রিয়াটি হবে সত্যিকারের এক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার দৃষ্টিতে যেখানে আমাদের বিচার করা প্রয়োজন, সেখানে আমাদের প্রক্রিয়ার অধ্যায়েই শরীর এবং শ্বাস উভয়কেই গভীরভাবে বুঝে তারপর মনকে স্পর্শ করতে হবে, সেটিই হবে আমাদের উপযুক্ত প্রক্রিয়া।

প্রশ্ন ঃ সংস্কারের কেন্দ্রকে কিভাবে সংযত করা যায় ?

উত্তর ঃ সংস্কার সঞ্চিত থাকে। নিমিত্ত ছাড়া এই সঞ্চয়-শক্তি জাগ্রত হয় না। অমুক লোককে আমি দেখেছিলাম। পাঁচ বছর কেটে গেল, তার কথা মনে নেই। কিন্তু সামনে ঐ রকম পাগড়ি-পরা এক মানুষকে আসতে দেখলাম, যাঁকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ইনি তো অমুক ব্যক্তি। এই অমুকের স্মৃতিটি এল কেন ? পাগড়ির জন্য হল। ব্যক্তির আকৃতির জন্য হল। সংস্কার জাগ্রত হয় বিষয়ের উত্তেজনা পেলে। প্রতিসংলীনতার প্রয়োজন কেন, বা এর উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য হল, ইন্দ্রিয় পরিহার করা অর্থাৎ সংস্কারকে বিস্মৃত

হওয়া। সংস্কারের বিস্মৃতির এই সাধনকে বলা হয় প্রতিসংলীনতা। সংস্কারের জাগরণের আন্তরিক নিমিত্তটি বাকি রয়েছে। তা হল শরীরের ক্ষোভ, প্রাণের ক্ষোভ এবং বায়ুর ক্ষোভ। বায়ুর ওপরে বিজয়ী হওয়াটা খুবই জরুরী। প্রাণের ওপর বিজয়ী হওয়াটাও জরুরী।

আপনি নিজেই দেখবেন, যেদিন আপনার শরীরে বায়ু বেশি হয়ে যায়, সেদিন আপনি অস্থিরতা অনুভব করেন। ওপর থেকে এত চিন্তাধারা আসতে থাকে যে, মনে হয় যেন চিন্তার সাগর উপচে পড়ছে। বায়ু বেশি হলে মানুষ খুব বকতে থাকে, কথা বেশি বলে। বায়ুর প্রকোপ হলে স্বপ্ন দেখার পরিমাণও বেড়ে যায়। বায়ুর তীব্রতা আমাদের সংস্কার-কেন্দ্র এবং স্মৃতি-কোষ্ঠে আঘাত হানে। এজন্যই যোগাচার্যরা এ ব্যাপারে অনেক চিন্তা করে একটি পথ বের করেছেন যে, প্রাণকে মধ্যে নিয়ে যেতে হবে – ইড়া এবং পিঙ্গলা থেকে সরিয়ে সুষুম্নায় নিয়ে যেতে হবে। প্রাণ সুষুম্নায় গেলে বায়ুর যে আঘাত মস্তিষ্কে লাগে তা সমাপ্ত হবে। স্মৃতি-কোষ্ঠে যে আঘাত লাগে তা সমাপ্ত হবে। প্রাণকে মধ্যবর্তী না করে, সুষুম্নায় না নিয়ে গিয়ে স্মৃতি-চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।

ভগবান মহাবীর বলেছেন—'মজঝত্থো নিজ্জরাপেহী'। 'মধ্যস্থ' শব্দটির অর্থ আমরা করতে পারি— রাগ নয়, সমতার স্তরে থাকা। অর্থ তো ঠিকই আছে, কিন্তু সূত্রকারের কি মাত্র এই অভিপ্রায় ছিল? কারণ, যে অর্থ প্রচলিত আছে, তা মাত্র এটুকুই নয়।

একটা বই পড়ছিলাম। তাতে একটি শব্দ—'মহাবীথি'। তখুনি 'আচারাঙ্গ'-এর একটি বাক্য মনে পড়ল—'পণয়া বীরা মহাবীহীং'—অর্থাৎ মহাবীথির পথে যিনি নেমে পড়েন তিনিই বীর। কথাটার অর্থ কিছুই বুঝলাম না। মহাবীথির পথে যেতে হবে, অর্থাৎ রাজমার্গের ওপর যেতে হবে। রাজপথ থাকলে তাতে চলা

যায়, সংকীর্ণ পথ এলে তাতেও চলা যায়। স্পষ্ট বুঝলাম, অভিধানের অর্থ তো এখানে চলবে না। আসলে মহাবীথির একটি সাংকেতিক অর্থ আছে। এর অর্থ কি এই নয় যে, সাধনার যা মহাবীথি বা কুণ্ডলিনী, তাতে যিনি চলতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর মানুষ। মহাবীথির মানে হল কুণ্ডলিনী।

যে কোন তন্ত্রের বই খুলে দেখুন, দেখবেন, যিনি প্রাণকে সুষুম্নায় প্রবেশ করান নি, তিনি সঙ্কল্প থেকে মুক্তি পেতে পারেন না।

'মজ্‌ঝত্থো নিজ্জরাপেহী'—এটি মধ্যস্থ, কারণ তা নির্জরাপেক্ষী। নির্জরা অনেকে করেন। নির্জরা করার সবচেয়ে সুন্দর প্রক্রিয়া হল, প্রাণের সুষুম্নায় প্রবেশ। আন্তরিক স্মৃতির যে উত্তেজনা হয়, তা উপশমের পথ হল, প্রাণের মধ্যবর্তী হওয়া। এদিকে নয়, ওদিকেও নয়—মধ্যে আসতে হবে। ভারসাম্য স্থাপন করতে হবে। স্মৃতির ওপরে সংঘটিত প্রাণের আঘাতকে কম করার জন্য প্রাণকে মধ্যবর্তী করতে হবে। মধ্যস্থ হতে হবে। ভারসাম্য আনতে হবে।

আর একটি কথা আছে। সমতার ভাব যে-ই আসবে, তখন আপনি চান বা না চান, জানুন বা না জানুন, প্রাণ মধ্যবর্তী হয়ে যাবে। এই সমতা এবং প্রাণের মধ্যবর্তী হওয়া, উভয়ই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাধিত হয়। যদি আপনি প্রাণকে মাঝখানে নিয়ে যান তাহলে আপনার মনে সমতার প্রবাহ বইতে শুরু করবে। আপনি যদি সমতায় চলে যান তাহলে আপনার প্রাণ মধ্যবর্তী হবে। এ হল আমাদের আন্তরিক প্রক্রিয়া। এই দুয়ের সঙ্গে স্মৃতির যে তরঙ্গ রয়েছে, তা আপনা থেকে শান্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : স্মৃতি, বিচার এবং কল্পনা আমাদের মনকে চঞ্চল করে। এই হেতুকে নিরসনের দুটি প্রক্রিয়া আমাদের সামনে রয়েছে—প্রথমটি যোগের, দ্বিতীয়টি মনোবিজ্ঞানের। এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টিকে মেনে চলব ?

উত্তর : মনোবিজ্ঞানী বড় বিচিত্র পদ্ধতিতে অভ্যাস-নিবারণ করে থাকেন। আমরা যা দেখি তার নিচেও আরও অন্য কারণ থাকতে পারে। একটি লোক চোখে কম দেখতে লাগল। সে চিকিৎসককে দিয়ে চিকিৎসা করাল, কিছুই লাভ হল না। চিকিৎসক দেখলেন, চোখ একেবারে ঠিক, কোথাও কোন ত্রুটি নেই, অথচ লোকটি ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না। রোগী গেল এক মনোবিজ্ঞানীর কাছে। তিনি চোখ ভাল কি খারাপ তা পরীক্ষাই করলেন না। রোগীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্মৃতি কি কি ? তুমি কি কি করেছ ? সে সব কিছু বলতে বলতে এক সময় জানাল, একবার এমন এক ভয়ের আঘাত পেলাম যে চোখদুটো যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। মনোবিজ্ঞানী চোখের কোন চিকিৎসাই করলেন না। তিনি ভয়ের গ্রন্থিটিকে খোলার চেষ্টা করলেন। ঐ গ্রন্থিটিকে খুলতেই চোখ ঠিক হয়ে গেল। ঐ সময় তিনি ওকে অভয় দিলেন এবং ভালবাসার আবরণে রাখলেন। বন্ধুসুলভ কথাবার্তা বললেন। ভয়ের ভাবটা ধীরে ধীরে চলে গেল এবং লোকটা ভাল-ভাবেই দেখতে লাগল। এমন ধরনের আশ্চর্যজনক হাজার হাজার রকমের চিকিৎসা হয়ে চলেছে।

যে কোন ব্যাপারই হোক, তাকে যেন আমরা একাঙ্গী দৃষ্টিতে না দেখি। একাঙ্গী দৃষ্টিতে কিছু দেখা আমাদের পথ নয়। আমরা তো সব কিছুর সমন্বয় করে চলি। আমাদের সম্যক্ দর্শন কি ? ব্রত সংবর কি ? উভয়ই হল গ্রন্থি-বিমোচন ক্রিয়া।

সম্যক্ দর্শন হয়ে গেলে গ্রন্থিপাতের পথ বন্ধ হয়ে যায়। আমরা তখন প্রতিক্রমণ করি। প্রতিক্রমণ কি ? আজ আমরা একে একটা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত রূপ দিয়েছি। নইলে আজকের মনো-বিজ্ঞানের গ্রন্থি-বিমোচন প্রক্রিয়ার চেয়ে অনেক সুন্দর পথ হল প্রতিক্রমণ। যে কোন মনোবিজ্ঞানীর কাছে এখন যান। তিনি সবচেয়ে আগে আপনাকে শুইয়ে দেবেন। তারপর বলবেন, শরীর

শিথিল করে শুয়ে থাকুন, যাবতীয় মানসিক চাপকে দূর করুন। অর্থাৎ প্রথমে উনি আপনাকে কায়োৎসর্গ করাবেন।

প্রতিক্রমণে আমরা প্রথমে কায়োৎসর্গ করি। মনোবিজ্ঞানীও ঠিক সেই কাজই করেন। শুইয়ে দেবার পর তিনি বললেন, বলুন, আজ আপনি কি করেছেন, কাল কি করেছিলেন, পরশু কি করেছেন, এক মাস আগে কি করেছেন, এক বছর আগে কি করেছেন। বার বার উনি বলবেন, আমার সামনে আপনি দয়া করে কিছু লুকোবেন না। বাচ্চা ছেলে যেমন তার মাকে সব কিছু বলে ঠিক ঐভাবে আপনি বল্লে যান।

প্রতিক্রমণ কি ? পুরোনো কথাকে স্মরণ করুন। দশবৈকালিক-এ বলা হয়েছে—'আলোএজ্জ জহক্কমং'—ক্রমিক ধারানুসারে আলোচনা করুন। যদি এর ব্যতিক্রম ঘটে তাহলে ফের আগের কথায় ফিরে আসুন। মনোবিজ্ঞানীও তাই বলেন—সব কথা একটা নির্দিষ্ট ধারায় বলুন।

প্রতিক্রমণ কি আমাদের সাধনা নয় ? খুবই বড় সাধনা। হরিভদ্র সূরী খুব সুন্দরভাবে বলেছিলেন—আমাদের প্রতিক্রমণ, ঈর্ষা সমিতি, ভাষা সমিতি, প্রতিলিখন, আহার এবং উৎসর্গ সব কিছু হল যোগ। আমাদের চলাফেরাও যোগ। আমাদের প্রতিক্রমণও যোগ। আমরা সাধনাকে একটা পৃথক অর্থে বেঁধে দিয়েছি। ভগবান মহাবীর বলেছেন—চক্ষুর উন্মীলন-নিমীলনও উপযোগ দ্বারা সম্পন্ন করুন। যিনি তা করেন, তার কাজের একটা ধারা আসে। প্রথমে সময় আসে, তারপর ব্যক্তি তা ভোগ করে এবং সবশেষে সেটা সমাপ্ত করে। এমন সরল হয় ব্যাপারটা। এও একটা প্রক্রিয়া।

শরীরের সাধনা, মনের সাধনা এবং তার দ্বারা মনকে শান্ত করাও একটা প্রক্রিয়া। উভয়ই সাধন-প্রক্রিয়া। এখন আমাদের বেছে নিতে হবে, আজ কিসের প্রয়োজন বেশি ; রুটির প্রয়োজন আছে, দুধের দরকার আছে, আবার তরকারিও দরকার। আজ কি খাওয়া

হবে, তা ঠিক করতে হবে নিজেকেই। পেট গরম হলে বা পেটের গোলমাল হলে দুধ চলবে না। পেট ঠিক থাকলে, শরীর সুস্থ থাকলে তবেই দুধের দরকার। পেট ঠিক না থাকলে, দাস্ত হতে থাকলে দুধ তো আরও খারাপ করবে। ঠিক সেই রকম কোন্ সময় কোন্ ক্রিয়ার প্রয়োজন, কোন্ পদ্ধতি আমাদের উপযুক্ত, তা ঠিক করে ফেলা একটি বড় প্রশ্ন। উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় পদ্ধতিই আমাদের উপযুক্ত।

৬.

স্মৃতির বর্গীকরণ

- স্মৃতির চারটি প্রকারভেদ—
  - সংবদ্ধ স্মৃতি
  - অসংবদ্ধ স্মৃতি
  - নিরুদ্ধ স্মৃতি
  - স্মৃতি-শূন্যতা
- স্মৃতিকে উত্তেজিত করার তিনটি সাধন—
  - মন
  - শরীর
  - শ্বাস

চেতনার অভিব্যক্তির মাধ্যম—শরীর

ধার্মিক ব্যক্তিকে দ্বৈত জীবন যাপন করতে হয়। একটি হল, ভৌতিক জীবন এবং অপরটি হল, ওর ভেতরে লুকানো চেতনাময় জীবন বা আধ্যাত্মিক জীবন। যিনি ভৌতিক জীবন যাপন করেন, তিনি কেবল দৃশ্য জীবন যাপন করেন, শারীরিক ও ভৌতিক জীবন যাপন করেন। খুব গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন তাঁর হয় না। কিন্তু আধ্যাত্মিক পন্থানুযায়ী মানুষটি ঐ ভৌতিক আচরণ স্থির করে চেতনার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাই তাঁকে খুবই সূক্ষ্ম এবং গভীর তলদেশে নামতে হয়। আমাদের চেতনা অনাবৃত হয় এবং অনাবৃতই হতে থাকে। আবরণের অনেকটা অপসৃত হয়, কিন্তু

চেতনার জগতে তো ওটা ঠিক আছে। আবরণ উন্মোচিত হয়েছে, কিন্তু চেতনার অভিব্যক্তি হয় শরীরের মাধ্যমে। শরীরের মাধ্যম ছাড়া চেতনার কোন অভিব্যক্ত হয় না। চেতনার দুটি স্তর—অনাবৃত চেতনা এবং অভিব্যক্তি চেতনা। অনাবৃত চেতনা হল চেতনার অস্তিত্ব এবং তা নিজের স্বরূপেই থাকে। কিন্তু তার যাবতীয় অভিব্যক্তি হয় শরীরের মাধ্যমে। সে অভিব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের হোক, আর মনেরই হোক। ইন্দ্রিয়-চেতনা অভিব্যক্ত হয় আমাদের গোলকের মাধ্যমে।

চক্ষু একটি গোলক, তার মাধ্যমে দর্শন-চেতনা অভিব্যক্ত হয়। কর্ণ একটি গোলক, তার মাধ্যমে শ্রবণ-চেতনা অভিব্যক্ত হয়। এভাবে যাবতীয় অভিব্যক্তিই সংঘটিত হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ শরীরের মাধ্যমে। মন নিজের কাজ করে। মনোস্তরের চেতনা অভিব্যক্ত হয় মস্তিষ্কের মাধ্যমে। অথবা মেরুদণ্ডের মাধ্যমে। বৃহৎ মস্তিষ্ক, লঘু মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের মাধ্যমে মানসিক চেতনা-গুলি অভিব্যক্ত হয়। ঐন্দ্রিক স্তরের চেতনাই হোক, আর মানসিক স্তরের চেতনাই হোক, উভয়েই অভিব্যক্ত হয় শরীরের মাধ্যমে। এইজন্যই শরীরের রহস্য জানাটা আমাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। একথা আমি বুঝি, শরীরের রহস্য যিনি বুঝতে পারেন না, তিনি নিজের চেতনার অভিব্যক্তিকেও ঠিক করতে পারেন না। আর, ঐ অনাবৃত চেতনা পর্যন্ত পৌঁছনোও তাঁর পক্ষে খুব অসুবিধেদায়ক হয়ে ওঠে।

বন্ধনমুক্তি : রূপকের ভাষায়

এক ছিলেন মন্ত্রী। রাজা তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হলেন। মন্ত্রীকে উঁচু এক কারাগারে কয়েদ করলেন। ওঁর পত্নী ছিলেন খুবই পতিব্রতা। প্রতিদিন তিনি স্বামীকে দর্শন করতে যেতেন। আসতেন, দেখে চলে যেতেন। কিছুদিন পর পত্নী একদিন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি করে মুক্ত হতে পারেন, তার উপায়

বলুন। আপনি বুদ্ধিমান মন্ত্রী, কোন একটা উপায় বাতলে দিন। মন্ত্রী বললেন – একটা উপায় হতে পারে। কাল তুমি কিছু জিনিস নিয়ে এসো। পত্নী বললেন—কি জিনিস আনব? মন্ত্রী বললেন একটা ভোমরা, খানিকটা মধু আর একটা রেশমী সুতো নিয়ে এসো। তার সঙ্গে আনবে একটা খুব পাতলা সুতো, একটা মোটা সুতো আর একটা দড়ি। পরের দিন মন্ত্রীপত্নী সব জিনিস নিয়ে ওখানে এলেন। মন্ত্রী বসে আছেন উঁচু গম্বুজের ওপরে, মন্ত্রী-পত্নী এসে দাঁড়ালেন নিচে। মন্ত্রী যেমন বললেন, পত্নী তেমন কাজ করলেন। প্রথমে ভোমরার গায়ে রেশমী সুতো বেঁধে দিলেন। তার সঙ্গে বাঁধলেন পাতলা সুতো, তার সঙ্গে মোটা সুতো, তার সঙ্গে বাঁধলেন দড়িটা। তারপর খানিকটা মধু ভোমরার মাথায় লাগিয়ে ওকে ছেড়ে দিলেন। ভোমরা মধুর গন্ধ পাচ্ছিল। সে আরও ওপরে উড়ছিল। ভাবছিল, গন্ধটা কোথা থেকে আসছে। সে আরও ওপরে উঠতে লাগল। মন্ত্রী গম্বুজের ওপরে বসে ছিলেন। তিনি ভোমরাকে ধরে ফেললেন।

মন্ত্রী রেশমী সুতোকে টানতেই ছোট সুতোটা এসে পড়ল। ওটাকে টান দিতেই পাওয়া গেল পাতলা সুতো। সেটা টান দিতেই পাওয়া গেল মোটা সুতো, আর সেটাকে টান দিতেই হাতে এল মোটা দড়ি। মন্ত্রী দড়িটাকে ঠিক করে বাঁধলেন, তারপর দড়িটাকে নিচে ফেলে দিয়ে সেটার সাহচর্যে পালালেন।

বুদ্ধিমত্তার কাজের উদাহরণ এটি হলেও আসলে এটা একটা চমৎকার রূপক। যিনি রেশমী সুতো ধরতে পারেন, তাঁর হাতে পাতলা সুতো এসে যায়। পাতলা সুতো যাঁর হাতে আসে, মোটা সুতোও তার হাতে আসে। আবার, মোটা সুতো যাঁর হাতে এসে যায়, তিনি দড়িও পান। যাঁর হাতে দড়ি আসে, তিনি মুক্ত হন। গভীরে চলে যান।

এই শ্বাস হল রেশমী সুতো। এটি হাতে এলে পাতলা সুতো

অর্থাৎ নাড়িগুলি হাতে এসে যায়। নাড়িগুলিকে আটকানো গেলে বিচারের সুতোও হাতে এসে যায়। বিচারের সুতো হাতে এলে প্রাণের দড়ি আমাদের হাতে আসে এবং সেই সঙ্গে আমরা মুক্ত হই, নেমে যাই চেতনার গভীরে। চেতনার গভীরে গেলে সব বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্বাস, নাড়ি, বিচার এবং প্রাণ—এগুলিকে বোঝার প্রয়োজন আছে। প্রাণের গভীরে গেলে চেতনার গভীরে যাওয়ার রাস্তা আমাদের সামনে খুলে যায়। এটি খুবই মর্মভেদী এবং রহস্যজনক ব্যাপার। শ্বাসকে না বুঝলে আমরা নাড়িগুলিকে বুঝতে পারি না। নাড়িগুলিকে না বুঝলে আমরা বিচার বুঝতে পারব না। বিচার না বুঝলে প্রাণকে আমরা বুঝতে পারব না। প্রাণকে না বুঝে আমাদের পক্ষে চেতনার গভীরে যাওয়া সম্ভব নয়। যেখানে আমরা পৌঁছুতে চাই, সেখানে পৌঁছুতে পারব না।

আমাদের পৌঁছুতে হবে চেতনার গভীরে। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার যে রাস্তা এবং ক্রম আছে তা ছেড়ে যদি আমরা পৌঁছবার চেষ্টা করি তাহলে আমরা জড়িয়ে পড়ব, মাঝপথে আটকে পড়ব। এমন মনে হবে, এত করলাম, অথচ যেখানে পৌঁছুবার কথা, সেখানে পৌঁছুতে পারলাম না। এজন্যই শ্বাসকে বোঝা খুব জরুরী। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করেছি। আমাদের যে স্নায়ু রয়েছে সেগুলিকে—সম্পূর্ণ নাড়ি-সংস্থানকে যদি না বুঝি, তাহলে বিচারকে ঠিকমত অনুধাবন করতে পারব না। এগুলিকে বোঝা খুবই জরুরী। এদের বুঝতে পারলে বিচারকে বোঝা সরল কাজ হয়ে দাঁড়াবে। বিচার ব্যাপারটা এখানে চিন্তা বা স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত। আমাদের যাবতীয় সমস্যা কি? তা হল স্মৃতির সমস্যা। স্মৃতির ছেদটি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে তার থেকে সব কিছু ঝরে পড়তে থাকে। এজন্যই আমরা এখন গভীরভাবে এবং বিস্তৃতভাবে স্মৃতিকে বুঝতে চেষ্টা করব।

স্মৃতি : প্রকার এবং প্রক্রিয়া

আমাদের জীবনের অনেক কাজই স্মৃতির সাহায্যে চলে, স্মৃতির আধারে চলে। স্মৃতি চার প্রকার—

১. সংবদ্ধ স্মৃতি

২. অসংবদ্ধ স্মৃতি

৩. নিরুদ্ধ স্মৃতি

৪. স্মৃতি-শূন্যতা

প্রথমে হল সংবদ্ধ স্মৃতি বা সামান্য স্মৃতি। আমরা যে কথা মনে করি, ঐ কথা আমাদের স্মৃতিপথে আসতে থাকে। মানুষের সামান্য স্মৃতি আছে এবং ঐ আধারেই আমাদের জীবনের কাজ চলে। স্মৃতি না থাকলে আপনারাও এখানে একত্রিত হতেন না। স্মৃতি রয়েছে, আজ বেলা একটায় সভায় পৌঁছুতে হবে। এই ছিল ধারণা—এই ধারণা যে-ই স্মৃতি হল অমনি সবাই একত্রিত হলাম। স্মৃতিপথে যাওয়ার কথা উদিত হয় বলেই আমরা যাই। স্মৃতি রয়েছে বলেই আমরা কথাবার্তা বলি। স্মৃতি হয় বলেই আমরা আচরণ করি। স্মৃতি ছাড়া আমাদের জীবনের কোন কাজই চলে না। এই হল আমাদের সামান্য স্মৃতি—এই স্মৃতিই আমাদের যাবতীয় ব্যবহারকে সঞ্চালিত করে। কিন্তু এই স্মৃতিতেও এক অসুবিধে দেখা দেয়। তা হল অসংবদ্ধ স্মৃতি। অর্থাৎ স্মৃতি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। স্মৃতি হয়ে পড়ে সম্বন্ধহীন। একটি কথা মনে করার চেষ্টা শুরু করলাম তো মাঝে এত কথা এসে যেতে লাগল যে স্মৃতি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে উঠল। এই হল অসংবদ্ধ স্মৃতি। এতে কোন সম্বন্ধ থাকে না—যাবতীয় সম্বন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে একটি হল সংবদ্ধ স্মৃতি, এবং অপরটি হল অসংবদ্ধ স্মৃতি। শেষোক্তটিকে বিক্ষেপ বা পাগলামিও বলা যায়। অসংবদ্ধ স্মৃতি নানা রূপের হতে পারে। যেমন, স্মৃতির আবর্তন। একটি কথা মনে পড়ল। ঠাণ্ডা চলে গেছে, দুপুর হয়েছে—কিন্তু খুব ঠাণ্ডা ছিল, এই কথাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক

খাচ্ছে। এই স্মৃতিকে ছেড়ে দিলেও তা ত্যাগ করা যায় না। স্মৃতির আবর্তন হতেই থাকে। এসব অসংবদ্ধ স্মৃতির কারণেই ঘটে থাকে।

আর এক হয় স্মৃতির বিপর্যয়। বললাম কিছু, কিন্তু মনে রইল অপর কিছু। বলেছিলাম, তোমাকে ভীনাশর যেতে হবে। কিন্তু চলতে চলতে ভুলে গেল। যেখানে যাবার কথা সেখানটায় না গিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল। এমন হয় অনেকবার। বলেছিলেন, কথাবার্তা বলার জন্য চারটের সময় আসবেন। এলেন পাঁচটার সময় এবং যেই জিজ্ঞেস করলাম, এত দেরি করে কেন এলেন, তখন আপনি উত্তর দিলেন—আপনিই তো আমায় পাঁচটায় আসতে বলেছিলেন! এসব হয় স্মৃতির বিপর্যয়ের জন্য। দেশের বিপর্যয় হয়, কাল-বিপর্যয় হয়, বস্তু-বিপর্যয় ঘটে।

আচার্য শিষ্যদের বললেন—তোমাকে সাধনার মর্গে যেতে হবে। আমি তোমাকে একটা সূত্র দিচ্ছি। 'জীব দেহ থেকে ভিন্ন'—এই সূত্র তাকে দিলেন। কিছুটা সময় যেতেই শিষ্য তা ভুলে গেল। এগিয়ে গেল খানিকটা। দেখল একটা গোলায় তুষ আলাদা করা হচ্ছে। মাস আলাদা করা হচ্ছে। শিষ্যটি তা দেখল। কথা মনে পড়ল। ওহো, আচার্য তো বলেছেন—'তুষগুলির মধ্যে মাস ভিন্ন'। তুষ থেকে মাস আলাদা। কি রকম বিপর্যয় দেখুন তো। বলা হল এক কথা, মনে রইল তার খানিকটা। কিন্তু মূল যে কথাটি 'জীব দেহ থেকে ভিন্ন' তা সে ভুলে গেল। এরকম স্মৃতি-বিপর্যয়ও হয়ে থাকে।

স্মৃতির আবর্তন হয়। বিপর্যয় হয়। আর হয় বিস্মৃতি। অর্থাৎ একেবারে ভুলে যাওয়া। এখন বলল, আর দু মিনিট পরে ভুলে গেল। ভোলাটা স্বভাব হয়ে যায়। এগুলি সবই হল অসংবদ্ধ স্মৃতির স্রোত বা তারই পর্যায়। অসংবদ্ধতা—সম্বন্ধহীন স্মৃতি, স্মৃতি-বিপর্যয়, স্মৃতির আবর্তন এবং বিস্মৃতি—এগুলি সবই একটা

বর্গের মধ্যে পড়ে। কেন এমন হয়? মনোবিজ্ঞান এর কারণ হিসাবে বলেছে, সংস্কারের প্রতি আসক্তি। তাহলে অসংবদ্ধ স্মৃতি কেন হয়? কেন একই স্মৃতি বার বার আসে? তার কারণ, এখানে সংস্কারের প্রতি এমন আসক্তি হয়, সংস্কার এমন প্রগাঢ় হয় যে, কিছুতেই তাকে ত্যাগ করা যায় না।

স্মৃতি নিজে কোন জিনিস নয়। একে কেবল মাত্র অভিব্যক্তি বলা যায়। মূল জিনিস হল ধারণক্ষমতা, সংস্কারকোষ। এ হল মূল। সংস্কারকোষ যদি ঠিক থাকে তাহলে স্মৃতিও ঠিক হয়ে যায়। আবার, ঐ জিনিস যদি বিশৃঙ্খল হয় তাহলে স্মৃতিও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। ভারতীয় বৈদ্যরা এইজন্য কিছু কিছু ওষুধও আবিষ্কার করে-ছিলেন। ব্রাহ্মী, সারস্বত চূর্ণ, মালকাঙ্গনী প্রভৃতি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছিল। যদি মনে রাখার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে এই ওষুধগুলি ব্যবহার করুন, স্মৃতিশক্তি পুষ্ট হবে, কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে না। মালকাঙ্গনী এবং ব্রাহ্মী সেবনকারী মানুষ স্মৃতিশক্তির অনেকটা বিকাশ ঘটাতে পারেন।

পণ্ডিত রঘুনন্দনজী অনেক বার বলেছেন, উনি যখন শিক্ষার্থী ছিলেন, তখন ব্রাহ্মী পাতা প্রচুর খেয়েছেন। ওঁর স্মৃতিশক্তি হয়ে উঠেছিল খুব তীক্ষ্ণ। ধারণক্ষমতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে প্রতি দিন কয়েক শো শ্লোক মুখস্ত করে ফেলতেন। শুনলে অবাক হবেন, চরক এবং সুশ্রুত-এর বইদুটি ওঁর কণ্ঠস্থ ছিল। যে কোন শ্লোক উনি বলতে পারতেন। এই স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয়েছিল ঐ দ্রব্যগুলির দ্বারা।

'প্রজ্ঞাপনা সূত্রের' বৃত্তিতে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মী প্রভৃতি সেবনে স্মৃতিশক্তি পুষ্ট হয়, রীতিমত বেড়ে যায়।

হোমিওপ্যাথিতে এর ওপরে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। ওখানে এক একটি জিনিসের জন্য এক একটি ওষধির বিধান দেওয়া হয়েছে। আবেশের কারণে স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে পড়লে অমুক ওষুধ

নিতে পারেন। এক একটি ওষুধের পেছনে তার লক্ষণাবলী এবং অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনাও পাওয়া যায়।

যোগ পদ্ধতি বিধান দিয়েছে আসনের। স্মৃতি বা ধারণশক্তি দুর্বল হলে আপনি শীর্ষাসন, সর্বঙ্গাসন, জালন্ধর বন্ধ করুন। রং-চিকিৎসা এবং রং-পদ্ধতিতে এজন্য রঙের বিধান দেওয়া হয়েছে। স্মৃতির দুর্বলতা থাকলে বা ধারণশক্তি কমজোরী হলে আপনি আপনার মস্তিষ্ককে দশ মিনিটকাল হলুদ রঙের চিন্তায় মগ্ন রাখুন, দশ মিনিট ধূসর বর্ণ চিন্তা করুন, আপনার ধারণশক্তি অপেক্ষাকৃত তেজস্বী ও প্রবল হয়ে উঠবে। ওঁংকার-এর জপ করলে মস্তিষ্কে ম-কার ধ্বনির যে আঘাত উঠবে, তাতে আপনার স্মৃতিশক্তি প্রবল হয়ে উঠবে। এভাবে স্মৃতিশক্তিকে পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী করার জন্য বৈদ্য, চিকিৎসক ও যোগচার্যরা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি নিজের নিজের নিয়মে সৃষ্টি করছেন। আজও এদের ব্যবহার চলছে।

এ পর্যন্ত সাধনার কোন বড় মূল্য নেই। সেই মূল্য শুরু হয় এর পরে। যখন আমাদের স্মৃতি ঠিক হয়, স্মৃতি নিজের কাজ ঠিকমত করে, তখন অসংবদ্ধ স্মৃতি থেকে বেরিয়ে আমরা সংবদ্ধ স্মৃতির ভূমিকায় আসি। স্মৃতির বিক্ষেপও তখন হয় কম। নইলে কেমন হবে জানেন—খেতে বসলেন, তখন সারা দুনিয়ার কথা আমাদের মনে আসতে লাগল। এই হল স্মৃতির বিক্ষেপ বা অসংবদ্ধ স্মৃতি। পাগল কে? চিন্তাশক্তি যার আসক্ত, সে-ই পাগল। একটি কথাকে ধরলে তাকে আর ছাড়তেই চায় না। এই ধরাটা এমন বেগবান হয় যে মানুষটি পাগল হয়ে যায়। একই কথাকে সে আঁকড়ে ধরে থাকে। ভুলতে চাইলেও সেই কথাকে ভুলতে পারে না। এই হল স্মৃতির আবেগ, চিন্তার প্রসার এবং স্মৃতির প্রতি আসক্তি। অসংবদ্ধ স্মৃতি থেকে সংবদ্ধ স্মৃতিতে আনা একটা বিরাট বড় কাজ।

সাধনার দৃষ্টিতে সংবদ্ধ স্মৃতি থেকে আমাদের কোথায় যেতে হবে? এখানে আমাদের দুটি ভূমিকা আছে। একটি হল নিরুদ্ধ

স্মৃতির ভূমিকা, অপরটি হল স্মৃতিশূন্যতার ভূকিকা। নিরুদ্ধ স্মৃতির অর্থ, স্মৃতিকে একটি দিকে প্রবাহিত করা বা নিরুদ্ধ করা। 'নিরুদ্ধ' অর্থ আটকে দেওয়া নয়। এর অর্থ, কোন একটি জিনিসে লাগিয়ে দেওয়া বা ব্যাপ্ত করা।

ধ্যান কি ? 'একাগ্রে চিন্তানিরোধো ধ্যানম্'—একটি অবলম্বনের ওপরে চিন্তা—স্মৃতিকে ব্যাপ্ত করে দেওয়া হল ধ্যান। একটি লোককে একটি বাড়িতে আটকে দেওয়া হল। এর অর্থ, বাড়ির ঘরগুলির মধ্যে যে সে ঘোরাফেরা করতে পারবে না তা নয়, সে কেবল্ বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না। যে স্মৃতি একটি ধারাবাহী, একটি দিকগামী হয়, তাই হল নিরুদ্ধ স্মৃতি। সাধনার ক্রম শুরু হয় এখান থেকেই। স্মৃতিকে একটি ধারাবাহী করা, একটি দিকবাহী করা একটি দিকে তাকে প্রবাহিত করিয়ে দেওয়া, যাতে ঘুরে বেড়াতে পারে, এবং তার দ্বারা উৎপন্নি শক্তি যেন ছড়িয়ে না পড়ে—এই হল নিরুদ্ধ স্মৃতি।

নিরুদ্ধ স্মৃতি দু ধরনের হয়—বিষয়ানুগত এবং একবিন্দু-অনুগত। অথবা, শব্দানুগত এবং রূপানুগত। এক বিষয়ে একটি স্মৃতিকে বইয়ে দেবার নাম বিষয়ানুগ স্মৃতি। অর্থাৎ ঐ বিষয়ের বাইরে কখনই স্মৃতি যাবে না। আর, ঐ স্মৃতিকেই যদি সংক্ষিপ্ত করে একটি বিন্দুতে সংহত করা যায়—কোন শব্দের ওপরে, কোন রূপের ওপরে, কোন পরমাণুর ওপরে, অথবা কোন স্থূল বস্তুর ওপরে, তাহলে তা হয় একবিন্দু-অনুগত স্মৃতি।

সবচেয়ে শেষে আসে স্মৃতি-শূন্যতা। স্মৃতি থেকে একেবারে শূন্য হয়ে যাওয়া। এর অর্থ, আমরা চেতনার স্তর পর্যন্ত চলে গেছি। আমাদের চেতনা হয় স্মৃতির অতীত, জ্ঞানের অতীত এবং কল্পনার অতীত।

বীতরাগ চেতনা হবার পর কোন স্মৃতি হয় না, কল্পনা হয় না, কোন বিচার হয় না। এই স্মৃতি হয় ইন্দ্রিয়ের স্তরে, মানসস্তরে।

আমাদের চেতনারও উৎপত্তি ঘটে তখন। স্মৃতি হলে আমাদের মনে বিচার উৎপন্ন হয়। স্মৃতি ছাড়া বিচার হতে পারে না। স্মৃতি যেখানে নেই, বিচার সেখানে নেই। বিচার এবং স্মৃতি যেখানে নেই; সেখানে কল্পনাও হতে পারে না। বিচার এবং কল্পনা, তুয়েরই মূল আধার হল স্মৃতি। অর্থাৎ, স্মৃতিমূলক বিচার এবং স্মৃতিমূলক কল্পনা। এ সবই হয় স্মৃতির কারণে। চঞ্চলতার অর্থ হচ্ছে স্মৃতি। মনে ছেদ হওয়ার কারণ স্মৃতি। স্মৃতি আসে, মনে ছেদ রেখে যায়। মনের জল আটকে থাকে না, ঝরে পড়তে আরম্ভ করে, মন চঞ্চল হয়, উদ্বিগ্ন হয়। এই সব কথারই মূল হল স্মৃতি।

স্মৃতিকে নিরুদ্ধ করব, খুবই ভাল কথা। স্মৃতি-শূন্য হব, কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? এটাই আসল প্রশ্ন—কিভাবে করব। আর এই কাজটাকে সম্ভব করার পেছনে আমাদের শরীরের, নাড়ি-সংস্থানের ও শ্বাসের কতটা যোগ রয়েছে?

প্রকম্পনের সিদ্ধান্ত

আমাদের স্মৃতি কেন জাগ্রত হয়? উত্তেজনার কারণে স্মৃতি জাগ্রত হয়। বাইরের উত্তেজনা আসে, স্মৃতি জাগ্রত হয়। যখন আমরা উত্তেজনাকে আটকাই, তখনই স্মৃতি জাগ্রত হয়। এই জাগরণ ঘটে প্রকম্পনের সাহায্যে। প্রকম্পন ছাড়া স্মৃতি জাগ্রত হতে পারে না। স্মৃতির ভেতরে যে কথা আছে তা সেখানেই থেকে যাবে, ধারণাশক্তি উদ্বুদ্ধ হবে না। ধারণা জাগ্রত না হলে স্মৃতি জাগ্রত হয় না। স্মৃতির জাগরণ মানে ধারণা ও সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করা, জাগ্রত করা। এ সব হয় প্রকম্পনের সাহায্যে।

প্রকম্পনের সিদ্ধান্তকে অনুধাবন করা তাই আমাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন। প্রাচীনকালে চীনদেশে এক ধরনের বিদ্যালয় ছিল, তার নাম ছিল মিংচাই। বিদ্যালয়ের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ছিল না, বরং তা ছিল এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে। ঐ সম্প্রদায়ের কাজ ছিল

ব্যক্তি এবং বস্তুর সঠিক নাম নির্ধারণ করা। ওঁরা বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তি বা বস্তুর সঠিক নাম যদি না রাখা হয়, তাহলে ব্যক্তি বা বস্তুর সৃষ্ট প্রকম্পনটি ঠিক হবে না। প্রকম্পন ঠিক না হলে আমাদের শক্তি কমে যাবে। বিপরীতভাবে, প্রকম্পন সঠিক হলে শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে। ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালকদের কাছে সাধারণ মানুষ যেত, তাদের নাম ঠিক করে দিত বলত। তাঁরা নাম ঠিক করে দিতেন। এই নাম-নির্বাচনের পেছনে কাজ করত প্রকম্পনের সিদ্ধান্ত। নামের উচ্চারণে কোন্ ধরনের প্রকম্প সৃষ্টি হয় তা তাঁরা দেখতেন।

সিদ্ধান্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের চিত্ত নির্মিত হয় প্রকম্পনের দ্বারা। যে রকমের প্রকম্পন আমরা তৈরি করব, তেমন ক্রিয়া হতে থাকবে। আপনারা পড়েছেন, কৃষ্ণ-বাসুদেব তিনদিন উপবাস করেছিলেন। এই উপবাস সম্পূর্ণ হতেই দেবতার আসন প্রকম্পিত হতে আরম্ভ করে, দেবতা বুঝতে পারেন কে তাঁকে স্মরণ করছেন। তিনি কৃষ্ণ-বাসুদেবের কাছে চলে এলেন।

অভয়কুমার ঐ উপবাস করেছিলেন। জপ করতে করতে দেবতার আসন প্রকম্পিত হল, দেবতা এলেন। দেবতা কোথায় ছিলেন? সেই অসংখ্য যোজন দূরে। কোথায় অভয়কুমার, আর কোথায় কৃষ্ণ-বাসুদেব। কিভাবে জানতে পারলেন তাঁরা? ঐ প্রকম্পনের সিদ্ধান্ত কাজ করল এখানে। আমাদের মনের ত্যাগ করা ধারাবাহী প্রকম্পন, একটি দিকে গমনকারী প্রকম্পন এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে তা ওখানে পৌঁছে ঐ ব্যক্তির আসনকেও কাঁপিয়ে দেয় এবং ঐ ব্যক্তি বুঝতে পারেন কেউ তাঁকে স্মরণ করছেন।

বিচার-সম্প্রেষণ কিভাবে?

বিচার-সম্প্রেষণের সিদ্ধান্ত আজকেও চলছে। একটি বাড়িতে মনে করুন পাঁচটি কামরা আছে। পাঁচটি ঘরে পাঁচজন লোক বসে গেলেন এবং পারস্পরিক সঙ্কেত হচ্ছে। একজন কোন একটা বিষয়ে ভাবছেন। মধ্যবর্তী ঘরে যিনি বসে আছেন তাঁকে বলা হল,

এখন তোমাকে বিচারের সম্প্রেষণ করা হবে, তুমি খেয়াল রাখবে। এবার প্রথম ব্যক্তি বার বার প্রচণ্ড তীব্রতায় এবং একই ধারায়, সমান লয়ে, সমান সঙ্গীতে এবং সমান প্রবাহে নিজের বিচারকে চালিত করতে লাগলেন। উপস্থিত লোকটির মনে হতে লাগল কেউ যেন কথা বলে চলেছে। কথাগুলো আসছে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে। প্রথম ঘরের ব্যক্তিটি যা ভাবছেন তা একটি কার্ডে লিখে রাখলেন। আর মাঝের ঘরে উনি যা বলেছেন তা লেখা হল। দুই লেখাকে মেলান। উভয়ই একই বর্ণমালার হবে। একই বিচার এবং একই চিন্তা হবে। কিভাবে এই কাজটি হল ? এটি সম্পন্ন হয় প্রকম্পন প্রক্রিয়ায়। আমরা যখন এক দিকগামী প্রকম্পন তৈরি করি, একটি দিকে নিজের বিচারকে প্রবাহিত করে দিই, তখন বিচার হয় সম্প্রেষিত। আমাদের বিচার যেমন বাইরে যায় তেমনই তার ভেদন হয়। বিচার-ভেদ অর্থে মনের পরমাণুগুলির ভেদন, বাক্যের পরমাণুগুলির ভেদন এবং শরীরের পরমাণুগুলির ভেদন। এই ভেদন এত তীব্রগামী হয় যে পরমাণু ভেঙ্গে যায়। পরমাণুর ভেদন হলে যেমন শক্তি এবং উর্জা উৎপন্ন হয়. ঠিক তেমনি মনের ভেদন হলেও একটি শক্তি উৎপন্ন হয়। ঐ শক্তি এত সূক্ষ্ম ও দূরগামী হয় যে আমাদের বিচারের প্রকম্পনকে আমাদের সঙ্কল্পের স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায়।

নিরুদ্ধ-স্মৃতি : বিচার-সম্প্রেষণের মূল

এই নিরুদ্ধ স্মৃতি হল প্রকম্পনেরই সিদ্ধান্ত। আমাদের স্মৃতিকে একটি দিকে এমনভাবে প্রবাহিত করতে হবে, এমন এক প্রবাহকে তাতে তৈরি করতে হবে এবং তাকে সশক্ত করতে হবে যাতে আমরা ওকে যেখানে ছেড়ে দিতে চাই সেখানেই পৌঁছে যাবে। ইন্দোরে ছিলেন নেমীচন্দজী মোদী। উনি চমৎকারভাবে বিচার-সম্প্রেষণকে প্রয়োগ করতেন। একবার উনি নিজের স্ত্রীকে বললেন, তোমার যখন সন্তান হবে তখন তুমি আমায় স্মরণ কোরো। পত্নী তখন ছিলেন কিষণগড়ে, আর উনি ইন্দোরে। দুয়ের মধ্যে দূরত্ব অনেকটা।

স্ত্রী স্মরণ করলেন এবং সঙ্গে নেমীচন্দজী তাঁর ঘরের লোকদের জানিয়ে দিলেন, অমুক সময়ে আমার সন্তান হয়েছে। প্রামাণ্য সংবাদ চেয়ে পাঠানো হল। দেখা গেল, প্রকৃত সন্তানজন্মের সময়ের সঙ্গে নেমীচন্দজীর বলা সময়ের দু ঘণ্টা তফাৎ হচ্ছে। অর্থাৎ সন্তান ঐ সময়ের দু ঘণ্টা আগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এই পার্থক্য কেন হল, তারও খোঁজ করা হল? দেখা গেল, দু ঘণ্টা পর্যন্ত স্ত্রী বেঁহুশ ছিলেন। হুঁশ আসতে তিনি স্বামীকে স্মরণ করেন। স্মরণ করা মাত্র নেমীচন্দজী সেই সময়টিকে ধরে ফেললেন। অর্থাৎ স্ত্রী জাগ্রত হবার পর সম্প্রেষণ হল।

স্মৃতিকে যখন আমরা একটা জায়গায় আটকে দিই, একটি দিকে প্রবাহিত করি, তখন আমাদের প্রকম্পনের ক্ষমতা বেড়ে যায়। দু দিক থেকে হলে আরও সুবিধে হয়। কখনও কখনও দুটি ভিন্ন মানুষ একই সময়ে একই চিন্তাধারাকে প্রকট করে। শুনলে অবাক হবেন দুজনের চিন্তার শব্দাবলী পর্যন্ত এক হয়। এই সবই হল অনুভবের ব্যাপার। কখনও কখনও এমন হয়।

এখন প্রশ্ন হল, নিরুদ্ধ স্মৃতি কিভাবে হবে? এর জন্য আমাদের স্নায়ুগুলির বোধ খুবই প্রয়োজনীয়। আমাদের শরীরের স্নায়ুগুলির মধ্যে কিছু হল জ্ঞান গ্রহণকারী, আর কিছু হল জ্ঞান বহনকারী। এই দুয়ের জ্ঞান খুবই প্রয়োজনীয়। যাঁর এদের সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান নেই, তিনি সঠিক যোগীও হতে পারেন না। কোন্ স্নায়ু কোথা থেকে কোথায় গেছে এবং কোথায় গিয়ে নিজের কাজ শুরু করে, সে সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। চোখ একেবারে ঠিক আছে, এতটুকু গণ্ডগোল নেই। কিন্তু মস্তিষ্কের যেখানে চোখকে শক্তি যোগাবার যন্ত্রটি আছে, সেটিকে আপনি যদি কেটে দেন তাহলে দেখবেন, চোখ একেবারে ঠিক থাকলেও কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। বৃহৎ মস্তিষ্কে আমাদের যে শ্রুতিগ্রহণকারী স্নায়ু রয়েছে, তাকে আমরা আমাদের ভাষায় 'উপকরণ' বলতে পারি। আপনি তাকে কেটে দিন। কান

ঠিক আছে, পর্দা ঠিক আছে, শব্দও বেশ জোরে হচ্ছে, অথচ আপনি কিছুই শুনতে পাবেন না। আমাদের শরীরের যেসব প্রধান প্রধান গ্রন্থি আছে, সেগুলির দ্বারাও আমাদের শরীর ও মনের বহুল নিয়ন্ত্রণ ঘটে। আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যভাগে 'পিটুইটারি' নামে মাত্র আধ ইঞ্চি চওড়া যে গ্রন্থিটি আছে, ঐ গ্রন্থিটি যদি সঠিকভাবে বিকশিত না হয়, তাহলে জ্ঞান হবার পরেও ঐ জ্ঞানের প্রয়োগক্ষমতা দেখা যাবে না। তাকে দিয়ে কাজ করবার ক্ষমতাও আমাদের থাকবে না। যে ব্যক্তির জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রন্থিগুলি অতিমাত্রায় সক্রিয়, বিচিত্র রূপে তার কাম-বাসনা প্রকাশিত হয়। কামবাসনার প্রচণ্ড প্রকাশ ঘটেছে—যদি এর ওপরে নিয়ন্ত্রণ পেতে হয়, তাহলে সেই গ্রন্থিগুলিকে কিভাবে নিষ্ক্রিয় করতে হয় তা জানা দরকার। সিদ্ধাসন-এর বিকাশ ঘটেছে কেন? যৌন গ্রন্থিগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য। পদাঙ্গুষ্ঠ আসনের বিকাশ ঘটেছে কেন? তার কারণ, এর সাহায্যে সেই গ্রন্থিগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা যায়, যৌনানুভূতির অবসান ঘটানো যায়।

আজ্ঞাচক্রের গুরুত্ব

আজ্ঞাচক্রের ওপরে অধিক মনোনিবেশ দানের প্রক্রিয়াটি কেন? এর ওপরে চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করলে আমাদের জ্ঞানচক্র, ভাবনাচক্র তথা হৃদয়চক্র এবং বিশুদ্ধিচক্র খুব দ্রুত জাগ্রত হয়, ওগুলি সক্রিয় হয় এবং এদের নিচের চক্রগুলি আপনা থেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এমন প্রক্রিয়ার প্রভাব হল আমাদের জ্ঞানবাহী স্নায়ুগুলির ওপরে—তাদের কিছু কিছু স্নায়ুকে সক্রিয় করা এবং কিছু স্নায়ুকে নিষ্ক্রিয় করা। এই বোধ যদি আমরা সঠিকভাবে পাই, তাহলে কিন্তু অনাবশ্যক স্মৃতিসঞ্চার শান্ত হতে পারে। এজন্যই এদের বিকাশ ঘটানো হয়েছিল। আপনি কি মনে করেন, আমাদের শরীরের গঠন এবং শরীরের জ্ঞানবাহী ও জ্ঞানগ্রহণকারী স্নায়ুগুলিকে না বুঝে আপনি যোগের প্রসঙ্গগুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবেন? মনকে

বশীভূত করার ব্যাপারটি বুঝতে পারবেন? আমি বলি, এরকম কখনই হতে পারে না। আমাদের যাবতীয় চেতনার অভিব্যক্তির সবটাই যে শরীরের মাধ্যমে হয়, এ কথাও আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। চেতনার যতই বিকাশ ঘটুক না কেন, শরীরের মাধ্যম ছাড়া তা আপনার কোনই কাজে আসবে না। ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি এবং উপযোগ হতে পারে, কিন্তু আকার, রচনা ও উপকরণ ঠিক না হলে ইন্দ্রিয় কোনই কাজে আসবে না। মানসিক বিকাশ খুব সুন্দর, কিন্তু মস্তিষ্ক যদি আহত হয় তবে মন কোন কাজ করতে পারবে না। যোধপুরের লোডাজীর প্রসঙ্গে আপনি পড়েছেন, ওঁর মস্তিষ্কে এমন আঘাত লেগেছিল যে পাঁচ-সাত বছর পর্যন্ত তিনি যন্ত্রের মত বেঁচে ছিলেন। ওঁর কোন স্মৃতিই ছিল না। সেই আঘাত নিরাময় হল। চেতনা ফিরে আসতেই আবার উনি আগের মতই সব কাজ করতে লাগলেন। মস্তিষ্ক যতক্ষণ আহত ছিল, ততক্ষণ ওঁর চেতনা কোনই কাজে আসে নি।

এভাবে চেতনাকে বাইরে নিয়ে আসার সাধনকেই বলা হয় শরীর। ওপরে এত জোর দেওয়া দরকার। সাধনার দৃষ্টিতে শরীরকে বোঝাও খুবই প্রয়োজন। সাধনার দৃষ্টিতে শরীরকে না বুঝলে যেখানে আমরা পৌঁছুতে চাই, সেখানে পৌঁছুবার পথে নানা বাধা দেখা দিতে পারে।

স্মৃতিশূন্যতার সাহায্যে উর্ধ্বারোহণ

স্মৃতিশূন্যতাকে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, কি কারণে স্মৃতি উত্তেজিত হয়। ঐ কারণগুলিকে যদি আমরা গৌণ করে দিই, তাহলে আপনা থেকেই স্মৃতিশূন্যতা এসে যাবে। আমাদের স্মৃতিকে সবচেয়ে আগে উত্তেজিত করে মন, তারপর শরীর, তারপর শ্বাস। শ্বাসের আঘাত হয় সবচেয়ে সূক্ষ্ম। এজন্য শরীরকে শিথিল করুন, বাক্যের প্রকম্পনকে সমাপ্ত করুন। ধ্যান করুন, অর্থাৎ মনকে স্থির করে নিন। শ্বাস মন্দীভূত, মন শান্ত, বাক্য

শান্ত এবং শরীর নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় করার স্মৃতি যেই চলে আসবে, তখন স্মৃতিকে উত্তেজিত করার কোনই সাধন থাকবে না। স্মৃতিকে উত্তেজিত করতে বাইরে থেকেও কোন চেষ্টা হবে না। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি যখন সমাপ্ত হয়, তখন প্রাণ আপনা থেকেই ওপরে চলে যায়, শ্বাস ওপরে চলে যায়, মন্দীভূত হয় এবং আমাদের চেতনায় স্মৃতিশূন্যতা ও নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের স্থিতি চলে আসে। আমরা সবিকল্প প্রত্যক্ষের মাধ্যমে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ স্থিতিতে চলে আসি। সবিকল্প চেতনার মাধ্যমে আসি নির্বিকল্প চেতনার স্থিতিতে। এই হল স্মৃতিশূন্যতার স্থিতি।

যখন শ্বাস, শরীর ও মনের নিয়ন্ত্রণ সজ্ঞানে হয়, তখন ঐ স্থিতিতে আপনা থেকেই চেতনার ওপরে যাওয়ার পথ মিলে যায়, তার উর্ধ্বারোহণ ঘটে। ঐ অবস্থায় চেতনার উর্ধ্বারোহণের পথে কোন প্রত্যক্ষ বাধাও আসে না।

প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন : দীর্ঘ সময় ধরে সাধনা করছি, কিন্তু যে উপলব্ধি হওয়া উচিত তা হচ্ছে না। কোন্ জ্ঞানের অভাব এখানে ঘটছে—শরীরের সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, না স্নায়ুগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা? বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কোন্‌টি?

উত্তর : ভারতীয় যোগে এই প্রশ্নকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। প্রথমে প্রশ্ন ওঠে, আমাদের পুরনো সংস্কার কেমন? আমরা কেবল শরীর ও স্নায়ু-সংস্থান পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিকে সীমিত রাখতে পারি না। ঐ সাধনকে ভুলতেও পারি না, কারণ তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর পরেও যে সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে তারই নাম কর্ম। সংস্কার যদি অনুকূল হয়, অর্থাৎ যদি কোন কর্ম প্রতিবন্ধক না হয় এবং সাধনা-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকে, তাহলে সাধনাপথে আমরা চলতে আরম্ভ করি। দীর্ঘ সময়ের যে

প্রশ্নটি তা হচ্ছে চেতনা-জগতের, কোন যান্ত্রিক জিনিস একটি নির্দিষ্ট সময়ে তৈরি হয়ে যায়। একটি সুতো তৈরি হচ্ছে, তা দিয়ে কাপড় তৈরি হবে নির্দিষ্ট সময়ে। এই সময়ে সুতো তৈরি হবে, এই সময়ে কাপড় তৈরি হবে। অচেতন বস্তুগুলি সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রযোজ্য, কিন্তু যেখানে চেতনার স্বতন্ত্রতা এবং সংস্কারের বৈচিত্র্য থাকে সেখানে দীর্ঘ অথবা স্বল্প সময়ের নিয়ম প্রযোজ্য হয় না। ভগবান মহাবীর পূর্ব জীবনের সাধনার পরেও সাড়ে বারো বছর অবিরাম সাধনা করেছিলেন। সাধনা ছিল জাগরূক। এমন জাগরূক সাধনা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সাড়ে বারো বছরের পর তাঁর কেবলজ্ঞানের উৎপত্তি হল। আবার, তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ যে দিন দীক্ষিত হলেন, ঐ দিনই উনি কেবলজ্ঞানী হলেন। এখানে গূঢ় প্রশ্ন হল, ভগবান মহাবীরকেও সাড়ে বারো বছর ধরে কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল, আবার মল্লিনাথের মধ্যে একদিনেই কেবলজ্ঞান উৎপন্ন হল। এক জনের কত বেশি সময় লাগল, আর এক জনের কত কম সময়। এর পেছনে অনেক কারণ আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল, কর্ম বন্ধ পেছনের সংস্কার। আবরণকে আমরা কতটা গাঢ় করে রেখেছি। আবরণ যত গাঢ় হবে সময় তত বেশি লাগবে। বর্তমানের যোগীদের প্রসঙ্গ এলে আমরা দেখি, অরবিন্দ আঠারো বছর পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। আঠারো বছর পরে তিনি সঠিক পথের সন্ধান পান। মহর্ষি রমণও সাধনার জন্য কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। অনেক দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। যিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সাধনার উপলব্ধি চান, তিনি চান কাঁচা ফল পেড়ে খেতে। তা ঠিক হতেই পারে। সময়ের পরিপাক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সাধনায় সময় লাগাটা কোন গুরুতর ব্যাপার নয়। সাধনার পথ যদি ঠিক থাকে, দিক ঠিক থাকে, তাহলে দু বছর আগে বা পরে সাধনা হবে কিনা, তা নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে—দিক, পথ এবং গতি যেন সঠিক থাকে। এই তিন

পথ সঠিক থাকলে বুঝতে হবে, সাধনার পথ ঠিক রয়েছে এবং আমরা অগ্রসর হয়ে চলেছি। সময় বেশি কি কম লাগল, সে প্রশ্ন মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আচার্যশ্রী বলেছেন—যাতে সহজে ফললাভের সম্ভাবনা থাকে, তা কোন সাধনা বলে আমি বিশ্বাস করি না। কারণ তাতে সহজে ফল পাওয়ার চিন্তা লুকিয়ে আছে। সঠিক পথে যিনি চলেন, সাধনা সিদ্ধ হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা নিয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ জাগা উচিত নয়।

প্রশ্ন : শুনেছি, কিছু লোক কিছুই খান না। এর কারণ কি পেটের অভ্যন্তরভাগ সেঁটে যাওয়া, স্নায়ুগুলির পেছনের দিকে চলে যাওয়া, না কি অন্য কিছু? যোগে যে স্নায়ুগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, বর্তমান শরীরবিজ্ঞান অনুসারে তা উপলব্ধ কি?

উত্তর : পেটের ভেতরটাকে চেপে রাখলে ক্ষিধে বন্ধ হয় না। বরং তাতে বেশি ক্ষিধে লাগে। তবে, একটা কথা আছে। জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলেও অন্নের মাত্রা কিন্তু কম হবে। অল্প মাত্রাতেই তৃপ্তি আসবে। কখনও কখনও আমাদের শরীরে এমন আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে যে শরীরে খাওয়ার কোন দরকারই পড়ে না। ঘৃণা, শোক, ভয় প্রভৃতি কখনও কখনও স্নায়ুর ওপর এমন প্রভাব ফেলে যে কিছু কিছু স্নায়ু আহত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় খাওয়া-দাওয়ার কোন প্রয়োজনই হয় না। পতঞ্জলি লিখেছেন, কণ্ঠকূপের সংযম কর, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আপনা থেকেই চলে যাবে। জিভকে ওপর দিকে উলটে দিলে অর্থাৎ খেচরী মুদ্রা করলে ক্ষিধে কমে যায়। বর্ণনা আছে, আগে মানুষ মাসাধিক কাল উপবাস করত এবং পারণের সময় কুশের অগ্রভাগে যতটুকু খাবার লাগতে পারে ততটুকু খাদ্য গ্রহণ করত। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আসলে ওঁদের গ্রহণশক্তি এত তীব্র হয়ে যেত যে সামান্য পরিমাণ অন্ন এত সূক্ষ্মতার সঙ্গে গ্রহণ করলেও তা তাঁরে পক্ষে পর্যাপ্ত হয়ে দাঁড়াত।

দ্বিতীয় কথা হল, চিকিৎসকরা যে পরীক্ষা চালিয়েছেন, তা যোগশাস্ত্রে প্রদত্ত স্নায়ুগুলির বিধান ও বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। এর কারণ হিসেবে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। আসলে যোগশাস্ত্রে এত সূক্ষ্ম স্নায়ুর প্রতিপাদন করা হয়েছে যে আজ পর্যন্ত তার অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় নি। যেমন, যোগশাস্ত্রে মেরুদণ্ডের যে অতি সূক্ষ্ম বর্ণনা আছে তা যন্ত্রেও ধরা যায় না। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি হল, শব্দ ও পরিভাষার। আপনারা জানেন ছটি পর্যাপ্তি আছে। এগুলি রয়েছে শরীরে। কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমাদের শরীরে তো ছয়টি এমন পর্যাপ্তি আছে, কিন্তু অনেকের চিকিৎসক এবং শরীরবিদরা তো এক একটি অঙ্গকে কেটে-ছড়েও একটিও পর্যাপ্তি বের করতে পারেন নি। পর্যাপ্তিরা তো কথা বলে না। পর্যাপ্তি রয়েছে আমাদের ভাষায়। চিকিৎসকদের রয়েছে পৃথক ভাষা। এই ব্যাপারে একটু চিন্তা করায় বুঝতে পারলাম, এ ব্যাপারে কেবল নামের পার্থক্য রয়েছে। মনের পর্যাপ্তির স্থান যেমন বৃহৎ মস্তিষ্কে, এখানেই যাবতীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত রয়েছে। এ রকম অন্যান্য পর্যাপ্তিরও স্থান রয়েছে। আজ এই পর্যন্তই।

৭.

বৃত্তি-গোলক

- দশ রকমের বৃত্তি, মূর্চ্ছা বা সংজ্ঞা (চেতনা) রয়েছে।
- বৃত্তি ত্যাগের উপায়—
  - শুদ্ধ চেতনা অনুভব।
  - আত্ম-সম্মোহন।
  - কেবল-কুম্ভক।
  - বিশুদ্ধিকেন্দ্র এবং জ্ঞানকেন্দ্রে স্থিরীকরণ।
  - সূক্ষ্ম প্রাণায়াম।
  - নো-সংজ্ঞাপযুক্ত অবস্থা।

দশ প্রকার চিত্তবৃত্তি

আমাদের চেতনার ওপরে মূর্চ্ছা বা সংজ্ঞার যে আবরণ রয়েছে, বৃত্তি এবং সংস্কারের যে আবরণ রয়েছে, কিভাবে তাকে আমরা ভাঙ্গব ? চিত্তকে কিভাবে সংজ্ঞামুক্ত করব ? চিত্ত থেকে মূর্চ্ছা ও সংস্কারকে কিভাবে সমাপ্ত করব ? সাধনা-ক্ষেত্রে এটি এক জ্বলন্ত প্রশ্ন।

দশ রকমের সংজ্ঞা, চিত্তবৃত্তি অথবা মূর্চ্ছা রয়েছে। বাস্তবে এগুলি সবই এক। আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত হল, রোগ একটাই—স্থানভেদে তার অনেক নাম হয়। ব্যথা ব্যথাই। কিন্তু স্থানভেদে তা কখনও মাথা ব্যথা, কখনও হাঁটুর ব্যথা, কখনও বুকের ব্যথা, কাঁধের ব্যথা, গলার ব্যথা ইত্যাদি নানা নাম হতে পারে। প্রাকৃতিক

চিকিৎসার সিদ্ধান্তও তাই। রোগ একটাই। শরীরে বিজাতীয় তত্ত্ব সঞ্চিত হয় এবং তা রোগের রূপ ধারণ করে। এ ভাবে মূর্চ্ছাও একই। কারণ-ভেদের আধারে তার প্রকারভেদ ঘটে। আহারের প্রতি আসক্তি হলে তার নাম আহার-সংজ্ঞা। পরিগ্রহের প্রতি আসক্তি ঘটলে তার নাম পরিগ্রহ-সংজ্ঞা। বাস্তবে কিন্তু মূর্চ্ছা একটাই। এমনও হতে পারে, কিছু বিষয়ের ওপর মূর্চ্ছা সঘন হয়, আবার কিছু বিষয়ের ওপর বিরল হয় না। এ কথা সত্য, একই ব্যক্তির মধ্যে সর্বপ্রকার সংজ্ঞা যেমন সঘন হয় না, তেমনি সবগুলির বিরলতাও ঘটে না। কিছু সঘন হয়, আবার কিছু হয় না। কারুর মধ্যে হয়ত এক ধরনের চিন্তা সঘন হতে দেখা গেল, কারুর মধ্যে বিরল ধরনের। এই জন্যই সাধনায় ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সবচেয়ে আগে স্থির করে নিতে হয়, কোন্ ধরনের চিন্তা তাঁর মধ্যে প্রবল, কোন্ ধরনের চিত্তবৃত্তি প্রখর। ঐগুলির ওপরেই আঘাত করতে হয়।

নারকীয় জীবের মধ্যে ভয়ের চিন্তা, দেবতাদের মধ্যে ধারণচিন্তা, নারীদের মধ্যে আহার চিন্তা এবং মানুষের মধ্যে মৈথুনচিন্তা প্রবল হয়। এই প্রভেদ সম্পন্ন হয়েছে প্রাধান্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। এমনিতে সব প্রাণীর মধ্যেই ঐ চার চিন্তা থাকে। কিন্তু সকলের মধ্যে এর সবগুলি প্রবল হওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি মানুষই সব চিন্তার মধ্য দিয়ে পার হয়। তার চিত্তবৃত্তিগুলিও ঐ চিন্তার দ্বারা সম্পন্ন হয়।

চিন্তা এক : রূপ অনেক

একই পদার্থের উপযোগ ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়। এক ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁর কম্বলটি চুরি হয়ে গেল। ভক্তরা খুব দৌড়ঝাঁপ করল। পুলিশে অভিযোগ পেশ করা হল। চোর ধরা পড়ল। বিচারকের সামনে তাঁকে হাজির করা হল। সন্ন্যাসীকেও ডাকা হল। বিচারক চোরকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি সন্ন্যাসীর কি জিনিস চুরি করেছ?

চোর বলল— সন্ন্যাসীর কাছে একটি কম্বল ছিল। সেটি আমি চুরি করে নিয়েছি।

সন্ন্যাসীকে বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন— আপনার কি চুরি গেছে?

সন্ন্যাসী বললেন—আমার সব কিছু চলে গেছে। আমার বিছানা, বালিশ, চাদর, সব কিছু চুরি গেছে।

চোর বলল—সন্ন্যাসী মিথ্যে বলছেন। আমি কেবল একটা কম্বল চুরি করেছি।

বিচারক খুবই অসামঞ্জস অবস্থায় পড়লেন। চোরের কথায় যথেষ্ট দৃঢ়তার ছাপ দেখে উনি সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ, ঠিক করে বলুন। কেবল আপনার কম্বল চুরি গেছে, না সব কিছু?

সন্ন্যাসী বললেন—সব কিছুই চুরি গেছে। কম্বলই ছিল আমার সব কিছু। আমি কখনও কম্বল বিছিয়ে নিতাম, কখনও চাদরের মত করে গায়ে দিতাম, কখনও মাথার নিচে বালিশের মত ব্যবহার করতাম। কম্বলই আমার বিছানা, আমার বালিশ। কম্বলই আমার সব কিছু।

একটি কম্বল হয়ে গেল সব কিছু। একটি চেতনাও তেমনি সব কিছু হতে পারে। একই চেতনা কখনও হয় আহারের প্রতি আসক্তি, কখনও তা ভয়ের আসক্তি হয়ে ওঠে, কখনও ক্রোধের, কখনও মিথ্যা অভিমানের, আবার কখনও হয় ভিড়ের পেছনে চলার আসক্তি। এভাবে একই মূর্চ্ছা, একই চেতনা বিভিন্ন রূপে সামনে আসে।

চিন্তা-মুক্তির প্রক্রিয়া

আমাদের চিন্তাকে ভাঙ্গতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চিন্তার ঘন মেঘকে অপসারিত করতে না পারব ততক্ষণ চেতনার আকাশে

তেজস্বী সূর্যের উদয় হতে পারে না। সূর্য তখনই প্রকাশিত হতে পারে যখন মেঘ তাকে ঢেকে না ফেলে।

প্রশ্ন হল, ঐ মেঘকে আমরা কিভাবে অপসারিত করব। কিভাবে মূর্চ্ছাকে ভাঙ্গব? চেতনাগুলিকে কিভাবে শেষ করব? এর প্রক্রিয়াই বা কি? সংজ্ঞাগুলিকে ভাঙ্গবার, মূর্চ্ছার মেঘকে সরিয়ে দেবার একমাত্র উপায় হল শুদ্ধ চেতনাকে অনুভব করা, আত্মার দ্বারা আত্মাকে দেখা। যাবতীয় সাধনাকে এই প্রক্রিয়া নিজের ভেতরে গুটিয়ে রেখেছে। আমরা কি করতে চাই, সেই রহস্যও এর থেকে উদ্ঘাটিত হয়। আত্মার সাহায্যে আত্মাকে দেখার অর্থ হল, চেতনার দ্বারা শুধু চেতনাকে দেখা। মনের দ্বারা অন্ত-মনকে দেখা। বহির্চেতনা দ্বারা অন্তর্চেতনাকে দেখা। প্রশ্ন উঠবে, এমন দেখার পরিণাম কি হবে। যিনি আত্মার দ্বারা আত্মাকে দেখেন, তিনি অনাসক্ত হয়ে যান। আসক্তির ব্যূহকে তিনি ভেদ করেন। অনাসক্তির উপায়ই হল সংজ্ঞা-মুক্তির, মূর্চ্ছা ভাঙ্গার উপায়। শুদ্ধ চেতনার অনুভব করলে প্রাণী অনাসক্ত হয়। তার যাবতীয় মূর্চ্ছা ভেঙ্গে যায়। শুদ্ধ চেতনার দর্শনের অর্থ হল, শুদ্ধ উপযোগে থাকা। শুদ্ধ উপযোগের অর্থ হল, সতত জাগরণ।

জাগরণ এবং মূর্চ্ছা দুটি ভিন্ন জিনিস। মূর্চ্ছা হলে জাগরণ হবে না, আবার জাগরণ হলে মূর্চ্ছা হবে না।

জাগরণের অর্থ হল, আত্মার সংপ্রেক্ষা, শুদ্ধ চেতনার অনুভব। সহজ, সরল শব্দে আমরা একে বোঝার চেষ্টা করি। জাগরণ হল রাগ-দ্বেষ-শূন্য মুহূর্তের অনুভব। জাগরণ হল এমন এক মুহূর্তের অনুভব যখন প্রিয়তা বা অপ্রিয়তার কোন ভাব নেই, কেবল যা রয়েছে চোখে তাকেই দেখা হচ্ছে, আর কিছুই নয়।

আমরা শ্বাস বা অন্তর্দর্শনের সাহায্য নিয়ে থাকি। শ্বাসের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। তার সঙ্গে রাগ বা দ্বেষ কিছুই নেই। কেবল এক অবলম্বন হিসেবে আমরা একে স্বীকার করেছি। শুদ্ধ

চেতনাকে অনুভব করার পক্ষে শ্বাসের অবলম্বন একটি উপায় বিশেষ। যেখানে রয়েছে শুধুই দেখা, শুধু জানা, শুধুই সাক্ষাৎকার—সেখানে কোন রাগ বা দ্বেষ নেই, কোন সম্বন্ধ নেই। শুদ্ধ চেতনাকে অনুভবের জন্য এমন অনেক অবলম্বন হতে পারে। সংজ্ঞা থেকে মুক্ত হবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল—শুদ্ধ চেতনা, শুদ্ধ উপযোগ বা নো-সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনার অনুভব। সংজ্ঞামুক্ত চেতনায় থাকে কেবল চেতনা, কোন সংজ্ঞা নেই। সূর্য কিরণ দিচ্ছে, কোন মেঘ তাকে আবৃত করে ফেলে নি। কেবল সুস্পষ্ট প্রকাশ, আর কিছুই নেই।

মূর্চ্ছা বা সংজ্ঞার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার এই হল প্রথম উপায়। এর মধ্যে ধৈর্য ও অপেক্ষার ব্যাপার তো আছেই। এমন কখনই হবে না, অভ্যাস শুরু করা মাত্র চিন্তার ঘন আবরণ বা চক্রব্যূহ ছিন্ন হল। দীর্ঘ অভ্যাস স্বভাবতই আকাঙ্ক্ষিত এবং ধৈর্য ছাড়া তা অসম্ভব।

চিন্তামুক্ত হওয়ার দ্বিতীয় উপায় হল আত্ম-সম্মোহন। অপরের দ্বারা সম্মোহিত হওয়া নয়, নিজেকে দিয়ে নিজের সম্মোহন। শাস্ত্রীয় ভাষায় একে আমরা 'ভাবনা' বলতে পারি। যদি আমরা সংজ্ঞামুক্ত হতে চাই তাহলে সংজ্ঞামুক্ত হওয়ার ভাবনাকে এমন তন্ময়তার সঙ্গে করতে হবে যে ঐ ব্যাপারে আমরা স্বয়ং-সম্মোহিতবৎ হয়ে যাব, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাব। একাত্মতা এমন দরকার যে আমরা ভাবিতাত্মা হয়ে যাব। ঐ একাত্ম বা সম্মোহিত অবস্থায় আমরা যা ভাবব তা হবে, যেভাবে ভাবব সেভাবেই হবে। সম্মোহন এবং ভাবনার এই প্রক্রিয়া যেমন লাভজনক, আবার হানিকারকও হতে পারে।

সম্মোহনে দুটি কথা আসতে পারে। প্রথম কথা হল, তাদাত্ম্য-সম্পর্কিত। তাদাত্ম্য হলে তবেই সম্মোহন সফল হয়। মনো-বিজ্ঞানের ভাষায় তাদাত্ম্যের অর্থ হল, স্থূল বা চেতন মনকে ভুলিয়ে অবচেতন মনকে জাগিয়ে দেওয়া। অবচেতন মনকে না জাগালে

তাদাত্মের কথা হতেই পারে না। অবচেতন মন যতক্ষণ জাগ্রত না হয় ততক্ষণ আমরা নিজের ধ্যেয়র সঙ্গে একাত্ম হতে পারি না। এই অবচেতন মনকে জাগানোর সবচেয়ে সেরা অভ্যাস হল—কণ্ঠ থেকে শ্বাস নেওয়া এবং চিদ্ আকাশকে দেখা, তাতে ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করা।

সবচেয়ে প্রথমে আমাদের কায়োৎসর্গের মুদ্রায় বসতে হবে। কণ্ঠ দিয়ে শ্বাস নিন। শ্বাস নেবার ক্রিয়া চলবে পাঁচ-সাত মিনিট পর্যন্ত। স্থূল মন শুয়ে পড়বে, অবচেতন মন জেগে উঠবে। যখন সে জেগে উঠবে তখন তাকে নির্দেশ দিন। এখানে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। অবচেতন মন জেগে ওঠার পর যদি ভুল নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে তাও পালিত হবে। বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হবে। লাভের বদলে হবে লোকসান। এইজন্য ঐ সময় রীতিমত সাবধানতা নিতে হবে, যেন মনে কোন ভুল নির্দেশ বা ভুল বিকল্প না আসে। যে ধারাটি প্রবাহিত হচ্ছে তার প্রতিকূল বা প্রতিরোধক কোন বিকল্প যদি মনে এসে যায় তাহলে তা পালিত হয়ে অনেক বড় বিপদ সৃষ্টি করবে।

একটি পৌরাণিক গল্প আছে। একবার দেবতা ও দানবদের মধ্যে যুদ্ধ হল। দানবরা বিজয়ানুষ্ঠান করল। তারা মন্ত্র-সাধনা শুরু করল। মন্ত্রটি ছিল—'ইন্দ্র শত্রুর্বর্ধস্ব'। মন্ত্রের সাধনা চলতে লাগল। যুদ্ধ হতে দানবরা হেরে গেল, দেবতারা জিতলেন। দানবরা আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, মন্ত্রসাধনা সত্ত্বেও তাদের হার হল কিভাবে? বিশ্লেষণ করার পর এই তথ্য জানা গেল যে, 'ইন্দ্র' শব্দটির পরে একটি বিসর্গ উচ্চারিত হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি। মন্ত্র বা সঙ্কল্পের একটি অংশ হল নির্দেশ দান। ঐ নির্দেশ ভুল দেওয়া হয়েছে

নির্দেশ দিতে কোন ভুল হয়ে গেলে তার বিপজ্জনক পরিণাম আমাদের ভোগ করতে হয়। এজন্যই নির্দেশ সুনিশ্চিত ভাষায়

হওয়া প্রয়োজন, তারও আগে প্রয়োজন সুস্থির করার। সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ দেবেন না। নির্দেশের ভাষা নিয়মমাফিক হবে। সবচেয়ে আগে এটা পরীক্ষা করে নিতে হবে, যাতে ঐ ভাষায় যেন কোন ত্রুটি না থাকে। এভাবে আত্মসম্মোহনের কাজ শুরু করতেই মনে যা আসবে তা-ই নির্দেশ যদি দেন—দেখবেন, যা হবার নয় তা হয়ে যাবে এবং যা হবার তা হবে না।

সাধনাক্ষেত্রে তাই আত্মসম্মোহন বা ভাবনার প্রয়োগ খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। বৃত্তিগুলিকে খণ্ডিত করার জন্যই এর ব্যবহার করুন।

সংজ্ঞামুক্ত হবার তৃতীয় উপায় হল, কেবল-কুম্ভক। এর অর্থ হল, শ্বাস-সংযম। পূরক এবং রেচকের সঙ্গে সংঘটিত কুম্ভক কেবল-কুম্ভকের মত উপযোগী নয়। যখন চাইবেন তখনই এই প্রয়োগ করতে পারেন। বিপদও এর থেকে হয় না। পড়তে পড়তে, কথা বলতে বলতে, দেখতে দেখতে বা শুনতে শুনতে যখনই ইচ্ছে হবে তখনই ক্ষণিকের জন্য শ্বাস বন্ধ করুন, শ্বাস সংযম করুন, কুম্ভক করুন। দশ-কুড়ি বার পুনরাবৃত্তি করুন। যখনই ক্রোধের আবেশ আসে, বাসনার আবেশ আসে, ভয়ঙ্কর কল্পনা ছেয়ে ফেলে, কিংবা লুব্ধতা-সঞ্চারী কথা যদি আসে, তাহলে তখুনি কুম্ভক করুন। আবেশ কেটে যাবে। একবার ওগুলি কাটিয়ে ফেলতে পারলে তার বেগও সমাপ্ত হবে। বেগ চলে শূন্যতায়। নদীর জলে যদি অনেক জায়গায় বাঁধ দেওয়া হয় তাহলে বন্যা হতে পারে না। যেসব নদীতে আগে বন্যা হতো সেই নদীতে বাঁধ দিলে তার জল আরও বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, নদীতে আর বন্যা আসতে পারে না। তেমনি একবার যদি আমরা আবেগের বেগকে আটকাতে পারি তাহলে তার গতি স্খলিত হয়ে পড়ে। স্খলিত হলে তার বেগ সমাপ্ত হয় এবং তা নষ্ট হয়ে যায়। শ্বাস-সংযমের এই প্রক্রিয়া বৃত্তি-চক্রকে প্রতিরোধের সর্বোত্তম প্রণালী। এটিই-হল অখণ্ড চেতনা অনুভবের মার্গ।

শুদ্ধ চেতনার অনুভব, আত্ম-সম্মোহন এবং কুম্ভক—এই তিন

উপায়ের আলোচনা আমরা করলাম। এখন কয়েকটি শারীরিক ক্রিয়ার ওপরেও আলোচনা করা যাক।

আমাদের শরীরে কিছু কিছু এমন জায়গা আছে যা আমাদের এই কাজে সহযোগী হয়। বৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করার ব্যাপারেও শরীর সহযোগী হয়ে ওঠে। দুধের যেমন নিজস্ব কোন প্রকৃতি নেই, শরীরেরও তেমনি নিজস্ব কোন প্রকৃতি নেই। যেমন কফ প্রকৃতি-যুক্ত মানুষ যখন দুধ খায় তখন তা কফে পরিণত হয়, পিত্ত প্রকৃতিযুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে তা পিত্তে এবং বায়ু প্রকৃতিযুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে তা বায়ুতে পরিণত হয়। ঠিক তেমনি শরীরে যদি কোন সংজ্ঞা বা মূর্চ্ছা ওঠে তাহলে শরীর তার সহযোগী হয়ে ওঠে। যদি মূর্চ্ছাকে মুছে ফেলার কোন প্রচেষ্টা হয় তবে শরীর তাতেও সহযোগী হয়। শরীরের নিজস্ব কোন প্রকৃতি নেই।

আমাদের এই শরীর সাধনায় সহযোগিতা করে। শরীরের জ্ঞানস্নায়ু, জ্ঞানচক্র এবং স্নায়ুসংস্থানের অন্তর্গত বিভিন্ন স্নায়ু-বলয়কে তাই আমাদের জানা দরকার এবং সাধনাক্ষেত্রে সেগুলিকে ব্যবহার করার পদ্ধতি শিখতে হবে। এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য নানা উপায়ের সন্ধান করা হয়েছে। অজস্র উপায়, যার সবগুলির সন্ধান আমরা আজও জানি না।

হৃদয়, কণ্ঠ এবং মস্তিষ্ক—এই তিনটি স্থান হল সাধনার উপযোগী। হৃদয় হল আনন্দ-কেন্দ্র, কণ্ঠ হল বিশুদ্ধি কেন্দ্র, আর মস্তিষ্ক হল জ্ঞানকেন্দ্র। এগুলি হল জ্ঞান-স্নায়ুর বড় বড় গুচ্ছ। হৃদয়কে চিন্তাকেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়েছে। ক্রিয়ার স্থান হল সুষুম্না-শীর্ষ এবং চিন্তার স্থান হল হৃদয়। ভালো এবং খারাপ উভয় চিন্তাকেই হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আনন্দ-কেন্দ্র, বিশুদ্ধি-কেন্দ্র এবং জ্ঞান-কেন্দ্রকে আমরা যতটা স্থির করব ততই বৃত্তিগুলির ক্ষয় হবে। শারীরিক প্রক্রিয়ায় বৃত্তিগুলিকে ক্ষীণ করার সবচেয়ে বড় স্থান হল সহস্রারচক্র। এটিই হল জ্ঞানকেন্দ্র। এখানে ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত

করলে বৃত্তিগুলির ক্ষয় হয়। চেতনা শান্ত হয়। কিছুকাল অভ্যাসের পরে আপনি নিজেই অনুভব করতে পারবেন, একটা কিছু হচ্ছে। শারীরিক ক্রিয়ার দৃষ্টিতে চেতনা-মুক্তির চতুর্থ উপায় হল—আনন্দ-কেন্দ্র, বিশুদ্ধি-কেন্দ্র এবং জ্ঞানকেন্দ্রে চিত্তকে স্থির করা। এই স্থিরীকরণের ফল হল—বৃত্তিগুলির ক্ষয়, মূর্চ্ছার বিনাশ ও সংজ্ঞার সমাপ্তি।

সংজ্ঞা বা চেতনা-মুক্তির পঞ্চম উপায় হল, সূক্ষ্ম প্রাণায়াম।

নিশ্চয়-দৃষ্টিতে বীতরাগই হয় নো-সংজ্ঞোপযুক্ত। ব্যবহারদৃষ্টিতে প্রত্যেক মুনি হন নো-সংজ্ঞোপযুক্ত। সে ব্যবহার থেকে বীতরাগ হয়। শুদ্ধ চেতনার অর্থ হল, বীতরাগ হওয়া। শুদ্ধ চেতনার অনুভব ও সংজ্ঞামুক্ত হওয়ার তাৎপর্য হল, বীতরাগ হওয়া। এই হল আমাদের আদর্শ। আমাদের ঐ রকমই হতে হবে। আমাদের সামনে যেন তা নিরন্তর থাকে। ঐ আদর্শ যখন তৈরি হবে তখনই আমরা ঐ রকম হতে পারব। বীতরাগ হওয়ার চিন্তা আমরা করব। বীতরাগ হল সত্ত্বগুণযুক্ত। সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই হল তিনটি গুণ। সত্ত্বের রং হল সাদা, রজের রং লাল এবং তমের গুণ কালো। বীত-রাগের সঙ্গে শ্বেত বর্ণের চিন্তা করুন। বীতরাগের গুণের স্পষ্ট ছবি যেন আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। তার স্বরূপ সম্বন্ধেও যেন স্পষ্ট ধারণা হয়। প্রথমে আমাদের স্পষ্ট ধারণা করতে হবে, তারপর তার ছবি আঁকতে হবে। চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠলে কায়োৎসর্গের মুদ্রায় বসতে হবে এবং বাঁ স্বর দিয়ে শ্বাস নিতে হবে। পূরক করুন। পুরকের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় চিন্তা এবং সঙ্কল্প করতে হবে যে, আমাদের অন্তঃকরণে বীতরাগ আসছে। রেচনের সঙ্গে বিধায়ক কল্পনা করা যায় না, তা পূরকের সঙ্গেই কেবলমাত্র করা যায়। শ্বাসকে যখন আমরা বাহিরে ছাড়ছি, রেচন করছি, তখন তার সঙ্গে যেন কোন ভাল কল্পনা সংযুক্ত করা না হয়। ঐ সময়ে এমন কল্পনা করতে পারেন যেন পেট থেকে খারাপ জিনিসগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, পেটের

রোগ দূর হচ্ছে। কিন্তু যখন বিশিষ্ট চিন্তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে, তখন মনের মধ্যে যে চিন্তাকে স্থির করতে চান, তা যেন রেচনের সঙ্গে যুক্ত না হয়। পূরকের সঙ্গে ওকে জুড়ে দিন। চন্দ্রস্বরের সাহায্যে পূরক করার সময় মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প ও চিন্তা জুড়ে দিন যেন হৃদয়ে বীতরাগের অবতরণ ঘটেছে। পূরকের পরে কুম্ভক করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত সহজ সরলভাবে এতটুকু কষ্ট না পেয়ে শ্বাসকে আটকাতে পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্বাস আটকে অন্তর্মনে বীতরাগের ধ্যান করুন। এই হল এক উপায়। 'দেবো ভূত্বা দেবং ভজেৎ'—দেবতা হয়ে দেবতাকে পুজো করতে হবে। আমাদের স্বয়ং ঐ বীতরাগতার স্থিতিতে পৌঁছে বীতরাগের ধ্যান করতে হবে। এরকম করলে আমাদের মনের যাবতীয় বৃত্তি, চিত্তের যাবতীয় ওজঃ-শক্তি আপনা থেকে পরিণমন করতে শুরু করবে। পরিণমণ হতে থাকবে, পরিণতি হতে থাকবে এবং আমরাও ঐ রূপে বদলাতে থাকব। আমাদের বুদ্ধি যেমন হবে, যেমন আমাদের চিত্ত হবে, যেমন আমাদের ধারণা হবে, ঠিক তেমন ভাবেই আমরা বদলাতে থাকব।

জৈন দর্শনে পাঁচটি ভাব প্রতিপাদিত হয়েছে—

১. ঔদয়িক ভাব
২. ঔপশমিক ভাব
৩. ক্ষায়িক ভাব
৪. ক্ষায়োপশমিক ভাব
৫. পারিণামিক ভাব

প্রথমে চারটি ভাবে কর্মের যোগ হয়, কর্মের সুতো সেখানে যুক্ত হয়ে আছে। পরিণামিক ভাবে কর্ম যুক্ত হয় না, তার আলাদা একটা স্বতন্ত্রতা আছে। যদি আমাদের পারিণামিক ভাব পরিপুষ্ট হয় তাহলে কর্মের বিবিধ পরিণামকে কাটাতে পারি। আমরা কর্মকে বদলাতে পারি, তাতে পরিবর্তন আনতে পারি, এটা আমাদের একটা বড় স্বতন্ত্রতা।

এক জ্যোতিষী শুকরাতকে বলেছিলেন—'আমি তোমায় গ্রহ-সংস্থানের ভিত্তিতে তোমার জীবনের প্রসঙ্গে কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করব।' শুকরাত হাসতে হাসতে বলেছিলেন—'কি ভবিষ্যদ্বাণী করবে? কোষ্ঠী কেউ লিখে থাকবে, কিন্তু আমার কোষ্ঠী তো আমার হাতেই রয়েছে। আমি নিজেই পুরুষকারের সাহায্যে কত কোষ্ঠী তৈরি করেছি। না জানি আমি নিজেই কত রেখাকে পালটে দিয়েছি। তুমি আর কি ভবিষ্যদ্বাণী করবে?'

পরিণমনের ব্যাপারে এই হল খাঁটি কথা। আমরা যদি ঐ ব্যাপারে জাগরূকতা আনতে পারি তাহলে অনেক ব্যাপারকে বদলে দিয়ে নতুন নতুন পরিণতি তৈরি করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারি। একটি পরিণামের সাহায্যে অকল্পনীয় পরিণাম নিয়ে আসতে পারি। কুণ্ডলী দেখে জ্যোতিষী যেসব তথ্যের অভিব্যক্তিই দিতে পারবেন না, ঐ সব তথ্যও সংঘটিত করতে পারি।

চিত্তে যখন বীতরাগ জন্মায় কিংবা চিত্তে যখন বীতরাগ সংঘটন-কারী যাবতীয় তত্ত্ব আসে তখন বীতরাগতায় পরিণতি শুরু হয়ে যায়।

চিত্তে যদি বাসনা-জ্ঞান বেশি হয় তাহলে পরিণমনের এক চক্র সৃষ্টি হবে, তেমনি ক্রোধ বেশি হলেও পরিণমনের একটি চক্র তৈরি হবে। তৈরি হবে একটি বলয়। আমাদের শরীরে এমন অনেক বড় বলয় আছে যা আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে সঞ্চালিত করে। যদি বীতরাগের চিন্তা করি তাহলে ঐ বিষয়ক বলয়ও তৈরি হবে। বীতরাগতাকে নিজের ভেতরে আনার, সংস্থাপিত করার এবং বীতরাগতা উৎপন্ন করার এই হল নিয়ম।

সংজ্ঞা-মুক্তির এই হল কয়েকটি উপায়। এগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আমাদের আরও কিছু জিনিস জেনে নেবার আছে। বৃত্তিগুলির কেন্দ্র মস্তিষ্কের কোথায় আছে তা খোঁজা, সঞ্চারমান বৃত্তিগুলিকে দেখা, সেগুলির দর্শন লাভ, ওদের প্রতি জাগরূক থাকা

এবং কিভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে বৃত্তিগুলিকে আমরা বিফল করতে পারি—এসব কথা যদি আমরা জেনে নিতে পারি তাহলে বৃত্তিগুলিকে ভেঙ্গে ফেলাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না। মানুষ বদলায়, চেতনাগুলিকে ভেঙ্গে ফেলে, তাদের পরাস্ত করে। যদি আমরা তা না করতে পারি তাহলে সাধনার কথাই তো ব্যর্থ হয়ে যাবে। ধর্মের কোন অর্থই থাকবে না। আমাদের পুরুষকারেরও কোন সফলতা আসবে না। আমরা সংজ্ঞাগুলিকে ভাঙ্গতে পারি, বৃত্তিগুলিকে পালটাতে পারি। এজন্যই আমরা সাধনা করি, ধর্মের আরাধনা করি, ধ্যান প্রয়োগ করি।

চেতনা এবং কর্ম

৮.

আচরণের স্রোত

- মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে : আচরণের স্রোত—
  - সহজাত
  - অর্জিত
- জৈন দর্শনের দৃষ্টিতে : আচরণের স্রোত—দশটি সংজ্ঞা
  - দশ সংজ্ঞার তিনটি বর্গ—

  ১. আহার সংজ্ঞা, ভয় সংজ্ঞা, মৈথুন সংজ্ঞা, পরিগ্রহ সংজ্ঞা।

  ২. ক্রোধ সংজ্ঞা, মান সংজ্ঞা, মায়া সংজ্ঞা, লোভ সংজ্ঞা।

  ৩. লোক সংজ্ঞা, ওঘ সংজ্ঞা।
- আচরণের মূল স্রোত হল—কর্ম।

মানসশাস্ত্র এবং কর্মশাস্ত্র

জ্ঞান এবং অধ্যাত্ম দুটি পৃথক জিনিস। দুই-ই জরুরী। জ্ঞান ছাড়া অধ্যাত্মের গ্রহণ সম্ভব নয়, আবার অধ্যাত্মে না নামলে জ্ঞানের শুদ্ধতা ঘটে না। জ্ঞানের প্রস্ফুটন ঘটে না। জ্ঞান অধ্যাত্মকে বাড়ায় এবং অধ্যাত্ম জ্ঞানকে নতুন নতুন উন্মেষ দান করে। পশ্চিমের দার্শনিকরা মনের সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন করেছেন। মনের সম্বন্ধে ওঁরা অনেক খোঁজ করেছেন, সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। এভাবে

মনোবিজ্ঞানের একটি সম্পূর্ণ শাখা বিকশিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠবে, ভারতের সত্যবেত্তারা কি মানসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নি? দুটি দিক থেকে আমরা এর উত্তর আলোচনা করব। একটি হল যোগশাস্ত্রের দিক থেকে, অন্যটি হল কর্মশাস্ত্রের দিক থেকে।

যোগশাস্ত্র হল সাধনার ব্যবস্থিত পদ্ধতি। মনের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ, মনের সূক্ষ্মতম প্রক্রিয়াগুলি অধ্যয়ন এবং তার ব্যবহারবোধ এর অন্তর্গত।

কর্মশাস্ত্র হল মনের গভীরতম অবস্থাগুলিকে অধ্যয়ন করার শাস্ত্র। কর্মশাস্ত্রকে বাদ দিয়ে আমরা মানসশাস্ত্রকে ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারি না। ঐ শাস্ত্রে যেসব অবোধ্য গূঢ় সমস্যা আছে, সে-গুলিকে সমাহিত করতে পারি না, অধ্যাত্মের গভীরে প্রবেশ করতে পারি না। কর্মশাস্ত্রকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য হল, অধ্যাত্মের গভীরে যাওয়ার একটি প্রগাঢ় প্রচেষ্টা করা। যিনি কেবল অধ্যাত্ম অনুশীলন করতে চান অথচ কর্মশাস্ত্রের ওপরে মনোনিবেশে ইচ্ছুক নন, তিনি অধ্যাত্মের গভীরে তো প্রবেশ করতে পারেনই না, এমন কি ঐ পর্যন্ত পৌঁছুতেও পারেন না। এজন্যই কর্মশাস্ত্র এবং যোগশাস্ত্র তথা বর্তমান মনোবিজ্ঞান—এই তিনের সংযুক্ত অধ্যয়ন হলে তবেই আমরা অধ্যাত্মের সঠিক রূপটিকে অনুধাবন করতে পারি এবং তার সমুচিত মূল্যায়ন করতে পারি।

অধ্যাত্মকে বুঝতে হলে কর্মশাস্ত্রকে বোঝা খুবই প্রয়োজন। এর প্রয়োজন এই কারণে যে, কর্মশাস্ত্রে আমাদের আচরণের কার্যকারণাত্মক মীমাংসা আছে। আমরা যে আচরণ করি, তার পেছনে থাকে দুটি কারণ। একটি হল, বহিঃস্থ কারণ এবং অপরটি হল, অন্তঃস্থ কারণ। বাইরের কারণটি খুবই স্পষ্ট হয়ে থাকে।

একটি লোক পথ চলছে। রাস্তায় আগুন জ্বলছে। আগুনের নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই লোকটি তার পা টেনে নেয়। কেন এমন হচ্ছে, তার কারণ আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। কারণ স্পষ্ট।

রাস্তায় আগুন ছিল। পা পিছিয়ে না নিয়ে এলে পা পুড়ে যাবে। এই হল বহিঃস্থ কারণ। এ কথা আমরা বুঝতে পারি। বুঝতে কোন কষ্টও হয় না।

রোগ এক : কারণ অনেক

একজনের রোগ হয়েছে। ওষুধ খাচ্ছে সে। রোগের কারণে কিছু অস্বাভাবিক প্রবৃত্তিও তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। উদাস হয়ে থাকছে, ক্ষীণ হয়ে থাকছে। অন্যান্য আচরণও তার মধ্যে পরিস্ফুট। অসুখ হওয়ার পেছনে যে কারণটি আছে তা বাইরের কারণ নয়। চোখে তা দেখাও যায় না, কারণটি অন্তঃস্থ। ঐ কারণকে খুঁজতে হবে।

অসুস্থ ব্যক্তি যে অস্বাভাবিক আচরণ করছে, তার পেছনের কারণটি কি? যে রোগ হয়েছে, তার কারণ কি? কারণটি অন্তঃস্থ। ঐ অন্তর্নিহিত কারণটিকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন আছে। অন্তর্নিহিত কারণ থাকলেই সেখানে কারণ খোঁজ করার দরকার থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন তৈরি হয়।

রোগী চিকিৎসকের কাছে যায়। রোগীকে দেখে বিভিন্ন চিকিৎসক ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেন—

বৈদ্যা বদন্তি কফপিত্তমরুদ্‌বিকারাৎ,
জ্যোতির্বিদো গ্রহগতিং পরিবর্তয়ন্তি।
ভূতাভিষঙ্গ ইতি ভূতবিদো বদন্তি,
প্রাচীনকর্ম বলবদ্‌ মুনয়ো বদন্তি॥

বৈদ্য বলেন—তোমার রোগের কারণ হল, শরীরের কফ-পিত্ত-বাত বিকৃত হয়ে গেছে।

জ্যোতিষী বলেন—তোমার গ্রহের গতি বিপরীত হয়ে গেছে, এজন্যই রোগ হয়েছে।

ভূতবাদী বলেন—তোমার ওপরে ভূতের ছায়া পড়েছে, এজন্য এই রোগ দেখা দিয়েছে।

মুনি বলেন—রোগের কারণ হল নিজের কৃত কর্মের বিপাক।

চিকিৎসক অন্য কিছু বলবেন। তিনি বলবেন—রোগ হয়েছে জীবাণুর কারণে। ওখানে বাত, পিত্ত এবং কফের প্রসঙ্গ উঠবেই না। রোগ হয় জীবাণু থেকে। যদি কোন অস্থিবিশেষজ্ঞের কাছে যান, তাহলে তিনি বলবেন—হাড়গুলির ভারসাম্য ঠিক নেই। পৃষ্ঠরজ্জু এবং অন্যান্য হাড়গুলির ভারসাম্য ঠিক নেই, এজন্যই রোগ সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে একই রোগ, কিন্তু তার কারণ খুঁজতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ পাওয়া যাবে।

চিকিৎসার একটি শাখা হল আকুপাংচার। ঐ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বলবেন, শরীরে বিদ্যুতের ভারসাম্য ঠিক নেই, এজন্য রোগ হয়েছে।

অতি সম্প্রতি রুশ শারীরবিজ্ঞানীরা একটি সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করেছেন। মানুষের শরীরে যখন বিদ্যুতের ভারসাম্য ঠিক থাকে না, তখনই রোগ উৎপন্ন হয়। ঐ বিদ্যুৎধারার ভারসাম্য আনয়ন করে, ভোল্টেজের হ্রাসবৃদ্ধির ভারসাম্য এনে চিকিৎসা সম্ভবপর।

রোগ একটিই, কিন্তু তার কারণ খুঁজতে গেলে দশ রকমের কারণ সামনে আসে। এর থেকে বোঝা যায়, মানুষ কাজের পৃষ্ঠভূমি খোঁজে এবং তার কারণ বুঝবার চেষ্টা করে।

ধর্মশাস্ত্র : আচরণের মূল স্রোতের অনুসন্ধান

যে আচরণ আন্তরিক, যে ঘটনা আন্তরিক. তার কারণ অন্তরের গভীরে গিয়ে খুঁজতে পারি। আমাদের যত আচরণ এবং প্রবৃত্তি, একটি অঙ্গুলি হেলনে যেসব বিরাট প্রবৃত্তি বা আচরণ সংঘটিত হয়, সেই আচরণের মূল স্রোতটি কি? কারণ কি? হেতু কি? কেন আমরা আঙুল নাড়াই? কেন আমরা বলি? কেন অপরের সঙ্গে ভাল বা খারাপ ব্যবহার করি? কেন আমরা রাগ করি? কেন ভালবাসি? যেসব আচরণ আমরা করি তার মূল স্রোতটি কি? মূল কারণ কি? এইসব প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যই কর্মশাস্ত্রের

দিকগুলি অনাবৃত করতে হয়। সংসারের বৈচিত্র্য আছে। বিভিন্ন মানুষের আচরণ ও ব্যবহার বিভিন্ন হয়। এভাবে প্রতিটি মানুষেই বিভিন্নতা ও পার্থক্য আছে। প্রতিটি মানুষেই সমতা, শক্তি, আকৃতি-প্রকৃতি, আচার ও ব্যবহারের তারতম্য আছে। এই বিভিন্নতা ও তারতম্য একটি সহজ প্রশ্নকে উপস্থাপিত করে: কেন এই পার্থক্য? কেন এমন হয়? এই বিভেদ বা পার্থক্য কেন? একরূপতা কেন দেখা যায় না? এসব বিভিন্নতার কোন না কোন হেতু নিশ্চয়ই রয়েছে। যদি কারণ না থাকত, তাহলে তো সব কিছুই সমান হয়ে যেত। যে প্রভেদ বা অন্তর আমরা দেখি, তার নিশ্চয়ই কোন না কোন হেতু রয়েছে। কারণ ছাড়া বা হেতু ছাড়া এই বিভিন্নতা হতে পারে না। প্রকৃতির বিভিন্নতা, চেতন জগতের বিভিন্নতা বা জড় জগতের বিভিন্নতা—যাই হোক না কেন, সকলের পেছনেই কোন না কোন কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে।

মনোবিজ্ঞান এই বিভিন্নতার কারণ খুঁজবার চেষ্টা করেছে। এ আজকের যুগের কথা। কিন্তু হাজার হাজার বছর আগেও এই বিভিন্নতার কারণ খোঁজার প্রচেষ্টা হয়েছিল।

বিচয়ধ্যান: মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া

মহাবীর ধর্মধ্যানের চারটি শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন—আজ্ঞাবিচয়, অপায়বিচয়, বিপাকবিচয় এবং সংস্থানবিচয়। এর মধ্যে আমরা অপায়বিচয় এবং বিপাকবিচয় এই দুটি নিয়ে আলোচনা করব।

ধর্মধ্যান হল কারণ খোঁজার একটি প্রক্রিয়া। কোন বিপাক হচ্ছে, কোন একটা ঘটনা ঘটছে। একটা নিষ্পত্তি সামনে আসছে। যেহেতু বিপাক ঘটেছে তাই হেতুও রয়েছে। পরিণাম ঘটলে তার কারণ তো থাকবেই। এই কারণ হল অপায়। অপায়বিচয় হল ঐ কারণের অনুসন্ধান। কোন জিনিস সংঘটিত হলে তার পেছনে কোন না কোন কারণ অবশ্যই থাকে। তা দোষই হোক, আর গুণই হোক। আমরা কেবলমাত্র বিপাককেই সব কিছু ধরতে পারি

না, পর্যাপ্ত জ্ঞান করতে পারি না। আমরা বিপাককে কেবলমাত্র বর্তমানের কথা বলে ধরতে পারি, কিন্তু ঐ বিপাকের পেছনে যে হেতু বা অপায় রয়েছে, তা হল অতীত। তাকে বোঝা দরকার। তাই দুয়ের খোঁজ এক সঙ্গে চলতে থাকে—অপাকবিচয়ের এবং বিপাকবিচয়ের।

কোন একটি লোকের আচরণ খুব রূঢ়, কঠোর এবং অশিষ্ট। এই হল একটি ঘটনা। এ হল বিপাক বা পরিণতি। এর পেছনে অপায় বা কারণ কি? এগুলিকে না বুঝলে বিপাকের কোন নিদান বা প্রতিষেধক সম্ভব নয়। কেউ যদি ভাবেন, প্রতিষেধক বের করব, তাহলে তিনি ভুল করবেন। প্রতিষেধক হবে না, ভুল হবে। প্রতিষেধক আগে হলে বিপাক আসবেই না। বীজ উপ্ত হয়েছে, অঙ্কুর বেরিয়েছে, বৃক্ষের রূপ সামনে এসেছে। এখন তার প্রতিকার কি হবে? প্রতিকার সম্ভব নয়। চিকিৎসাও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ছেদন ছাড়া আর উপায় নেই। ফোঁড়া যখন পেকেছে, তখন তা ফাটবেই।

এখন হল বিকাশের যুগ। চিকিৎসাশাস্ত্রে এখন এমন একটি শাখা বিকশিত হয়েছে যার সাহায্যে সূক্ষ্ম ফটোগ্রাফির মাধ্যমে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য রোগের ছবি আগেই তুলে নেওয়া যায়। ছ মাস পরে, কিংবা এক-দুই বছর পরে কোন্ রোগ আসছে তা নির্ণয় করা যায়। তাহলে রোগ গেড়ে বসার আগেই চিকিৎসা করা যাবে এবং তা সেই রোগের চিকিৎসা যা শরীরে এখনও দেখাই দেয় নি। খুবই আশ্চর্যের কথা, সন্দেহ নেই।

এই বিদ্যা প্রাচীনকালেও অধিগত ছিল। আগে থেকেই রোগ নির্ণয় করা যেত এবং যাতে সেই রোগ দেখা না দেয় তার ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হতো। এই পদ্ধতিটি হল কর্মশাস্ত্রের। কর্মের বিপাককে ওঁরা জেনে নিতেন এবং যাতে তা না হয় সে ব্যবস্থা আগে থেকেই করতেন।

অতীত এবং বর্তমান—উভয়কে দেখুন

কেবল বর্তমানকে দেখলেই আমাদের চলবে না। ধ্যানের জন্য বলা হয়েছে, বর্তমানকে দেখুন ; বর্তমান ক্ষণটিকে দেখুন। কথাটা সঠিক হলেও সম্পূর্ণ নয়। বর্তমানকে দেখা খুবই ভালো। মনকে শান্ত করতে হলে বর্তমানকে দেখা খুবই জরুরী। কিন্তু যে কোন তথ্যের সবটাকে জানতে হলে কেবল বর্তমানই পর্যাপ্ত নয়, অতীতকে দেখাটাও প্রয়োজন। যে অতীতের পরিণাম হল বর্তমান, যে অতীতের বিপাক হল বর্তমান, সেই অতীতকে জানা প্রয়োজন। অতীতকে না বুঝলে বর্তমানের বিপাককে, বর্তমানের প্রবৃত্তিকে, বর্তমানের রচনাকে বোঝা যায় না। তাকে বুঝে কিছু লাভ হয় না। বর্তমান যে ক্ষণ, আগে তাকে বোঝা দরকার। তাকে বোঝার অর্থ, কর্মশাস্ত্রকে বোঝা। কিন্তু কিছু তথ্য এমন হয় যা অনাদি এবং অনন্ত। তার আদি নেই, অন্ত নেই। আমাদের অস্তিত্বেরও আদি নেই, অন্ত নেই। আবার, কিছু কিছু তথ্য এমন হয় যা অনাদি এবং অনন্তযুক্ত। তার আদি নেই, কিন্তু অন্ত অবশ্যই আছে। তার শুরুর বা আদির কথা আমরা জানি না, কিন্তু একদিন তা অবশ্যই সমাপ্ত হবে।

কবে থেকে অন্ধকার আছে, তা আমরা জানি না। কিন্তু যখন প্রদীপ জ্বলল, বিদ্যুৎ এল, তখন অন্ধকার সমাপ্ত হল। অন্ধকার সমাপ্ত হয়। যদি এমন কোন জায়গা পাওয়া যায় যেখানে আজ পর্যন্ত সূর্যরশ্মি পৌঁছয় নি, কোন লোক যায় নি, সেখানে অন্ধকার আছে। কিন্তু সেখানে কোন মানুষ গেলে, প্রদীপ জ্বালালে, সেখানেও অন্ধকারের সমাপ্তি ঘটবে। অন্ধকার অনাদি, কিন্তু তা অন্তযুক্ত। তার অন্ত থাকে, সমাপ্তি ঘটে।

যে ব্যক্তি সম্যক্‌দৃষ্টি লাভ করেন নি, যিনি কখনও সম্বোধি অনুভব করেন নি, যাঁর বিধিহীনতার আবরণ কখনও সমাপ্ত হয় নি, এখনও পর্যন্ত হয় নি, কিন্তু এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যাতে মিথ্যা দৃষ্টি বিলীন হয়েছে, মিথ্যাদর্শন সমাপ্ত হয়েছে, অবোধি বিলীন

হয়েছে, অবিদ্যার আবরণ খসে পড়েছে। মিথ্যাদর্শনের আদি নেই, কিন্তু তার অন্ত অবশ্যই আছে।

একবার যার সম্যক্‌দৃষ্টি হয়ে যায়, তা চিরকাল থাকে, কখনও সমাপ্ত হয় না। অবিদ্যার আবরণ একবার ছিঁড়লে তা আর ফিরে আসবে না। সে ব্যক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে চলে যাবে। একবার যাঁর মানসে সম্বোধির সূর্য উদিত হয়েছে, তা কখনও অস্তমিত হবে না। আদি তো আছে, কিন্তু অন্ত নেই।

যার আদি আছে এবং অন্তও আছে, তাকে আমরা আদি ও অন্তযুক্ত বলতে পারি। মানুষ তো কত সময় রাগ করে, আবার ক্ষমাশীল হয়। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের অনেকগুলিই আদি ও অন্তযুক্ত হয়। এদের অন্ত যেমন থাকে, তেমনি আদিও থাকে। দুই-ই একসঙ্গে চলে।

অধ্যাত্ম : অনাদি-হেতুর অনুসন্ধান

যে বিষয়ের আদিকে আমরা জানি না, সেই প্রবাহের কথাই এখন আমরা চিন্তা করব। অনাদিকাল থেকে যা চলে আসছে, তার অনাদি হেতুও রয়েছে। আমাদের প্রতিটি আচরণের, প্রতিটি ব্যবহারের অনাদি-কারণ রয়েছে। তা অনাদি কাল থেকে চলে আসছে, তার আদি বিন্দুকে খোঁজা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়. কিন্তু আমরা তার অন্ত করতে পারি। সাধনার ক্ষেত্র তো রয়েছে এজন্যই। অধ্যাত্মের সাধনা কি জন্য? সাধনা এ জন্য যে, অনাদি-হেতুকে খোঁজা যায় এর মাধ্যমে, তার অন্ত করা যায়। যা হেতু বা কারণ, আচরণের পেছনে বা আচরণের অসঙ্গতির পেছনে যে কারণ, তা খুঁজে বের করার জন্যই অধ্যাত্ম সাধনার প্রয়োজন পড়ে। যেসব কারণ আমাদের আচরণে অসঙ্গতি সৃষ্টি করে এবং ব্যবহারে ভারসাম্য বা সুসামঞ্জস্য থাকতে দেয় না, একরূপতা থাকতে দেয় না, বিভিন্নতা সৃষ্টি করে, সেই কারণ বা হেতু হল অনাদি। তার অন্ত করা যায়। ঐ বিন্দুকে খোঁজার জন্যই কর্মশাস্ত্র পাঠ করার প্রয়োজন পড়ে।

আচরণের মূল স্রোত : মনোবিজ্ঞানের প্রসঙ্গে

আধুনিক মনোবিজ্ঞান আমাদের আচরণের স্রোতকে খুঁজবার চেষ্টা করেছে এবং জানিয়েছে, আমাদের আচরণ দু ধরনের হয়—সহজাত এবং অর্জিত। আচরণের পেছনে কোন না কোন প্রবৃত্তি থাকবেই। কোন না কোন অভ্যাস থাকবে, স্বভাব থাকবে। স্বভাব দু ধরনের—সহজাত এবং অর্জিত। সহজাত হল সেই স্বভাব, যা মানুষ জন্মের সঙ্গে নিয়ে আসে। আর অর্জিত স্বভাব হল সেগুলি, যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরিবেশে অর্জিত হয়। সহজাত স্বভাব বা সহজাত প্রবৃত্তি, অর্জিত স্বভাব বা অর্জিত প্রবৃত্তি—এই দুটি হল আচরণের মূল স্রোত। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানে এই স্রোত-গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোনটিতে তের, কোনটিতে চোদ্দ, কোনটিতে আবার ধরা হয়েছে এক। এগুলি হল মৌলিক মনোবৃত্তি। যৌনতা যেমন মানুষের এক মৌলিক মনোবৃত্তি। লড়াই, যুদ্ধ, সংঘর্ষও হল মানুষের মৌলিক মনোবৃত্তি। ক্ষিধে, দলবদ্ধ হয়ে থাকা—এটিও হল মানুষের মৌলিক মনোবৃত্তি। বাঁচার ইচ্ছাও মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি। মানুষ বাঁচতে চায়, মরতে চায় না। ভগবান মহাবীর বলেছেন—প্রতিটি জীবই বাঁচতে চায়, কেউ মরতে চায় না। এটি মৌলিক সত্য।

মৌলিক মনোবৃত্তি

মহর্ষি পতঞ্জলি পাঁচটি ক্লেশের কথা বলেছেন। এর একটি হল, অভিনিবেশ। এর অর্থ হল, সব জীব বাঁচতে চায়। বৈদিক ঋষিদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি—'জীবেম শরদঃ শতম্'—অর্থাৎ আমরা একশো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকব। মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, চিন্তাশীল প্রাণী। সে ভাবতে পারে, বিচার করতে পারে, ব্যক্ত করতে পারে, এজন্যই 'জীবেম শরদঃ শতম্'—একশো বছর পর্যন্ত বাঁচার কামনা তার মধ্যে প্রকট। যেগুলি ইতর প্রাণী, যার মধ্যে চিন্তার বিকাশ ঘটে নি, ব্যক্ত করার শক্তি যার নেই, যার ভাষা স্পষ্ট নয়, সে 'জীবেম

শরদঃ শতম্' ভাবটি ব্যক্ত করতে পারে না। কিন্তু তারও মনে থাকে বাঁচার ইচ্ছা, মরার নয়। বাঁচার এই ইচ্ছা প্রাণীমাত্রেরই মৌলিক মনোবৃত্তি। মহৎ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, বড় হওয়ার ইচ্ছা—এটিও মানুষের মৌলিক মনোবৃত্তি।

বনে একটি গরু এদিক ওদিক ঘুরছে। দু-চার ঘণ্টা ধরে ঘুরছে। গরুর এই আচরণের কারণ খুঁজে বের করা শক্ত নয়। এই ঘোরার পেছনে কাজ করছে ক্ষুধার প্রবৃত্তি। যদি ঐ প্রবৃত্তিটি তার মধ্যে না থাকত তাহলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে জঙ্গলে ঘুরত না।

এভাবে আমরা আচরণের মূল কারণ এবং মূল স্রোতটিকে জানতে পারি। ঐ জানার মাধ্যমে প্রতিটি আচরণ এবং ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করতে পারি।

ভগবান মহাবীর দশটি সংজ্ঞার কথা বলেছেন—আহার, ভয়, মৈথুন, পরিগ্রহ, ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, ওধ এবং লোক সংজ্ঞা। আচরণের মূল স্রোতকে অনুসন্ধানের পক্ষে এই সংজ্ঞাগুলি প্রভূত সহায়ক।

আমাদের যাবতীয় আচরণ এবং প্রবৃত্তির পিছনে ঐ দশ রকমের চেতনা কাজ করে। ঐ ধরনের চিত্তবৃত্তি, যাতে চেতন ও অচেতন উভয় মনের সংযোগ হয়, ইংরেজিতে যাকে বলে 'কনসাস' এবং 'সাব-কনসাস মাইণ্ড', তাকেই বলা হয় সংজ্ঞা বা সজ্ঞান।

সংজ্ঞার তিনটি বর্গ বা বিভাগ

দশ রকম সংজ্ঞা বা চিত্তবৃত্তিকে আমরা তিনটি বর্গ বা ভাগে বিভক্ত করতে পারি—

প্রথম ভাগ — আহার, ভয়, মৈথুন, পরিগ্রহ সংজ্ঞা।

দ্বিতীয় ভাগ —ক্রোধ, মান, মায়া এবং লোভ সংজ্ঞা।

তৃতীয় ভাগ — লোক এবং ওধ সংজ্ঞা।

প্রথম ভাগের মনোবৃত্তিগুলি প্রাণীমাত্রেরই রয়েছে। মনোবিজ্ঞান যাকে বলে ক্ষুধার মনোবৃত্তি, জৈন আচার্যরা তাকেই বলেছেন আহার

সংজ্ঞা। এই বৃত্তিটি সব প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে। প্রতিটি প্রাণীর পক্ষে আচরণ সম্ভব হয় এই কারণেই। বলা যায়, আমাদের আচরণের একটি বৃহৎ অংশ এই সংজ্ঞা কর্তৃক প্রেরিত।

দ্বিতীয়ে রয়েছে ভয়ের সংজ্ঞা। আমাদের অনেক আচরণ সংঘটিত হয় ভয়ের কারণে। নিরীহ গরু কখনও কখনও মানুষের কাছে রুদ্র মূর্তি ধারণ করে। মানুষ তার কিছুই করে নি, গরুর কাজও কাউকে গুঁতো মারা বা আঘাত করা নয়, কিন্তু তাহলে ঐ ভয়ঙ্কর রূপটি কেন? এর কারণ হল, ওর মধ্যে খুব সহজেই ভয়ের ভাবটি জাগ্রত হয়। ভয় হল আত্মরক্ষার জন্য। আত্মরক্ষায় সবচেয়ে আগে আবেশ ভয়টি জাগ্রত হয়। ভয় হয়, কেউ যেন আমাকে আঘাত না করে বসে। ভয় হলে সারা শরীরে কম্পন তৈরি হয়, মানসিক চাপ তৈরি হয়। এর পেছনে ভয়ের বৃত্তিটি কাজ করছে।

তৃতীয় হল, মৈথুন সংজ্ঞা। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয়েছে যৌনতার বৃত্তি। প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই এই বৃত্তিটি রয়েছে।

চতুর্থ হল, পরিগ্রহ সংজ্ঞা। এটি হল সংগ্রহের মনোবৃত্তি। মানুষই কেবল সংগ্রহ করে, এ কথা ভাববেন না। পশুরাও সংগ্রহ করে, পাখিরাও করে। মৌমাছিরা সংগ্রহ করে। ছোট ছোট প্রতিটি প্রাণী সংগ্রহ করে। জৈন তত্ত্ববিদরা অনুসন্ধান করে বলেছেন, গাছেরাও সংগ্রহ করে। গাছের মধ্যেও সংগ্রহ-প্রবৃত্তি থাকে। এই রাখার প্রবৃত্তি, সংগ্রহের প্রবৃত্তি প্রতিটি প্রাণীর থাকে। এভাবে চারটি সংজ্ঞাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে একটি বর্গ।

দ্বিতীয় বর্গটি তৈরি হয়েছে চারটি চিত্তবৃত্তিকে নিয়ে। এগুলিও প্রতিটি প্রাণীর রয়েছে। এমন কোন প্রাণী পাবেন না যার মধ্যে এগুলি নেই। অবশ্য একটু প্রভেদ আছে। মানুষের মধ্যে এই বৃত্তিগুলি যতটা বিকশিত, বনস্পতি বা ইতর প্রাণীর মধ্যে তা নয়। কিন্তু এর অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। বনস্পতির মধ্যেও ক্রোধ, মান,

মায়া এবং লোভের প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে তা যতটা স্পষ্ট, বনস্পতির মধ্যে ততটা নয়। চার প্রবৃত্তিকে নিয়ে গঠিত এই হল দ্বিতীয় বর্গ।

প্রথম বর্গের চারটি প্রবৃত্তির কারণে দ্বিতীয় বর্গের চারটি বৃত্তি বিকশিত হয়। ক্রোধ জন্মায় আহারের কারণে। আহার এবং অর্থের জন্যই লড়াই হয়, কলহ হয়। ক্রোধের কারণ হয় আহার। একটা কুকুরকে রুটি দিন, দ্বিতীয় কুকুর এসে গেল। দুজনে ঝগড়া শুরু করল। রুটি হয়ে দাঁড়াল ঝগড়ার কারণ।

একটি লোক ভাল চাকরি পেয়েছে। ভাল পদে রয়েছে। কিন্তু সে আর একটি জায়গায় চাকরি নেবার চেষ্টা শুরু করল। আগের লোকটির চাকরি ছাড়াবার প্রচেষ্টা শুরু হল। ক্রোধ শুরু হল। উচাটন হল মন। শুরু হল ঝগড়া। এর পেছনে রয়েছে জীবিকা তথা আহারের কারণ।

একটি লোকের প্রয়োজন সুন্দরভাবে মিটছে। দ্বিতীয়জন তাকে দেখছে। তার প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটছে না। প্রথম ব্যক্তির মনে চলে আসছে অহংভাব। অহঙ্কার সব সময় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখে আসে। নিজের চেয়ে হীন ব্যক্তিকে দেখে অহঙ্কার করার পরিবেশ তৈরি হয়। সামনে যদি হীনতা প্রকট না হয় তাহলে অহঙ্কার প্রকটিত হবার সুযোগই আসবে না। কর্মের উদয়েও আকস্মিকভাবে অহঙ্কারভাব জাগ্রত হয়। এগুলি আকস্মিক। ঐ পরমাণুগুলির ভোগ কাটাতে হয়। তবে, সাধারণত অহঙ্কার জাগ্রত হয় হীনতাকে সামনে দেখে। অপরের হীনতা দেখে তা জেগে ওঠে।

একজনকে ঝাঁট দিতে হয়, অপরকে নয়। তা দেখে অহঙ্কার এসে গেল। এ তো আমার সামনে ঝাঁট দেয়। অহঙ্কারের নিমিত্ত তৈরি হল। জীবিকার তারতম্য দেখেও আমাদের মধ্যে অহঙ্কার জেগে ওঠে।

জীবিকা সৃষ্টি করে মায়া। আহার এবং জীবিকার জন্য কত

লোক যে কত রকম আচরণ করে তার ঠিক নেই। মায়া জাগে, অর্থ উপার্জনের জন্য কত লোক কত রকমের লোভাতুর আচরণ করে। আহার প্রবৃত্তির জন্য ক্রোধ প্রভৃতি চার প্রবৃত্তি অভিব্যক্ত হয়।

ভয়ের কারণেও উপরোক্ত চার বৃত্তি অঙ্কুরিত হতে পারে। অনুরূপভাবে মৈথুন এবং পরিগ্রহ বৃত্তির কারণে উপরোক্ত চার বৃত্তি অঙ্কুরিত হয়।

পরিগ্রহ থেকে জন্মায় ক্রোধের প্রবৃত্তি। তার সঙ্গে তো অহঙ্কার থাকেই। যার সংগ্রহ বা পরিগ্রহ বেশি, সন্দেহ নেই সে অহঙ্কারী হবে। মায়ার প্রবৃত্তিও পরিগ্রহের কারণ হয়। পরিগ্রহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে লোভ।

প্রথম বর্গের চিত্তবৃত্তিগুলির দ্বিতীয় বর্গের চিত্তবৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলার, তাকে উত্তেজিত করার ক্ষমতা আছে।

তৃতীয় বর্গে রয়েছে, ওধ এবং লোক সংজ্ঞা। 'ওধ'-এর অর্থ হল, সম্মিলিত বা একত্রিত থাকার প্রবৃত্তি। মানুষ মাত্রের একত্রিত থাকার, সম্মিলিত হওয়ার, একসঙ্গে বাস করার মনোবৃত্তি থাকে। মনোবিজ্ঞানী ম্যাক্সমুলার মানুষের একটি প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। প্রবৃত্তিটি হল, যূথবদ্ধতা। এর অর্থ হল, একত্রে থাকার মনোবৃত্তি। ওধ সংজ্ঞার সঙ্গে আমরা এই মনোবৃত্তির তুলনা করতে পারি। এই হল ওধ চেতনা, সমষ্টি চেতনা বা সম্মিলিত থাকার চেতনা। পশুদের মধ্যেও এই চেতনা রয়েছে, মানুষেরও। এজন্যই গ্রাম তৈরি হয়েছে, শহর তৈরি হয়েছে, সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। সমাজে থাকার মনোবৃত্তি এবং সমাজকে অনুকরণ করার প্রবৃত্তিকে আমরা বলতে পারি সামুদায়িক চেতনা। বহু লোককে অনেকবার বলতে শুনি, 'সকলের যা হবে তা আমারও হবে। তফাৎটা কি হবে? সবাই যখন এ রকম কাজ করছে তখন আমিই বা করব না কেন? সকলের যা পরিণাম হবে তা আমারও হবে। আমি কেন একা বঞ্চিত থাকব?' এই উক্তি

সামুদায়িক চেতনাকেই প্রকাশ করে। একেই আমরা বলি ওঘ সংজ্ঞা। একে যূথবদ্ধতাও বলা যায়।

আর একটি হল লোক সংজ্ঞা। একে বলা হয় বৈয়ক্তিক চেতনা। প্রতিটি প্রাণীরই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে কিছু কিছু আচরণ হয়। যে আচরণ সামুদায়িক চেতনার কারণে হয় না, কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়, তাকে বলা যায় বৈয়ক্তিক চেতনার কাজ। ব্যবসায়ীর পুত্র ব্যবসায়ী, স্বর্ণকারের পুত্র স্বর্ণকার, ছুতোরের ছেলে ছুতোর এবং কৃষকের পুত্র কৃষক হয়। এমন ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়, পিতার ব্যবসা পুত্র সামলে নেয়। এর পেছনে এক বৈয়ক্তিক বৈশিষ্ট্য কাজ করে। সমগ্র সমাজে অবশ্য এই অবস্থা দেখা যায় না। এই বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং সে ঐদিকেই চলে যায়। এই চেতনা ব্যক্তিগত। এক বিশেষ ধরনের রুচি।

সংজ্ঞা হল স্রোত, মূল স্রোত নয়

দশ রকমের চেতনা রয়েছে। আমাদের ব্যবহার এবং আচরণকে তা প্রভাবিত করে। একেই আচরণের স্রোত বলা যায়।

প্রশ্ন উঠবে, এটাই কি মূল স্রোত? প্রশ্ন আরও এগিয়ে গেল। উত্তর হবে, এটি স্রোত বটে, কিন্তু মূল স্রোত নয়। গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে। প্রবাহ বন্ধ করে বাঁধ তৈরি করা হল। বাঁধের ফটক খুলে দেওয়া হল। সেখান থেকে জলের প্রবাহ চলছে। বাঁধ ঐ স্রোত তৈরি করল বটে, কিন্তু তা মূল স্রোত নয়। মূল স্রোত খোঁজার জন্য গঙ্গোত্রী পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে। গঙ্গার মূল স্রোত হল গঙ্গোত্রী। সেখান থেকে শুরু হয়েছে গঙ্গার প্রবাহ।

এই দশটি প্রবৃত্তি হল ঐ মাঝের বাঁধ। এর ফটক খোলা আছে। এর থেকে দ্রুত ধাবমান চেতনা আগে প্রবাহিত হচ্ছে এবং আমাদের আচরণগুলিকে প্রভাবিত করছে। কিন্তু এগুলি তো মূল স্রোত নয়। মূল স্রোতটিকে খুঁজতে হলে অনেকটা আগে এগিয়ে যাবার প্রয়োজন আছে। আজকের শারীরবিদ্যা অনেক সূক্ষ্ম অনুসন্ধান

চালিয়েছে। সবচেয়ে আগে পাঁচটি মূল তত্ত্ব বা ভৌতিক তত্ত্বকে মূল কারণ বলে ধরা হতো। কিন্তু আজকের বৈজ্ঞানিক সে কথা মানেন না। তাঁরা এত সূক্ষ্মভাবে বিষয়টির অনুসন্ধান করেছেন যে আগেকার পাঁচটি—তত্ত্ব ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ—তাঁদের কাছে সংরক্ষণ মাত্র বলে বিবেচিত হচ্ছে। ওগুলি মূল কারণ নয়। মূল কারণ অন্য কিছু।

মূল স্রোতের মীমাংসা

প্রাচীন শরীর-বিশেষজ্ঞরা হৃৎপিণ্ড, স্নায়ু-সংস্থান এবং মূত্রগ্রন্থিকে এই শরীরের সঞ্চালক মনে করতেন। কিন্তু বর্তমান শরীরশাস্ত্রবিষয়ক অনুসন্ধান এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে, মূল কারণ রয়েছে আরও অনেক গভীরে। তা হল, আমাদের হরমোন ক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলির স্রাব ক্ষরণ। আমাদের শরীরস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থিগুলি যে স্রাব ক্ষরণ করে, যে হরমোন ক্ষরিত করে, সেগুলিই হল মূল—সেগুলিই মূল আধার। শরীর ও মনকে তারা যতটা প্রভাবিত করে, হৃদয়, যকৃৎ, স্নায়ু-সংস্থান প্রভৃতি ততটা প্রভাবিত করতে পারে না। হরমোনের আবিষ্কার, গ্রন্থিস্রাবের আবিষ্কার চিকিৎসাজগতে সত্যিই এক যুগান্তর এনে দিয়েছে, কায়াকল্প তৈরি করেছে। এই আবিষ্কার মনোবিশ্লেষণ এবং শরীর-বিকাশ বিদ্যাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে।

গ্রন্থিগুলি আমাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। কণ্ঠমণি বা থাইরয়েড শরীরের বৃদ্ধি ও যাবতীয় বিকাশকে প্রভাবিত করে। এই স্রাবক্ষরণ ঠিকমত না হলে ব্যক্তি বামন হয়ে থাকবে। থাইরয়েডের উৎপাদিত স্রাবের নাম থাইরক্সিন (Thyroxin)। এই রস শরীরের পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং মনের বিকাশের সহায়ক। প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপন্ন না হলে শরীর যেমন কমজোরী থাকবে, তেমনি বুদ্ধির বিকাশ হবে না, মনেরও বিকাশ ঘটবে না। ভয় পেলে এবং ক্রুদ্ধ হলে থাইরয়েডের স্রাবক্ষরণ

ঠিকভাবে হয় না। এর পরিণামে নানারকম শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়।

পিনিয়াল গ্রন্থিটি ঠিকভাবে কাজ না করলে প্রতিভার বিকাশ ঘটে না। এই গ্রন্থিটির স্রোত ছাড়া কেউ প্রতিভাশালী হতে পারে না। সমুচিত পরিমাণে এই গ্রন্থির হরমোন ক্ষরিত না হলে শরীরের ভারসাম্য, মন এবং শরীরের তথা প্রাণের নিয়ন্ত্রণ ঠিক থাকতে পারে না।

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিটির রসক্ষরণ ঠিকমত না হলে ভয়, চিন্তা ও ক্রোধ উৎপন্ন হয়, চাঞ্চল্য ঘটে। এই ক্ষরণ না হলে নিমিত্তও উৎপন্ন হয়। এর প্রভাবে ব্যক্তি কারণে-অকারণে চিন্তিত হয়ে পড়ে।

এই গ্রন্থি-নিঃসৃত রসের নাম অ্যাড্রিনালিন। এই রস শরীরের গতিশীলতার কারণ। কোন প্রাণী যখন বিপদে পড়ে তখন এই গ্রন্থির স্রাব ক্ষরণের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং রসটি রক্তের সঙ্গে বেশি মাত্রায় মিশে গিয়ে প্রাণীটিকে বিপদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা দান করে। কখনও কখনও অসাধারণ কার্যও এর ফলস্বরূপ সংঘটিত হতে পারে।

গোনাড বা যৌন-গ্রন্থি থেকে যৌন উত্তেজনা এবং শারীরিক স্ফূর্তি উৎপন্ন হয়। কর্মশাস্ত্রের ভাষায় যাকে আমরা বলি 'বেদ', তার সঙ্গে এই গ্রন্থির সম্বন্ধ আছে। লিঙ্গ পরিবর্তন অর্থাৎ স্ত্রী থেকে পুরুষে বা পুরুষ থেকে স্ত্রীতে রূপান্তর এই গ্রন্থির স্রাবক্ষরণের ওপর নির্ভরশীল।

গ্রন্থিস্রাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের গ্রন্থিগুলির স্রাবক্ষরণে পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নানা ধরনের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই গ্রন্থিগুলি বা তার রসক্ষরণও মূল কারণ নয়। এর পেছনে আরও সূক্ষ্ম কারণ আছে। এই যে রসস্রাব, যা আমাদের বৃত্তি, ব্যবহার এবং আচরণকে প্রভাবিত করছে তার পেছনেও দ্বিতীয় কোন সূক্ষ্ম কারণ আছে। একটি মহাস্রোত

বা মূল স্রোত নিশ্চয়ই রয়েছে। সেই মূল স্রোত আবিষ্কারের জন্যই আমাদের যাত্রা। যাত্রাপথে চলতে চলতে আমরা একটি বিন্দুতে পৌঁছেছি। ঐ বিন্দু, ঐ মূল স্রোত, ঐ গঙ্গোত্রীর নাম হবে 'কর্ম'। কর্মই হল আমাদের আচরণ, ব্যবহার ও বৃত্তির মূল স্রোত বা মহা স্রোত।

আজ কেবল কর্মের পৃষ্ঠভূমি সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এর পর মূল স্রোতের স্বরূপ কেমন, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব।

৯.

কর্ম ঃ চারটি সূত্র

- বিজ্ঞানের চার সূত্র — দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, কাল।
- কর্মশাস্ত্রের পাঁচ সূত্র — দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, অদৃশ্য, অমূর্ত।
- স্থূল শরীরের সঙ্গে গ্রন্থিগুলির সম্বন্ধ।
- সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ।
- কিছু কিছু আকস্মিক বলে মনে হয়, কিন্তু তাও আকস্মিক নয়।
- প্রবৃত্তি এবং পরিণামকে পৃথক করা যায় না।
- আজকের প্রবৃত্তি ঃ অতীতের পরিণাম। আজকের পরিণাম ঃ অতীতের প্রবৃত্তি।
- কার্য-কারণের মীমাংসায় তিনটিই আকাঙ্ক্ষিত—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

কর্মের পাঁচ সূত্র

কিছুকাল আগে পর্যন্তও বিজ্ঞানের সঙ্গে তিনটি সূত্রের পরিচয় ছিল—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা। পৃথিবীর এই হল তিনটি সূত্র। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন-এর আবিষ্কারের পরে এর সঙ্গে চতুর্থ সূত্র সংযুক্ত হয়েছে। আজকের বৈজ্ঞানিক জগৎ চারটি সূত্রের সঙ্গেই পরিচিত। চতুর্থ সূত্রটি হল—কাল, কালের অবধারণা।

এতে যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে, অতীতের যাত্রা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এতে পেছনে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

কর্মশাস্ত্রে পাঁচটি সূত্রের কথা আগে থেকেই স্বীকৃত ছিল এবং পাঁচটি সূত্রের ব্যাপারটাও খুব স্পষ্ট ছিল। এতে চতুর্থ সূত্র হল, অদৃশ্য এবং পঞ্চম সূত্রটি হল, অমূর্ত।

এমন তত্ত্ব আছে যার দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ নেই, উচ্চতাও নেই। কোন উপকরণের সাহায্যে তাকে দেখা যায় না। অতি সূক্ষ্ম উপকরণও তাকে ধরতে পারে না, দেখতে পারে না। এদের চর্ম-চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, তাই এদের আমরা অদৃশ্য বলি। এদের দেখা যায় কেবল অতীন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা।

পঞ্চম মাত্রা হল, অমূর্ত। এটি হল বর্ণ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শের অতীত। এই অমূর্তের সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ আছে, তাই পঞ্চম সূত্র পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে।

কর্মের চতুর্থ সূত্র

প্রথমে চতুর্থ সূত্রের দিকেই যাত্রা শুরু করা যাক। আমাদের শরীরের গ্রন্থিগুলি থেকে যে স্রাব ক্ষরিত হয় তার কাজ দেখা যায় আমাদের স্থূল শরীরের ওপর। স্থূল শরীরের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে। গ্রন্থিগুলি হল স্থূল শরীরের অঙ্গ। এতে স্থূল শরীর এবং মন প্রভাবিত হয়।

স্থূল শরীরের সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ নেই। তার সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে সূক্ষ্ম শরীরের। কর্মের অণু খুবই সূক্ষ্ম হয়। গ্রন্থিগুলির স্রাব হল অষ্টস্পর্শী—আট স্পর্শযুক্ত। ঐ আট স্পর্শ হল—শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, গুরু, লঘু, মৃদু এবং কঠোর। কর্মের অণুগুলি সূক্ষ্ম—সেগুলি চার স্পর্শযুক্ত। ঐ চার স্পর্শ হল—শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং রুক্ষ। প্রতিটি পরমাণু কর্ম হতে পারে না। সেগুলিই কেবল কর্ম হতে পারে যেগুলি খুব সূক্ষ্ম, যেগুলি কেবল চতুঃস্পর্শী। স্থূল পরমাণু কর্ম হতে পারে না। তার কর্ম হওয়ার এবং অমূর্তকে শক্তি দিয়ে

আবৃত করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু সূক্ষ্ম পরমাণুগুলির মধ্যে ঐ ক্ষমতা আছে এবং সেগুলি কেবল চতুঃস্পর্শীই হয়। আমাদের গ্রন্থি-গুলির যাবতীয় স্রাব অষ্টস্পর্শী। কিন্তু কর্মের জন্য নির্দিষ্ট অণুগুলি চতুঃস্পর্শীই হবে। অর্থাৎ, এদিক দিয়ে অণুগুলি দু ধরনের হয়ে গেল—এক ভাগে পড়ল, চতুঃস্পর্শী অণুর দল এবং অন্য ভাগে পড়ল, অষ্টস্পর্শী অণুর দল। চতুঃস্পর্শীগুলো সূক্ষ্ম। যে, কোন সূক্ষ্মতম উপকরণেও তারা দৃশ্য নয়। এখন এমন অনেক সূক্ষ্ম উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলির সাহায্যে চর্মচক্ষুর অদৃশ্য পর্দাকেও দেখা যায়। কিন্তু কর্মের পরমাণু এমনই সূক্ষ্ম যে, কোন উপকরণের সাহায্যেই তাকে দেখা সম্ভব নয়। কোন উপকরণের বাঁধনে তাকে আটকানো যায় না। এদিক দিয়ে দেখলে আমরা ওদের অদৃশ্য বলতে পারি।

এগুলি সবই হল অদৃশ্য জগতের আলোচনা। সেই বিষয়ের আলোচনা যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, যা আমাদের আবিষ্কৃত উপকরণের বিষয় নয়। ওগুলিকে জানতে হলে বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় জ্ঞান প্রয়োজন।

কর্ম-শরীরের ছবি

বৈজ্ঞানিকরা এখন এমন জিনিস আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে মৃত্যুর সময়ে স্থূল শরীর থেকে নির্গত আত্মার ছবি পর্যন্ত নেওয়া যায়। ঐ সময় আত্মা একলা থাকে না। তার সঙ্গে থাকে সূক্ষ্ম শরীর।

বৈজ্ঞানিক বলেন, ওটি আত্মার ছবি। আত্মার ছবি নেওয়া যায় না, তা হল অমূর্ত। অমূর্তকে কোন উপকরণ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু আত্মা যখন স্থূল শরীর ছেড়ে বাইরে আসে, তখন তার সঙ্গে অবশ্যই সূক্ষ্ম শরীরও থাকে। ঐ সূক্ষ্ম শরীর দুটি—তৈজস এবং কার্মণ। তৈজস শরীর হল তেজোময় পরমাণুর, আর কার্মণ শরীর হল কর্ম পরমাণুর। কর্মের শরীর নিশ্চিতভাবে তার সঙ্গে থাকে।

কর্ম-শরীর ছাড়া নতুন জন্ম হয় না, নতুন শরীর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তৈজস শরীরের ছবি আমরা নিতে পারি, কেবল আত্মার ছবি নেওয়া যায় না।

কর্মবিষয়ক আলোচনার অর্থ হল, অতীতের আলোচনা। আমাদের বর্তমানের যাত্রাপথে কর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। তার সম্পর্ক হল অতীতের যাত্রায়। অতীতে আমাদের যে প্রবৃত্তি ছিল, অতীতে আমরা যা কিছু করেছিলাম, তার সঙ্গে আমাদের আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। বর্তমানের মাধ্যম থেকে অতীতকে বোঝার চেষ্টা হল এটাই।

মহাবীরের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত : কর্ম পৌদ্‌গলিক (আণবিক)

কর্ম আণবিক। মহাবীর এই এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, কর্ম হল আণবিক। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র মহাবীরই এককভাবে করেছিলেন। অন্যান্য কর্মবাদী দার্শনিকরা কর্মকে বাসনারূপে স্বীকার করেছেন, সংস্কার রূপে স্বীকার করেছেন, কিন্তু আণবিক রূপে কেউই স্বীকার করেন নি।

কর্ম হল একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। আমাদের গ্রন্থিগুলির যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, তেমনি কর্মেরও রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়। কর্ম হল আণবিক পদার্থ। কর্ম কোন বাসনা নয়, আবার কোন সংস্কারও নয়। বাসনা এবং সংস্কার হল আমাদের জ্ঞানে কর্ম কর্তৃক সম্পন্ন সংযোগ। যে কোন একটি বস্তুর কথা ধরি। সবচেয়ে আগে হয় অবগ্রহ—অর্থাৎ বস্তুটিকে সামান্য রূপে গ্রহণ করা। অবগ্রহের পরে হয় 'ঈহা'। গৃহীত বস্তুটি সম্পর্কে ভাবি, বস্তুটি কি। কোন নতুন জিনিসকে আমরা দেখলাম, জানলাম, গ্রহণ করলাম। কিন্তু তার পরেও প্রশ্ন জাগতে থাকে, বস্তুটি কি। বস্তুটি কি হওয়া উচিত। এভাবে চিন্তা করতে করতে আমরা নিষ্কর্ষে পৌঁছই। অনেক সংশয় মনে ঘুরপাক খেতে থাকে, অনেক তর্ক-বিতর্কের ঘাট পার হতে হয়। এভাবে যখন কোন নিশ্চিত প্রমাণ

মেলে, নিশ্চিত কোন আধার পাওয়া যায়, তখন আমরা নিষ্কর্ষের স্তরে পৌঁছে গিয়ে বুঝতে পারি, বস্তুটি অমুক। এই হল 'অবায়' ব্য নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। বস্তুর প্রতি যখন সংশয় থাকে না, তখন নিশ্চিত হয়ে যায় বস্তুর স্বরূপ—অর্থাৎ বস্তুটি এই। বস্তুটি মানুষ, স্তম্ভ বা অন্য কিছু। নিশ্চয়ের পিছনে ধারণা হয়। জ্ঞানের এই হল চতুর্থ ক্রম। যা নিশ্চয় হয় তা আমাদের ধারণায় স্থির হয়ে যায়। তা চলে যায় আমাদের স্মৃতিকোষ্ঠে। ধারণা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। অবগ্রহে খানিকটা সময় থাকে, ঈহায় কিছু সময় লাগে, অবায়-এ খানিকটা বেশি লাগে, কিন্তু ধারণা দীর্ঘ সময় ধরে চলে। ধারণার সময় হল সবচেয়ে দীর্ঘ। গ্রহণ, বিমর্শ এবং নিশ্চয়ের সময় লাগে অল্প, কিন্তু ধারণার সময় দীর্ঘ। যেমন-তেমন হলে হাজার বছর ধরেও তৈরি হতে পারে এই ধারণা। ধারণারই এক নাম হল বাসনা। ধারণার আর এক নাম সংস্কার। আবার, এরই আর এক নাম, অবিচ্যুতি। ধারণা চ্যুত হয় না। স্থির থাকে, রূপান্তরিত হয় বাসনায়, সংস্কারে। ঐ ধারণা, বাসনা বা সংস্কার কোন নিমিত্তকে পেয়ে যখন উদ্বুদ্ধ হয়, জাগ্রত হয়, তখন তা হয় স্মৃতি। স্মৃতির হেতু হল বাসনা। স্মৃতির হেতু হল সংস্কার। স্মৃতির হেতু হল ধারণা।

কার্য কার ?

ধারণা ভাল না মন্দ, তা কোন প্রশ্ন নয়। তা ভাল না মন্দ পরিণাম সৃষ্টি করছে, প্রশ্ন তাও নয়। তা কেবলমাত্র স্মৃতির কারণ হয়। এমন কোন পরিস্থিতি, কোন পরিবেশ বা হেতু পাওয়া গেল যার সংস্পর্শে এসে স্মৃতি-প্রকোষ্ঠের মধ্যে স্থিত কথাগুলি জেগে উঠল, স্মৃতির রূপে জাগরিত হল। আমাদের জ্ঞান হল। যে শব্দ শুনেছিলাম, যে দৃশ্য দেখেছিলাম, তার সম্পূর্ণ ছবিটি স্মৃতির আধারে আমাদের সামনে এসে গেল। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলা হয় 'স্মৃতি-চিত্ত'। স্মৃতির প্রতিরূপ আসে আমাদের সামনে।

যেমনটি দেখেছিলাম, যেমনটি শুনেছিলাম, তেমন তেমন জিনিস আমাদের স্মৃতি-কোষ্ঠে উজ্জীবিত হয়। কখনও কখনও এমন হয়, সঙ্গীতের কোন মধুর স্বর কখনও হয়ত শোনা ছিল, কোন নিমিত্তের সংস্পর্শে এসে তা স্মৃতিকোণে উজ্জীবিত হয়ে উঠল এবং তখুনি কানে ঐ মধুর স্বরের গুঞ্জন শুরু হল। এগুলি কেবলমাত্র স্মৃতি। এভাবে বহু বছর আগে দেখা যে দৃশ্য স্মৃতিকোণে সঞ্চিত ছিল তা নিমিত্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে দৃশ্যমানের মত হয়ে ওঠে। আকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে পথ, বাড়ি, বাগান—সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এগুলি সবই হল স্মৃতির রূপধারী, সবই হল বাসনা এবং সংস্কারের কার্য। এর সঙ্গে আমরা ভাল কিংবা মন্দকে জুড়তে পারি না। এগুলি বাসনার কাজ নয়, সংস্কারেরও নয়। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এই কাজটি কার?

কর্মের সম্বন্ধ: কখন? কিভাবে?

স্মৃতির উজ্জীবনের পর, ভাল ও মন্দের সংযোগকারী এক তৃতীয় সত্ত্বার আবির্ভাব হয়, তারই নাম কর্ম। কর্ম কোন বাসনা নয়, সংস্কার নয়, ধারণা বা স্মৃতি নয়। এগুলির সকলের থেকে কর্ম পৃথক। আলাদা এই কারণে যে, জ্ঞানের ক্রমপর্যায়ে কর্ম সৃষ্টি হয় না। জ্ঞানের যা ক্রম, নতুন কিছুকে জানার যা ক্রম, তাতে কর্ম সৃষ্টি হয় না, কর্মের সঙ্গে আমাদের আত্মার সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। কিভাবে এবং কখন এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা আমাদের আলোচনা করতে হবে।

কর্ম-সম্বন্ধের মূল হেতু: রাগ-দ্বেষ

মহাবীরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'ভন্তে! কোন্ কোন্ স্থান থেকে কর্মের সম্বন্ধ হয়?'

মহাবীর বলেছিলেন, দুটি স্থান থেকে কর্মের সম্বন্ধ হয়। একটি স্থান হল, রাগ এবং অপরটি হল, দ্বেষ। এই দুই স্থান থেকে আত্মার

সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ হয়। এ হল রাগ ও দ্বেষ থেকে স্থাপিত সম্বন্ধ। নতুন জ্ঞান থেকে কোন সম্বন্ধ হয় না, বাসনা থেকে কোন সম্বন্ধ হয় না, সংস্কার এবং স্মৃতি থেকেও কোন সম্বন্ধ হয় না। এদের পৃষ্ঠ-ভূমিতে যতক্ষণ রাগ ও দ্বেষ হয় না, ততক্ষণ কর্মেরও কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। আমরা যতই জানি, কর্মের সম্বন্ধ হয় না। যেমন যেমন চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকবে, আমাদের জানার ক্ষমতা তত বাড়তে থাকবে, তবুও কিন্তু কর্মের কোন সম্পর্ক স্থাপিত হবে না। কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় রাগ থেকে, দ্বেষ থেকে।

অনুভূতি দু ধরনের হয়। একটি হল, প্রীত্যাত্মক অনুভূতি এবং অপরটি হল, অপ্রীত্যাত্মক অনুভূতি। প্রীত্যাত্মক অনুভূতি বা সংবেদনকে বলা হয় রাগ এবং অপ্রীত্যাত্মক অনুভূতি বা সংবেদনকে বলা হয় দ্বেষ। প্রীতি এবং অপ্রীতি—এই দুয়ের বাইরে তৃতীয় কোন সংবেদন হয় না। যাবতীয় অনুভূতি এবং সংবেদন এই দুই অনুভূতি ও সংবেদনে একীভূত হয়। এদের বিস্তার হল—ক্রোধ, মান, মায়া এবং লোভ। ভয়, শোক, ঘৃণা, হাস্য এবং বাসনাও (কাম-বাসনা) এই দুই অনুভূতির বিস্তার—স্বতন্ত্র অনুভূতি নয়। যাবতীয় অনুভূতি এই দুয়ে একীভূত হয়।

জৈন আচার্যরা ক্রোধ ও অভিমানকে দ্বেষাত্মক অনুভূতি এবং মায়া ও লোভকে রাগাত্মক অনুভূতি বলে ধরেছেন। রাগ এবং দ্বেষ—উভয়ই সাধারণ বর্গীকরণ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করায়, নতুন দৃষ্টিতে বিচার করায় এই বর্গীকরণের বিস্তার হল। সংগ্রহনয়-এর দৃষ্টিতে বিচার করলে বৃত্তি এবং অনুভূতি দুটি—একটি রাগাত্মক, অপরটি দ্বেষাত্মক। আবার, ব্যবহারনয় এবং ঋজুসূত্র-নয়-এর দৃষ্টিতে বিচার করায় এই বর্গীকরণের পরিবর্তন ঘটে গেল। তখন দেখা গেল, অভিমান হল দ্বেষাত্মক, কারণ অভিমান হল অপরের গুণের প্রতি অসহিষ্ণুতার প্রতীক। ব্যক্তি অপরকে সহ্য করতে পারে না, সেজন্যই অভিমান সৃষ্টি হয়। এই হল দ্বেষ, অপ্রীত্যাত্মক

সংবেদন। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, মান কি প্রীত্যাত্মক হয় না? মান প্রীত্যাত্মকও হতে পারে। অপরের প্রতি হীনতা ও অসহিষ্ণুতার ভাব রয়েছে, এজন্যই মান অপ্রীত্যাত্মক। কিন্তু যখন নিজের উৎকর্ষের অনুভূতি হয়, তখন ঐ মান হয়ে যায় প্রীত্যাত্মক। উৎকর্ষ কত সুন্দর লাগে! মানবীয় চেতনা যখন নিজ উৎকর্ষকে অনুভব করে তখন ঐ অনুভূতি অপ্রীত্যাত্মক হয় না, তা হয় প্রীত্যাত্মক। এজন্যই মান হয় প্রীত্যাত্মক এবং অপ্রীত্যাত্মক। অপরের প্রতি হীনতা প্রদর্শনে তা হয় অপ্রীত্যাত্মক এবং নিজ উৎকর্ষের অনুভূতিতে হয়ে দাঁড়ায় প্রীত্যাত্মক।

মায়াকে রাগাত্মক বলে ধরা হয়। মায়ার সময়ে চেতনার যে অনুভূতি হয় তাতে নিজের মনে এই ভেবে আনন্দ হয় যে, খুব বুদ্ধি-মানের মত কাজ করে আমি অপরকে পরাজিত করেছি প্রতারিত করেছি। ঐ সময় মনে আনন্দের অনুভূতি জাগে, প্রীতির অনুভূতি জাগে। মায়া তখন হয় প্রীত্যাত্মক। এটাও একটা কথা।

মায়া বঞ্চনাত্মক চেতনা। অপরকে ঠকানোর কাজটি সে করে। অপরকে তা আঘাত করে। যা অপরের ক্ষতিকারক তা নিশ্চিত-ভাবে অপ্রীত্যাত্মক এবং দ্বেষাত্মক। এভাবে মায়ার অনুভূতি কেবল প্রীত্যাত্মক এবং রাগাত্মকই হয় না, তা অপ্রীত্যাত্মক এবং দ্বেষাত্মকও হয়।

এভাবে লোভকে আমরা বলতে পারি প্রীত্যাত্মক, কারণ লোভ হল এক ধরনের আসক্তি, কিছু নেবার ভাবনা, নিজের জন্য অর্জিত করার ভাবনা। এতে রয়েছে দারুণ প্রিয়তা। কিন্তু যখন অপরের জিনিস নিজের আয়ত্তে আনার চেতনা কাজ করে, যখন অপরের অধিকারকে ছিনিয়ে নেবার চিন্তা জাগে, অপরের অধিকারভুক্ত জিনিসকে ছিনিয়ে নেবার ইচ্ছা হয়, তখন লোভ হয় অপ্রীত্যাত্মক, অপরের ক্ষতিকারক।

মায়া, মান এবং লোভ—তিনটিই প্রীত্যাত্মক এবং অপ্রীত্যাত্মক

হয়। ক্রোধই একমাত্র এমন যা কেবল অপ্রীত্যাত্মক, কারণ তার সম্পর্ক রয়েছে দ্বেষের সঙ্গে, অপ্রীতির সঙ্গে। প্রীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক যুক্ত হয় না। রাগের সঙ্গেও তার সম্পর্ক যুক্ত হয় না।

এভাবে আমাদের যাবতীয় অনুভূতি এবং সংবেদন হয় প্রীত্যাত্মক, নয়তো অপ্রীত্যাত্মক, এই দুই চেতনার মধ্যে সমাহিত হয়।

এসব অনুভূতি এবং সংবেদনের কারণ হল রাগাত্মক চেতনা এবং দ্বেষাত্মক চেতনা। কেবল দুটি কারণ। এরাই ঐ কর্ম-পরমাণুদের আকৃষ্ট করে। কর্ম-পরমাণুদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা-সম্পন্ন আর কোন শক্তি নেই। কেবল ঐ দুই অনুভূতির মধ্যেই ঐ শক্তি নিহিত আছে। এরাই ঐ কর্ম-পরমাণুগুলিকে আকৃষ্ট করে এবং আত্মার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করে।

রাগ-দ্বেষের বলয়

কেন এমন হয়? আত্মার পক্ষে কি এগুলি মঙ্গলজনক? প্রশ্নটি কেবল মঙ্গল বা অমঙ্গলের নয়। এ হল এক জটিলতা, একটি চক্র যার মুখ বেরোয় না। এ হল একটি বলয়। এর আদি বা অন্ত কোথায় জানি না। আরম্ভ কোথায়, শেষ কোথায়, তাও জানি না। আত্মায় রাগ-দ্বেষ আছে কিনা তা নিয়ে জটিলতা আছে। এজন্যই কর্ম-পরমাণু বা কর্ম দেখা দেয়, এজন্যই রাগ-দ্বেষ চলতে থাকে। রাগ-দ্বেষের আধারেই কর্মের প্রবেশ ঘটে এবং কর্মের আধারে রাগ-দ্বেষ জীবিত থাকে, চিরজীবী হয়—এই হল এক বলয়। রাগ-দ্বেষের চিরজীবনের কারণ হল কর্ম এবং কর্মের প্রবেশের কারণ হয় রাগ-দ্বেষ। এই হল সম্পূর্ণ চক্র। নিরন্তর গতিময়, কখনও স্তব্ধ হয় না। রাগ-দ্বেষের মাধ্যমে কর্ম এবং কর্মের মাধ্যমে রাগ-দ্বেষ চলতে থাকে।

এই এক বৃত্ত। এতেই আমাদের যাবতীয় স্থিতি ঘুরপাক খাচ্ছে। এই বৃত্তিই আমাদের যাবতীয় আচরণের আধারস্বরূপ।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সংজ্ঞাতীত চেতনার স্তরে না পৌছই, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চেতনা বীতরাগ না হয় ততক্ষণ এই স্থিতি চলতে থাকে। যতক্ষণ বীতরাগ চেতনা প্রাপ্ত না হই, সংজ্ঞাতীত চেতনা উপলব্ধি না করি, ততক্ষণ চেতনা, রাগ-দ্বেষের চেতনা চলতে থাকে। এই চক্র নিরন্তর গতিশীল থাকে। আমাদের যাবতীয় আচরণ ওদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ঘটনার মূল ঘটক—অতীতে

যে কোন ঘটনা বা মানবীয় আচরণকে কেবল পরিস্থিতি, হেতু বা নিমিত্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না। এর ব্যাখ্যার জন্য আমাদের অতীতকে দেখার প্রয়োজন পড়ে। অন্য অর্থে বলা যায়, কর্ম-বিপাকের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের কর্ম-বীজকে দেখতে হয়। দেখতে হয়, এই বিপাকের বা পরিণামের বীজ কোথায় এবং কি? এ ছাড়া এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। কখনও কখনও মনে হয়, কোন ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে গেল। কিন্তু জগতে কোন কিছুই আকস্মিকভাবে ঘটে না। প্রতিটিরই পেছনে একটি হেতু থাকে, কারণ থাকে। লুকোনো যে বীজ, সেটিই হল কারণ। কারণটিকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুঝতে না পারি, ততক্ষণ ঐ আচরণের সঠিক চিত্রও আমরা তৈরি করতে পারি না। একটি লোক সাধারণ জীবন যাপন করতে করতে একটি অসামান্য আচরণ করে। আমরা দেখে আশ্চর্য হয়ে বলি—আরে, ও তো বিরাট বড় মানুষ ছিল। এমন কাজ ও কখনই করতে পারে না। ওর দ্বারা এমন কাজ সম্ভব নয়। একটি 'আশ্চর্য' শব্দ দ্বারা আমরা ঐ ব্যক্তির সঙ্গে তার আচরণের সম্বন্ধকে জুড়তে চাই না, সম্বন্ধটাকে ভেঙ্গে দিতে চাই। এতে অবাক হবার কিছু নেই। পঞ্চাশ বছরের একটি জীবন দেখে, বর্তমান এবং চোখের সামনে সঞ্চারমান জীবনকে দেখে আপনাদের এতটা আশ্চর্য হবার কিছু নেই! যদি আমাদের জীবন কেবলমাত্র পঞ্চাশ বছরের হতো,

তাহলে খুব সহজেই আমরা অবাক হয়ে বলতে পারতাম, 'এমন তো হবার কথা নয়।' কিন্তু এটিও এক আশ্চর্যের বিন্দু এবং ঐ বিন্দুতে পৌঁছে আমরা কিছুক্ষণ থেমে থাকতে পারি এবং অতীতে বিচরণে বাধ্য হই। তখনই আমরা বুঝতে পারি, ব্যক্তির জীবন পঞ্চাশ বছরের মাত্র নয়, আরও পুরনো। এর তাৎপর্য হল, এই ব্যক্তির আচরণ, পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সংঘটিত ব্যবহারের প্রতিফলনমাত্র নয়, অন্য কোন তত্ত্বের প্রতিফলন, যেখান থেকে তা ফলিত হচ্ছে।

অতীতের দর্শন খুবই বিচিত্র হয়। একথা ভাববেন না, বর্তমানের ক্ষণটি সমাপ্ত হলেই সব কিছু সমাপ্ত হয়ে যায়। পৃথিবীতে দু ধরনের পদার্থ আছে - বিনাশী এবং অবিনাশী, নশ্বর এবং অনশ্বর, নিত্য এবং অনিত্য। কেবলমাত্র নিত্যগুলিকে গ্রহণ করে আমরা চলব না, আবার অনিত্যকে মেনেও চলব না। নিত্য এবং অনিত্য, নশ্বর এবং অনশ্বর, শাশ্বত এবং অশাশ্বত—উভয়ের সঙ্গতির ভিত্তিতে যদি কোন নিষ্কর্ষ নির্গত হয় তাহলে আমাদের নিষ্কর্ষ সত্য হবে, নইলে তা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে। এই নিত্য এবং অনিত্যের সংযুক্তি, ক্ষণিক এবং অক্ষণিকের যে সংযুক্তি, তার ভিত্তিতে যদি আমরা নিষ্কর্ষকে বের করতে পারি, তাহলে যা দাঁড়াবে তা হল: অস্তিত্বশীলের কিছুই নষ্ট হবে না। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, শক্তি কখনই নষ্ট হয় না। পদার্থ কখনও বিনষ্ট হয় না। যা যতটুকু আছে, তা ততটুকুই ছিল এবং ততটুকুই থাকবে। ভগবান মহাবীরও বলেছেন—দ্রব্য কখনই বিনষ্ট হয় না, তার পর্যায়গুলি কেবল বদলাতে থাকে। পদার্থ পরিবর্তনশীল, তার রূপান্তর ঘটতে থাকে—কিন্তু মূল কখনই বিনষ্ট হয় না। সত্তা কখনই বিনষ্ট হয় না। যার অস্তিত্ব স্থাপিত হয়েছে, তা কখনই নষ্ট হয় না। পর্যায়ও চিরকালীন হয়। সেগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয় না।

বিচিত্র প্রতিকৃতি

আমাদের শরীর থেকে বিচিত্র প্রতিকৃতি নির্গত হয়। প্রতিটি

প্রাণীর শরীর থেকেই কেবল নয়, প্রতিটি পদার্থের ভেতর থেকেও ঐ আকারের প্রতিকৃতি নির্গত হয় এবং আকাশে তা নির্গত হয়। আমাদের চিন্তার যে প্রতিকৃতি নির্গত হয়, তারও ছবি নির্গত হয় এবং আকাশে সেগুলি ছড়িয়ে যায়। আমরা কথা বলি। ভাষার পরমাণুগুলি আকাশে ছড়িয়ে যায় এবং হাজার হাজার বর্ষ পর্যন্ত ঐ রূপেই তা থেকে যায়। অতীতের যাত্রার এই হয় ভিত্তি। চার মাত্রার এই হল আধার।

নিজেদের চেতনাকে যদি আমরা বিকশিত করতে পারি, অবধিজ্ঞান এবং মনঃ-পর্যবেক্ষণজ্ঞানকে যদি বিকশিত করি, তাহলে হাজার বছর আগেকার শারীরিক আকৃতিকে আমরা দেখতে পারি। হাজার হাজার বছর আগে কথিত ভাষার যে বর্গণা ছিল, ভাষার যে পরমাণু ছিল, সেগুলিকে আমরা শুনতে পারি। ভাষার, মনের ও শরীরের প্রতিকৃতিটি কেমন, তা আমরা দেখতে পারি, শুনতে পারি, পড়তে পারি। চেতনার বিকাশের দ্বারা এ কাজ করা সম্ভব। অথবা কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করেও তার মাধ্যমে এ কাজ করা সম্ভব।

রাম, কৃষ্ণ, মহাবীর, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের বাণীর পরমাণুগুলিকে ধরে আমরা যাতে তা সরাসরি শুনতে পারি, বিজ্ঞানজগতে তারও প্রচেষ্টা চলছে। প্রচেষ্টা চলছে। কবে সফলতা আসবে তা বলা সম্ভব নয়। তবে, এমন হওয়া অসম্ভব নয়। নিশ্চয়ই সম্ভব, কারণ আধার তো রয়েছে। ভাষা যখন মজুত রয়েছে, তখন প্রশ্ন ভাষাকে নিয়ে নয়, কি করে তাকে ধরা যাবে। ভাষাকে গ্রহণ করার ভাল মাধ্যম যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমরা শব্দকে শুনতে পারি, শব্দের আকৃতিকে সরসরি দেখতে পারি। আত্মাকে আমরা দেখতে পাব না, কিন্তু ঐ মহাপুরুষদের শরীরের আকৃতিকে দেখতে পাব। ওঁরা যা ভেবেছিলেন, যা বলেছিলেন, তাকে জানতে পারি।

অতীতের অনাবৃত করণ

একই ভাবে কর্মের পরমাণুগুলি, যেগুলি আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং বিপাকের পর চলে যায়, সেগুলিও আকাশে ভরে আছে। তার আধারে নির্ণয় করা যায়, এই ব্যক্তির এই বিপাকের কারণ কি, অতীতে উনি কি করেছিলেন এবং কোন্ ধরনের কোন্ মাত্রার রাগ-দ্বেষ দ্বারা এই পরমাণুগুলি আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ফলে ব্যক্তির কোন্ ধরনের বিপাক হয়েছিল, তাও জানা সম্ভব।

আমরা শুনেছি, পড়েছিও, এক ব্যক্তি অতীন্দ্রিয়জ্ঞানী মুনি-ঋষির কাছে যান, তীর্থঙ্কর বা কেবলজ্ঞানীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভন্তে! আমি এখন এই বিপাক ভোগ করছি। আপনি এখন বলুন, আমি কি করেছিলাম, যার বিপাক আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে? এসব কিসের পরিণাম?' ঐ অতীন্দ্রিয়জ্ঞানী তখন বললেন—'তুমি অমুক জীবনে অমুক প্রবৃত্তিতে লিপ্ত হয়েছিল, এটা তারই পরিণাম, তারই বিপাক।'

ভগবান মহাবীরের কাছে সম্রাট শ্রেণিকের পুত্র মেঘকুমার দীক্ষিত হয়েছিলেন। উনি মুনি হলেন। জীবনের প্রতি তাঁর অধীরতা লক্ষ্য করা গেল। তখন তিনি ভগবান মহাবীরের কাছে গিয়ে বললেন—'ভন্তে! আপনার সাধুতাকে আপনি সামলান! আমি ঘরে চললাম!' মহাবীর বললেন, 'মেঘকুমার! এ বড়ই আশ্চর্যের কথা। আজ তুমি মানুষ, এক সম্রাটের পুত্র, আমার শিষ্য। মুনি হয়েছ, অথচ একটু কষ্ট দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছ? এত অধীর হয়ে পড়লে? তোমার খেয়াল নেই, তোমার হাতি-জন্মে তুমি কি ভয়ঙ্কর কষ্ট সহ্য করেছিলে। সেসব তুমি ভুলে গেছ?' কে ভুলে গেছে? কেউ ভোলে নি। ব্যস্, যে স্মৃতি লুকোনো ছিল, তাকে একবার শুধু উজ্জীবিত করার প্রয়োজন ছিল। মেঘকুমারের মনে

পূর্বজন্মের স্মৃতি জেগে উঠল। হাতি-জন্মে নিজের যাবতীয় কষ্টকে উনি চিত্রবৎ প্রত্যক্ষ করলেন। তখন সব কিছু ঠিক হয়ে গেল।

অতীত: কার্যও, আবার কারণও

অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা বর্তমানকে ব্যাখ্যা করতে পারি না। প্রবৃত্তি এবং পরিণাম—এই দুটিকে ভাঙতে পারি না, বাদ দিতে পারি না। যে পরিণাম আজ দৃশ্যমান, তার পেছনে একটি প্রবৃত্তি আছে। পরিণাম ও প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি এবং পরিণাম। আজকের প্রবৃত্তি হল অতীতের পরিণাম, আজকের পরিণাম হল অতীতের প্রবৃত্তি। বর্তমান মুহূর্তের যে প্রবৃত্তি, তার পেছনে অতীতের সম্বন্ধ ও হেতু রয়েছে—এজন্যই ঐ পরিণাম হয়েছে। ভাবি পরিণামের হেতুও হল ওটাই—এজন্যই ঐ প্রবৃত্তি রয়েছে। ওটি যেমন পরিণাম, তেমনি প্রবৃত্তি। যেমন কার্য, তেমনি কারণ। অতীতের কারণ ওর পিছনে রয়েছে, এজন্যই তা কার্য। আবার, ভবিষ্যতের কার্যের ঐ হল হেতু, তাই ঐ কারণ হয়েছে।

বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এই তিনের সংঘটনে আমরা বাঁচতে পারি, সত্যকে ধরতে পারি। কেবল বর্তমানের সাহায্যে তাকে ধরা সম্ভব নয়। সাধনার একটি সূত্র আছে—বর্তমানে থাকো। বর্তমানে থাকতে শেখো। সাধনার দৃষ্টিতে কথাটি বড় সুন্দর। সাধনার দৃষ্টিতে বর্তমানে থাকা ভাবক্রিয়া সম্পন্ন করা, যে সময় যে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে তাতে থাকা, অতীতে না যাওয়া, স্মৃতিতে না যাওয়া, ভবিষ্যতে না যাওয়া, কল্পনাতে না যাওয়া খুবই সুন্দর। কল্পনার আকাশে ওড়া নয়, আবার স্মৃতির সমুদ্রে অবগাহনও নয়। তার বদলে বর্তমানের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকা। সেখানেই স্থির থাকা। সাধনার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সেরা হল বর্তমানে থাকা। অতীতের পাখাকে আমরা বিচ্ছিন্ন করব, ভবিষ্যতের পাখাকেও বিচ্ছিন্ন করব। উভয় পাখাকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল বর্তমানে থাকব।

কিন্তু যেখানে কার্য-কারণের মীমাংসা প্রয়োজন, সত্যের উদ্ঘাটন

প্রয়োজন, সেখানে কেবল বর্তমানের সাহায্যে কাজ করলে চলে না। সেখানে বর্তমানের মত অতীতেরও গুরুত্ব রয়েছে। সেখানে বর্তমানের মত ভবিষ্যৎও গুরুত্বপূর্ণ। কালের অখণ্ডতাকে নিয়ে আমরা কার্য, কারণ, প্রবৃত্তি এবং পরিণামকে জানতে পারি। কালের অখণ্ডতার সাহায্যে ঠিকভাবে ওগুলিকে বুঝতে পারি, ধরতে পারি।

কর্ম দীর্ঘকাল অতীতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, এজন্যই কর্মের সম্বন্ধ রয়েছে অতীতের সঙ্গে। কর্মই সম্বন্ধটি স্থাপন করে, এবং সম্বন্ধ স্থাপনের পরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংযুক্ত থাকে। কর্ম বর্তমানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, কারণ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংযুক্ত থাকার পরে একদিন তা বিসর্জিত হয়ে যায়, সর্বদা সঙ্গে থাকে না। আগন্তুক কখনও সর্বদা সঙ্গে থাকতে পারে না। যা স্থায়ী, কেবল তা-ই সঙ্গে থাকতে পারে। যা সহজ, তা-ই কেবলমাত্র স্থায়ী হতে পারে। যা আগন্তুক, তা সহজ হয় না। কর্ম সহজ হয় না, তা স্বভাবও নয়। সহজ হল চেতনা। সহজ হল আনন্দ। সহজ হল শক্তি। আত্মার স্বাভাবিক যে গুণ, তা হল চৈতন্য। কর্ম এসে যায়, কিন্তু সহজ হয় না। একদিন তা আসে, সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রভাব অর্পণ করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা সৃষ্টি হতে থাকে। সেদিন নিজস্ব সম্পূর্ণ প্রভাব অর্পণ করে, সেদিন তার শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায় এবং তা চলে যায়, বিসর্জিত হয়। বিসর্জনের ক্ষণটি বর্তমান ক্ষণ এবং আসার ক্ষণটি হল অতীত ক্ষণ। বিনাশের ক্ষণটি হল বর্তমান এবং সম্বন্ধ-স্থাপনার ক্ষণটি হল অতীত। এই দুই ক্ষণকে যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, তাহলে কর্মের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত আমরা বুঝতে পারব। এই দুয়ের দীর্ঘ পথেই আমাদের কর্মের যাত্রা শুরু হবে।

১০.

কর্মের রাসায়নিক প্রক্রিয়া (১)

● অমূর্ত আত্মার সঙ্গে মূর্ত কর্মের সম্বন্ধ কিভাবে?

● চিত্ত দু ধরনের—ভাব চিত্ত এবং আণবিক চিত্ত। ভাব চিত্তের সংযোগকারী হল আণবিক চিত্ত এবং আণবিক চিত্তের সংযোগকারী হল স্থূল শরীর।

● ভাবকর্ম—জৈবিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

● দ্রব্যকর্ম—সূক্ষ্ম শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

● বন্ধন কি?

ভাবকর্ম দ্বারা অণুগুলির ব্যক্তির প্রভাবক্ষেত্রে আসা।

অমূর্তের সঙ্গে মূর্তের সম্বন্ধ কিভাবে?

আত্মা হল অমূর্ত এবং কর্ম মূর্ত। অমূর্ত আত্মার সঙ্গে মূর্ত কর্মের সম্বন্ধ কিভাবে স্থাপিত হয়, এই প্রশ্ন সহজেই ওঠে। কিন্তু অমূর্ত ও মূর্তের মধ্যে এমন কোন বিরোধ নেই যে, অমূর্তের সঙ্গে মূর্তের এবং মূর্তের সঙ্গে অমূর্তের কোন সম্বন্ধ থাকবে না। সম্বন্ধ নিশ্চয়ই থাকতে পারে। আকাশ অমূর্ত, কিন্তু আকাশের সঙ্গে প্রতিটি পদার্থের যোগ দেখা যায়। পদার্থের আধারেই আকাশের বিভাজন হয়। তর্কশাস্ত্রের একটি বিখ্যাত বাক্য হল: 'ঘটাকানা, পটাকানা'। আকাশ হল অসীম। কিন্তু ঐ আকাশই কোথাও কলসের আকাশ, কোথাও কাপড়ের, কোথাও বাড়ির—পদার্থের আধারে এভাবে আকাশের যে কত সীমা তৈরি হয় তার ঠিক নেই। প্রতিটি পদার্থের মধ্যে আকাশের অবগাহন, আকাশের আধার দেখা যায়।

সকল দ্রব্যই আকাশের দ্বারা উপকৃত। যদি আকাশ না থাকত, এই শূন্য না থাকত, তাহলে কোথাও আমাদের থাকার জায়গা থাকত না। অমূর্ত মূর্তের উপকার করে এবং মূর্তের সাহায্যে অমূর্তের পরিণমন হয়, এজন্যই অমূর্তের সঙ্গে মূর্তের যে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না একথা বিশ্বাস হয় না। অচেতনের সঙ্গেও চেতনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। চেতনের দ্বারা অচেতনের কিছু উপকার হয়, আবার অচেতনও চেতনের কিছু উপকার করে। উভয়েই একে অন্যের দ্বারা উপকৃত। উপকারের কথাটা আপনি স্বয়ং স্বীকারও করতে পারেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে একাত্মতার। এই একাত্মতা কিভাবে সম্ভব? আত্মার সঙ্গে কর্মের, চেতনা এবং অণুর একাত্মতা কিভাবে স্থাপিত হতে পারে? কিভাবে উভয়ে এক হয়ে যায়? দুই বিপরীতধর্মী দ্রব্যের মধ্যে কখনও একাত্মতা স্থাপিত হতে পারে না। একাত্মতা না ঘটলেও সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। তাদাত্ম্যতা হবে না, সম্বন্ধ হতে পারে। কর্মের অণু কখনও চেতন হতে পারে না এবং চেতন কখনও কর্ম-অণু হতে পারে না। একাত্ম ভাবও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে না। অণু অণুই থাকবে, কর্ম কর্মই থাকবে। চেতনা চেতনাই থাকবে। কর্ম-অণুর দ্বারা চেতনার স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। উভয়ের সংযোগ হতে পারে, সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। সংযোগকৃত বা সম্বন্ধকৃত পরিবর্তন উভয়ের মধ্যেই হবে। চেতনা হবে কর্ম অণুর নিমিত্ত। আবার, কর্ম-অণু হবে চেতনার নিমিত্ত।

নিজ নিজ উপাদান

পরিবর্তন স্বভাবগত হয়। কর্তৃত্ব হয় উপাদানগত। চেতনার নিজস্ব উপাদান রয়েছে, আবার কর্ম-অণুরও নিজস্ব উপাদান রয়েছে। উপাদানে তারা কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। চেতনার উপাদানে কর্ম কোন পরিবর্তন আনতে পারে না, আবার কর্মের উপাদানে, আণবিক তত্ত্বের উপাদানে চেতনা কোন পরিবর্তন আনতে

পারে না। উপাদান নিজের নিজের থাকবে, কেবল নিমিত্তের পরিবর্তন হবে। চেতনার যে উপাদান থাকে, তার কিছু পরিবর্তন ঘটালে কর্ম নিমিত্ত হতে পারে এবং কর্ম-অণুর যে উপাদান থাকে, তার কিছু পরিবর্তনে চেতনাকে নিমিত্ত করা যায়।

আত্মার উপাদান হল—জ্ঞান, দর্শন, আনন্দ এবং শক্তি। আত্মার মৌলিক স্বরূপ হল—জ্ঞান, দর্শন, আনন্দ ও শক্তি। এগুলি হল আত্মার মৌলিক উপাদান। এগুলি কখনও বদলায় না। যতই কর্ম-অণুকে লাগানো হোক, তার পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তার অস্তিত্বেও কোন পরিবর্তন হয় না।

অণুর চারটি উপাদান থাকে—বর্ণ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ। আত্মার যতই নিমিত্ত মিলুক, অণুগুলির বর্ণ কখনই সমাপ্ত হয় না। গন্ধ সমাপ্ত হয় না, রস বা স্পর্শ সমাপ্ত হয় না। আত্মা এদের পরিবর্তন আনতে পারে না। আত্মার নিমিত্ত দ্বারা এই উপাদানগুলির সামান্যতম ক্ষতিও সংঘটিত হতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, আত্মা এবং কর্মের মধ্যে সম্পর্ক কি? একে অন্যের দ্বারা কিভাবে উপকৃত? একের ওপরে অন্যের প্রভাব কি? এগুলি যেমন সত্তাধর্মী নয়, তেমনি উপাদানধর্মীও নয়। নিমিত্তের সীমায় যতটুকু হওয়া সম্ভব ততটুকুই হবে। কিন্তু তারও একটা সীমারেখা আছে। সংসারে অসীম বলে কিছুই নেই। প্রতিটি শক্তিরই একটি সীমা আছে। আমরা তাকে অনন্তও বলতে পারি। নিজের সীমায় আকাশ অসীম, অনন্ত। কিন্তু যেখানে আত্মার অস্তিত্ব আছে, সেখানে আকাশ নেই। যেখানে ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়ের অস্তিত্ব আছে, সেখানে আকাশের অস্তিত্ব নেই। তা রয়েছে নিজস্ব ক্ষেত্রে, নিজ অস্তিত্বে। আকাশ রয়েছে নিজস্ব অস্তিত্বে। কিন্তু যেখানে অপর দ্রব্যের অস্তিত্ব রয়েছে, সেখানে আকাশ নেই। ঐ অস্তিত্বেরও একটি সীমা আছে। পদার্থের অস্তিত্বগত একটি সীমা থাকে। অস্তিত্বগত সীমাতেই রয়েছে সব

কিছু। অস্তিত্ব কিছুই বদলায় না। কেবল পরিধির মধ্যে যাবতীয় পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন হয় পরিধিগত। পরিধিগুলি বদলাতে থাকে, কিন্তু কেন্দ্র পরিবর্তিত হয় না। কর্মের নিমিত্ত পাওয়া গেলে অমূর্ত মূর্তের রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। কর্মের নিমিত্ত পাওয়া গেলে চেতন ব্যবহৃত হতে থাকে অচেতন রূপে। এজন্যই আত্মাকে অণুও বলা যায়, আবার মূর্তও বলা যায়।

সংসারী আত্মা অমূর্ত নয়

আত্মা অমূর্ত, চেতনাময়, অখণ্ড চেতনাময়—এই হল আমাদের ভবিষ্যতের ধারণা। ধারণা করা হয়, যেদিন যাবতীয় কর্মের বিযুক্তি ঘটবে, কর্ম-পরমাণুর সঙ্গে যে সম্বন্ধ রয়েছে তা ছিন্ন হবে, ভাবকর্ম (আস্রব) সমাপ্ত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যকর্মও (কর্ম-অণু) সমাপ্ত হবে, ঐ স্থিতিতে আত্মা অনন্ত জ্যোতির্ময়, অখণ্ড চৈতন্যময় এবং পূর্ণ সূর্যরূপে প্রকটিত হবে। যেখানে কোন আবরণ থাকে না, অচেতনের কোন সম্বল থাকে না, কেবল চেতনা আর চেতনা—আত্মা সেদিন অমূর্ত হয়। পূর্ণ অমূর্ত, যেখানে মূর্তের কোন অংশ থাকে না। মূর্তই তো অমূর্তকে মূর্ত তৈরি করে। যেদিন এই মূর্ত একেবারে ভেঙ্গে যাবে, দূর হবে, তখন শেষ থাকবে অমূর্ত, কেবল অমূর্ত। তখন কোন আকার হবে না, প্রকার হবে না, কোন মূর্তও হবে না, কিছুই হবে না বা থাকবে না—থাকবে কেবল অমূর্ত।

সংসারী আত্মা যে স্থিতিতে আছে, তা অমূর্ত নয়। সংসারে তা কবে থেকে আছে, জানি না। তার কোন ঠিকানাও আমাদের জানা নেই। ঐ স্থিতিতে শুদ্ধতার দৃষ্টিতে আমরা কেবল এ কথাই বলতে পারি না যে, আত্মা অমূর্ত। এ কথাও বলতে পারি না যে, আত্মা অখণ্ড চৈতন্যযুক্ত। তাকে বলা যায়, দুয়ের সংমিশ্রিত রূপ। অমূর্তের সঙ্গে মূর্ত সংযুক্ত হয়েছে। আত্মা চেতনাময়, কিন্তু তার ওপরে অচেতন দ্রব্যের আবরণও রয়েছে। এজন্যই চেতনার

সত্তা পূর্ণ নয়। ওখানে অচেতনেরও কিছুটা অস্তিত্ব হয়েছে। আত্মার সঙ্গে ভাবকর্মের যোগ আছে। ভাবকর্ম অর্থাৎ কর্মের চিত্ত। ভাবকর্ম ছাড়া রয়েছে দ্রব্যকর্ম। দ্রব্যকর্ম হল ভাবকর্মের এক শারীরিক আকার। ভাবকর্মের সহযোগী হিসেবে কার্য করে দ্রব্যকর্ম, তাই দ্রব্যকর্মকে আমরা আণধিক কর্ম বলতে পারি। ভাবকর্ম বা দ্রব্যকর্ম, ভাবচিত্ত বা আণবিক চিত্ত—এদের মধ্যে সহযোগিতা রয়েছে, অসহযোগিতা নেই। দ্রব্যকর্ম হল ভাবকর্মের প্রতিবিম্ব। যেমনভাবে চিত্তের নির্মাণ হয়, তেমনিই অণুরও নির্মাণ হয়।

চেতনার স্বল্পতম অনাবৃতকরণ

চেতনায় ওপরে কর্মের আবরণ এত ঘন যে, জ্ঞানের শক্তি আবৃত হয়ে যায়। অনেকটাই আবৃত হয়ে গেছে, কেবল জীবের খানিকটা অংশ বাকি থাকে যাতে জীবের অস্তিত্ব সুরক্ষিত থাকে। কর্মের আকার যেভাবে তৈরি হয়, ঠিক সেভাবেই তার সংবাদী স্থূল শরীর তৈরি হয় এবং তা এক ইন্দ্রিয়যুক্ত জীব হয়ে ওঠে। একেন্দ্রিয় জীব মানে কি? তার মধ্যে ঘটে ন্যূনতম চেতনার বিকাশ। প্রশ্ন উঠবে, একেন্দ্রিয় জীবের মধ্যেই ন্যূনতম চেতনার বিকাশ হয় কেন? যে কোন বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করবেন, জীবের গুণাবলী অনুযায়ী জীব গঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ঐ পর্যন্তই পৌঁছেছে। কিন্তু কর্মশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা যায় অনেক গভীরে। ঐ ব্যাখ্যা অনুসারে রাগ-দ্বেষ যতটা প্রবল হয়, ঠিক ততটা পর্যন্তই চেতনার নির্মাণ ঘটে, চিত্ত বা ভাবকর্মের নির্মাণ ঘটে। ঐ রাগ-দ্বেষের প্রবলতায় এমন এক চিত্ত নির্মিত হল যেখানে চেতনা গভীর নিদ্রায়, সঘন নিদ্রায় চলে গেল। এই নিদ্রার পারিভাষিক নাম হল, সত্যাবর্দ্ধি নিদ্রা। এমন নিদ্রা যেখানে চেতনা জমে যায়, সঘন হয়। ঐ স্থিতিতে চেতনা জমে গিয়ে এমন প্রগাঢ় নিদ্রার স্তরে চলে যায় যে, চেতনার এক ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র অনাবৃত থাকে। এই অনাবৃত থাকাটাও এই জন্য যে,

জীবের অস্তিত্ব কখনও মেটে না। যদি ঐ অংশও আবৃত হয়ে যায়, তাহলে সম্ভব হলে জীবও অ-জীব হয়ে উঠবে। জীব এবং অ-জীবের মধ্যে ভেদরেখা তো এটাই। সেটুকুও তাহলে যে শেষ হয়ে যাবে। তাই ওরকম কখনই হয় না। চেতনার খানিকটা প্রকাশ ঐ কারণেই থাকে। ভাবচিত্তে ঐ প্রকাশ বেঁচে থাকে। ঐ ভাবচিত্ত অণুগুলিকে প্রভাবিত করলে সূক্ষ্ম শরীরও ঐরকম তৈরি হয়, আণবিক চিত্ত এবং কর্মচিত্তও অমন হয়ে যায়। ওগুলি জ্ঞানের স্রোতরূপী চেতনার অণুগুলির ওপরে নিজের আবরণের প্রলেপ দেয়। সকলের ওপর এভাবে আবরণ দেবার পর ভাবকর্মের সংবাদী হয় দ্রব্যকর্ম (আণবিক কর্ম) এবং আণবিক কর্মের (সূক্ষ্ম শরীরের বা কর্ম শরীরের) সংবাদী হয় স্থূল শরীর। কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রকাশ তাতে থাকে। একমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়েরই স্থান লাভ ঘটল, অন্যান্য ইন্দ্রিয় সমাপ্ত হল।

আমরা যাকে একেন্দ্রিয় বলি, তা একটি মাত্র ইন্দ্রিয়যুক্ত নয়। তাতে অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও বোধ থাকে, কিন্তু তার আকার তৈরি হয় না। ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিকাশের ক্ষমতা ঐ সূক্ষ্ম শরীরের নেই, তাই আকার হয় না। সূক্ষ্ম শরীরের যখন ইন্দ্রিয়বিকাশের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নেই, সম্পূর্ণ বিকাশ নেই, তখন স্থূল শরীর তার সংবাদী হয় না, তাতে তার আকারও তৈরি হতে পারে না। আকার ছাড়া ইন্দ্রিয়-বোধও স্পষ্ট হয় না। একেন্দ্রিয় জীবের মধ্যেও পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অস্পষ্ট বোধ হয়। ঐ ইন্দ্রিয়গুলির স্থান বিকশিত হয় না বলেই ঐ বোধ স্পষ্ট হতে পারে না। শরীরে ইন্দ্রিয়ের যে স্থান আছে, যে কণিকাগুলি রয়েছে, সেগুলি সক্রিয় হয় না, বিকশিত হয় না— এজন্যই স্পষ্ট জ্ঞানের অভাব থাকে।

সম্বন্ধ রচনার সূত্র

এটাও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম—ভাবচিত্তের সংবাদী হয় আণবিক শক্তি এবং আণবিক চিত্তের সংবাদী হয় স্থূল শরীর।

স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর এবং ভাব শরীর (কর্ম শরীর) —এই তিনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা রয়েছে। একটি যেমন হবে, অপরটিও তেমনি হবে। দ্বিতীয়টি যেমন হয়, তৃতীয়টিও তেমন হয়। এই সত্যকে আমাদের ভুললে চলবে না যে এই সূক্ষ্ম জগতে আমাদের চিত্ত যেমনভাবে নির্মিত হয়, যেমন আমাদের ভাবকর্ম হয়, ঠিক তেমন হয় আমাদের আণবিক কর্ম। আত্মা কখনও অণুকে আকর্ষণ করে না, কারণ আত্মার কাছে অণু-আকর্ষণের কোন শক্তি নেই। তবে, আত্মার কাছে একটি মাধ্যম আছে, যার সাহায্যে তা অণুকে আকর্ষণ করতে পারে। ঐ মাধ্যম হল ভাবকর্ম বা আস্রব। পাঁচ রকমের ভাবকর্ম বা আস্রব আছে—মিথ্যাত্ব, অবিরত, প্রমাদ, কষায় এবং যোগ। এই পাঁচটি শক্তিই অণুকে আকর্ষণ করে। এই হল আমাদের পাঁচটি চিত্ত। একটি মিথ্যাত্বের, একটি অবিরতির, একটি প্রমাদের, একটি কষায়ের এবং একটি যোগের চিত্ত। এই পাঁচ চিত্তের নির্মাণ যেমন হয়, তেমনি সময় সময় এই চিত্তও মন্দ বা তীব্র হয়। এই চিত্ত যেমনভাবে নির্মিত হয়, ঐ প্রকারেরই দ্রব্যচিত্ত ও আণবিক চিত্তের নির্মাণ চলতে থাকে এবং সম্বন্ধ রচিত হতে থাকে।

আস্রব ছাড়া কর্মের আকর্ষণ হয় না। আবার, ঐগুলি ছাড়া কর্মের এক বিশেষ গঠনমূলক রূপও তৈরি হয় না। আমরা অণু-গুলিকে আকর্ষণ করে তাদের এক বিশেষ রূপ দিই, একটা বিশেষ ছাঁচে গড়ে তুলি। এই দুই কাজ ভাবচিত্ত বা ভাবকর্ম ছাড়া সম্পাদিত হয় না, এ জন্যই আমরা কর্ম সম্বন্ধে খুব বেশি চিন্তিত হই না, কিন্তু ভাবচিত্ত সম্বন্ধে বেশি চিন্তিত হই, ভাবকর্মের ওপরে মন-যোগ আরোপ করি। রাগ-দ্বেষের প্রতিটি মুহূর্ত হল কর্ম-আকর্ষণ বা কর্ম-বন্ধের মুহূর্ত। সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যখন বিচার করি, তখন কর্মের প্রভূত আকর্ষণ হচ্ছে কি হচ্ছে না. তা নিয়ে চিন্তিত হবার কারণ নেই। কিন্তু রাগ-দ্বেষের যে মুহূর্তটি কর্মকে

আকর্ষণ করে, সেই ক্ষণটিতে জাগরূক থাকা প্রয়োজন। আমরা বহুবার বলে থাকি—জাগরূক থাকুন, অপ্রমত্ত থাকুন। প্রশ্ন উঠবে, কিসের প্রতি জাগরূক থাকব? কিসের প্রতি অপ্রমত্ত থাকব? রাগ-দ্বেষ যে মুহূর্তে উৎপন্ন হয়, সেই মুহূর্তে আমাদের জাগরূক থাকতে হবে। রাগ-দ্বেষের মুহূর্ত হল হিংসার মুহূর্ত, অমূর্তের মুহূর্ত, চৌর্যের ক্ষণ, ব্রহ্মচর্যহীনতার মুহূর্ত, পরিগ্রহের মুহূর্ত। যতগুলি দোষ আছে, প্রতিটির মুহূর্ত হল রাগ-দ্বেষের মুহূর্ত। রাগ-দ্বেষের ক্ষণ হল সমস্ত বর্গণাকে আকর্ষণের মুহূর্ত। এজন্যই সাধন-ক্ষেত্রে জাগরূকতার অর্থ হল, সেই রাগ-দ্বেষের ক্ষণটির প্রতি জাগরূক থাকা, যে মুহূর্তে তা কর্মকে আকর্ষণ করে এবং অনেকগুলি আচরণের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়। ঐ ক্ষণটিতেই আমাদের জাগরূক থাকতে হবে, তটস্থ থাকতে হবে, সামায়িক যাতে করতে পারি তার ব্যবস্থা করতে হবে।

জাগরূকতার অর্থ

নিদ্রাহীনতাই জাগরূকতার অর্থ নয়। যদি তাই হতো তাহলে যে শ্রমিক দিনে আট-দশ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করে সে পূর্ণ জাগরূক রয়েছে বলা যায়। কখন সে ঘুমোয়? বেচারি তো ঘুমোবার সময়ই পায় না। তাকে পুরোপুরি জাগ্রত বলা যায়, পরিপূর্ণ জাগরূকতার সঙ্গে সে নিজের কাজে লেগে থাকে। কিন্তু সাধনার দৃষ্টিতে জাগরূক থাকার অর্থ হল, কোন সময়েই রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হতে না দেওয়া।

রাগ-দ্বেষ-হীনতার মুহূর্তই হল তটস্থতার মুহূর্ত। ঐ ক্ষণই হল ধ্যানের সময়। এর বাইরে ধ্যান হয় না। প্রাণায়াম বা প্রেক্ষা করলাম, শরীর বা পদার্থকে দেখলাম, অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখলাম বা চোখ বন্ধ করে সাধনা করলাম—এটাই ধ্যান নয়। এ তো কেবলমাত্র ধ্যানের অবলম্বন। ধ্যান হল সেই জিনিস যাতে রাগ বা দ্বেষের কোন মুহূর্তই আসবে না। রাগ-দ্বেষের ক্ষণ না আসাই হল যথার্থ ধ্যান। নইলে যাবতীয় ক্রিয়া হল বাহ্য ক্রিয়া, কেবল শারীরিক নিষ্প্রাণ ক্রিয়া। ধ্যানের দ্বারা যা হয়, এর মাধ্যমে ঐ অর্থ সিদ্ধ হয়

না। ক্রিয়াগুলিকে তা অনেকটা এগিয়ে দেয়, তখন প্রামাণিক ক্রিয়া তৈরি হয়। তখন প্রাণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম বা প্রাণশক্তির খানিকটা চমৎকারিত্ব দেখাতে সক্ষম বিষয়ে সিদ্ধ হয়। যে চমৎকারিত্ব প্রচলিত, তা যাবতীয় প্রাণশক্তির আশ্চর্যজনক ক্ষমতা, তাকে বলা হয় 'প্রাণিক চমৎকার'। কিন্তু যে ক্রিয়াগুলির দ্বারা মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন হওয়া দরকার, আবেগ ও আবেশের পরিবর্তন ঘটানো যায়, যার সাহায্যে ক্রোধ-মন-মান-লোভ-হাস্য-রতি-অরতি-ঘৃণার পরিবর্তন ঘটানো যায়, তাও সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। রাগ-দ্বেষের মুহূর্তে যদি আমরা জাগরূক থাকতে না পারি তাহলে ঐ ধ্যানের দ্বারা কিছুই হবে না। ভাবকর্মের সময়ে জাগরূক না থাকলে আগত ঐ আণবিক কর্মগুলিকে আটকানো যায় না। আবার ঐ গুলিকে আটকানো না গেলে ঐ আগত কর্মও নিজের প্রভাব বিস্তার না করে থাকতে পারে না, নিমিত্ত না হয়ে থাকতে পারবে না। যদি নিমিত্ত তৈরি হয় তাহলে রাগ-দ্বেষ চক্রের চলাও বন্ধ হবে না।

ভাবকর্ম, দ্রব্যকর্ম

ভাবকর্ম দ্রব্যকর্মকে প্রভাবিত করে এবং দ্রব্যকর্ম (আণবিক কর্ম) ভাবকর্মকে প্রভাবিত করে। দুয়ের মধ্যে এমন এক সন্ধি রয়েছে যে একে অন্যকে সহযোগিতা করে। একে অন্যকে জীবনীশক্তি দেয়। দুয়ের মধ্যে এক সুন্দর সমঝোতা আছে। ভাবকর্ম দ্রব্য-কর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং দ্রব্য-কর্ম ভাবকর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সাধনায় যা করতে হবে তা হল, যেন-তেন-প্রকারেণ ঐ দুয়ের সন্ধিকে ছিন্নভিন্ন করতে হবে, বাঁধন ভাঙ্গতে হবে। আমরা দুয়ের মধ্যে এমন এক বিভেদ সৃষ্টি করব যাতে ভাবকর্ম এক দিকে যায়, দ্রব্য-কর্ম যায় আর এক দিকে। এমন ভেদবৃত্তি উভয়ের মধ্যে জাগাতে হবে, যাতে অনাদিকাল থেকে চলে আসা উভয়ের সন্ধি পৃথকীকৃত হয়, ছিন্ন হয়। বাঁধটির মধ্যে এমন একটি ছিদ্রের সৃষ্টি করতে হবে যাতে বাঁধের জল বেরিয়ে যায়, বাঁধ সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়।

সাধনার এই মর্ম যদি আমরা বুঝি তাহলে এই প্রক্রিয়ার অনুশীলন আমাদের করতেই হবে। এটাও ঠিক, কর্মের মর্ম অনুধাবন ভিন্ন সাধনার মর্ম বোঝা যায় না। এখন আমরা কর্মের চর্চা করছি। সাধনা-ক্ষেত্রে কর্মের আলোচনার প্রয়োজন কি, তা কিছু কিছু সাধকের মনে আশ্চর্যের উদ্রেক করতে পারে। তাঁদের মনে ঐ প্রশ্ন উঠতে পারে। আমি বলি, কর্মের রহস্যকে বুঝতে না পারলে সাধনার রহস্যকেও বোঝা যাবে না। সাধনা কেবল আকাশে ভাসমান বস্তু নয়। সাধনা হল গভীরে যাবার প্রবৃত্তি, যেখানে গিয়ে আমরা নিজেদের অস্তিত্বকে চিনতে পারি, তাকে আটকাতে পারি! তাই মূল স্রোতটিকে ধরা আমাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন। কর্মই হল মূল স্রোত, কিন্তু কর্মেরও মূল স্রোত হল ভাবকর্ম। ভাবকর্মকে না বুঝলে সাধনার কোন কথাই আমরা বুঝতে পারব না।

ভাবকর্মের দ্বারা দ্রব্যকর্মের আকর্ষণ হয়। ভাবকর্ম হল জৈবিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া। জীবের মধ্যে সংঘটিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া। ভাবকর্ম হল জৈবিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া। দ্রব্যকর্ম হল সূক্ষ্ম শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়া। একটি হল জৈবিক, অপরটি হল আণবিক। দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। উভয় প্রক্রিয়া একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরা একে অন্যকে প্রভাবিত করে। জৈবিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যোগ রয়েছে। সূক্ষ্ম শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে রয়েছে জৈবিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যোগ। এজন্যই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যদি উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ না থাকত তাহলে এরা একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারত না।

মানুষের ওপরে চাঁদের প্রভাব

চাঁদ মানুষকে প্রভাবিত করে। এর বৈজ্ঞানিক কারণ হিসেবে জানা আছে, মানুষের শরীরের মধ্যে শতকরা আশি ভাগ রয়েছে জল। চাঁদ জলীয়, তাই জলের সঙ্গে চাঁদের সম্বন্ধ আছে। চাঁদের জন্য তিথি-

পরিবর্তন যেমন হয়, ঠিক তেমনিভাবে জোয়ার-ভাঁটার ক্রমপর্যায় চলতে থাকে। এর থেকেও বোঝা যায় যে, চাঁদের সঙ্গে জলের সম্বন্ধ আছে। মানুষের মনকেও তাই চাঁদ প্রভাবিত করে। জ্যোতিষীরা ঠিকই বলেন, মনের অধিপতি হল চন্দ্র। চাঁদ মানুষের মনকে প্রভাবিত করে। যাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই, তারা একে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে না। আজ যে প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো, হয়েছে, তার মাধ্যমে অনেক নতুন তথ্য উদঘাটিত হয়েছে।

বিকিরণের প্রভাব

ককেশাস হল রাশিয়ার একটি অংশ। ওখানের এক বৈজ্ঞানিক বলেছেন, ককেশাসে যে ভূকম্পন হয় তার সঙ্গে সৌর-বিকিরণের সম্পর্ক আছে। সৌর-বিকিরণের সঠিক সময়টি যেই আসে, অমনি ককেশাসে ভূকম্পন শুরু হয়ে যায়। সূর্যে যখন বিস্ফোরণ ঘটে, তারই পরিণতি হিসেবে ভূকম্পন ঘটতে শুরু করে। এই বিরাট সংসার হল সংক্রমণের সংসার। একটি দ্রব্য অপর দ্রব্যে সংক্রামিত হয়। জগতের কোন জিনিসই অসংক্রামিত বা অপ্রভাবিত নয়। আমরা সবাই যে কত সংক্রমণে আক্রান্ত এবং কত তত্ত্বে প্রভাবিত, তার কোন সীমা নেই। আমরা সকলেই প্রভাব-ক্ষেত্রে রয়েছি। বন্ধনযুক্ত প্রতিটি আত্মা, কর্মযুক্ত প্রতিটি আত্মা রয়েছে প্রভাবক্ষেত্রে। প্রভাবক্ষেত্র থেকে এগুলি মুক্ত হতে পারে না। প্রভাবক্ষেত্রে স্থিত কোন ব্যক্তিই বাইরের প্রভাব থেকে, সংক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। সৌরমণ্ডল থেকে পৃথিবীতে এত বেশি বিকিরণ আসে যে আমরা তা চিন্তাও করতে পারি না। এটাই হল সমস্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আধার। মঙ্গল থেকে বিকিরণ হয়, চন্দ্রের বিকিরণ আছে, বুধের বিকিরণ আছে। যত গ্রহ আছে, যত নক্ষত্র, সকলেরই বিকিরণ আসে এবং আমরা সবাই তা দ্বারা প্রভাবিত হই। বিকিরণের প্রসঙ্গটি না থাকলে জ্যোতিষশাস্ত্রের আধারই সমাপ্ত হয়ে যেত। জ্যোতিষশাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক নয়। তবে, এমন হতে পারে

যে, কেউ হয়ত ফলাফল ঠিকমত বলতে পারলেন না। সেটা গণনাকারীর অপূর্ণতা। কিন্তু তা জ্যোতিষশাস্ত্রের অবৈজ্ঞানিকতা প্রমাণ করে না। জ্যোতিষশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিকতায় কোন সন্দেহ নেই, কারণ গ্রহের বিকিরণের স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ব্যবহারিক ভুল

এক ব্যক্তির কথা বলি। তিনি জ্যোতিষিবিদ্যা জানতেন। একবার তিনি রাজপরিষদে হাজির হলেন এবং নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—আমি রমণবিদ্যা জানি। ভূত-ভবিষ্যৎ সব কিছু বলতে পারি। রাজা এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর নিজের হাতের মুঠো বন্ধ করে বললেন—আচ্ছা. ঠিক আছে, বল তো দেখি, আমার এই মুঠির মধ্যে কি আছে? ব্যক্তিটি নিজের অঙ্ক কষল, একাগ্রচিত্ত হল। চিন্তায় ধরা পড়ল, মুঠির ভেতরে যা আছে তার একটি শুঁড় আছে, চারটি পা এবং তার গায়ের রং কালো। সে বলল—রাজন্! আপনার মুঠোর মধ্যে হাতি আছে। পরিষদরা সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। হাতের মুঠোর ভেতরে হাতি!

জ্যোতিষির হিসেবে কোন ক্রটি ছিল না। মুঠোর মধ্যে যে জিনিসটি ছিল, তার একটি শুঁড়, চারটি পা এবং রং কালো ছিল। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু একটা কথা সে ভুলে গিয়েছিল, মুঠোর ভেতরে হাতি কিভাবে থাকতে পারে? সে ভুলে গিয়েছিল, কোন্ জিনিস কোথায়, কোন্ অবস্থায় থাকে। ব্যবহারিক জ্ঞান ভুলে গিয়েছিল সে।

আসলে রাজার মুঠোয় ছিল মাছি। মাছির শুঁড় আছে, পা চারটি, রংও কালো। কিন্তু লোকটি মাছির কথা ভুলে গিয়েছিল। সে তাই হাতির কথাই বলল। শুঁড় প্রভৃতির দৃষ্টিতে বিচার করলে হাতি এবং মাছি দুই-ই সমান, কিন্তু হাতের মুঠোয় প্রবেশ করার দৃষ্টিতে বিচার করলে দুয়ের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। মাছিকে হাতের মুঠোয় প্রবেশ করাতে পারা যায় কিন্তু হাতিকে তা পারা যায় না। ভুল এখানেই হয়।

যেখানে বিকিরণের বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে, যেখানে মানুষের ওপর বিকিরণের প্রভাবের প্রশ্ন ওঠে, যেখানে ঐ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না।

প্রভাবক্ষেত্রই হল বন্ধন

প্রভাবের পৃথিবীতে আমরা বেঁচে আছি। আমরা প্রভাবিত হই। দ্রব্যকর্ম আমাদের প্রভাবিত করে, আত্মাকে প্রভাবিত করে এবং আত্মাও তাকে প্রভাবিত করে। দুয়েরই এই প্রভাবক্ষেত্র তৈরি হয়। এই প্রভাবক্ষেত্রেই ঐ যাবতীয় কাজ চলতে থাকে। এই প্রভাবক্ষেত্রের নামই হল বন্ধন। এর অর্থ হল, আত্মা এবং কর্মের প্রভাবক্ষেত্র। একটি রচনা তৈরি হল। এখন প্রশ্ন উঠবে, কিভাবে এমন হয়? কোথা থেকে এসব আসে?

একথা সত্যি যে, এসব আসে বাইরে থেকে। অনেক দূর থেকে নয়। সারা আকাশমণ্ডলে কর্মের বর্গণুলি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই বিরাট কর্ম-বর্গণা থেকে এক সূঁচপরিমাণ স্থানও মুক্ত নয়। সারা আকাশ এতে ভরে আছে। এখানেই রয়েছি আমরা। যে ধরনের ভাবচিত্ত আমরা তৈরি করি, আমাদের রাগাত্মক-দ্বেষাত্মক অনুভূতিগুলি যে রকম, আমরা সেখানেই বসে বসে নিজেদের আশেপাশের আকাশমণ্ডল থেকে ঐ অণুগুলিকে টেনে নিই। এই আকর্ষণের পর অণুগুলি আসে আমাদের প্রভাবক্ষেত্রে। একটু আগে যা আকাশে ব্যাপ্ত ছিল, সেগুলি আমাদের প্রভাবক্ষেত্রে চলে আসে, আমাদের সম্বন্ধ-স্থাপনের স্থিতিতে এসে যায়। এদের সঙ্গে আগে আমাদের কোন সম্বন্ধই ছিল না। অণুগুলি ছিল অণুগুলির জায়গায়, আমরা ছিলাম আমাদের জায়গায়, আত্মা ছিল আত্মার জায়গায়। কিন্তু যেই ভাবচিত্ত তৈরি হল, আশেপাশের অণুগুলি আকর্ষিত হল বা তাদের আকর্ষণ করা হল, অমনি ঐ অণুগুলি আমাদের আস্রব দ্বারা, ভাবকর্ম দ্বারা, ভাবচিত্ত দ্বারা

আকর্ষিত হয়ে আমাদের প্রভাবক্ষেত্রে চলে আসে। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এরই নাম হল বন্ধন।

বন্ধনের সম্পূর্ণ রাসায়নিক রচনার প্রসঙ্গটিও আমাদের বুঝতে হবে। যে মুহূর্তে অণুগুলি আমাদের প্রভাবক্ষেত্রে আসে, অমনি তাদের এক বিশিষ্ট সংগঠন তৈরি হয়। এদের আলোচনাই আমাদের আগে করতে হবে।

১১.

কর্মের রাসায়নিক প্রক্রিয়া (২)

- কে কর্মফল-দাতা ?
- কোন নিয়ন্তা আছে কি ?
- প্রবৃত্তির চারটি কোণ—শমন, বিলয়ন, মার্গান্তরীকরণ এবং উদাত্তীকরণ।
- সাধনার মার্গ হল—উদাত্তীকরণ বা মার্গান্তরীকরণ।

ব্যক্তিত্বের দুটি সূত্র

আমাদের ব্যক্তিত্বের দুটি ভাগ আছে। একটি হল, অন্তঃস্থ চেতনা এবং অপরটি হল, বহিঃস্থ চেতনা। একটি সূক্ষ্ম এবং অপরটি স্থূল। একটি হল অন্তর্বৃত্তি এবং অপরটি হল, বহির্বৃত্তি। প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এই দুই ভাগে বিভক্ত। মানুষ বাইরের জগতে যা কিছু করে, তাতে তার অন্তঃকরণ প্রভাবিত হয়, সূক্ষ্ম জগৎ প্রভাবিত হয়। এবং সূক্ষ্ম জগতে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়, তাতে তার স্থূল জগৎ প্রভাবিত হয়, বাইরের আচরণ প্রভাবিত হয়।

আমরা যখন একটি আঙুলও নাড়াই, তা হল স্থূল জগতের ঘটনা, কিন্তু এতে আমাদের সূক্ষ্ম জগৎও আন্দোলিত হয়। সূক্ষ্ম জগতে যা কিছু পরিবর্তন হয়, তার প্রতিবিম্ব বা প্রভাব স্থূল জগতের ওপর পড়ে। তা আসে আমাদের বাইরের বাতাবরণে বা শারীরিক পরিবেশে। এজন্যই ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করতে হলে দু দিককে বোঝা খুবই প্রয়োজন।

যার কর্মক্ষমতা আছে তা-ই কর্ম

প্রাণী যে কর্ম-পরমাণুগুলিকে স্বীকার করে, গ্রহণ করে এবং নিজের সাথে সম্বন্ধ রচনা করে, সেগুলি কর্ম-পরমাণুযুক্ত হয়ে যায়। গ্রহণের সময় এর একটি ব্যবস্থা হয়। প্রথমদিকে এর কোন ব্যবস্থা থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রাণীর দ্বারা পরমাণু স্বীকৃত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বলা হয় কর্ম-প্রযুক্ত পরমাণু। ঐ পরমাণু-গুলির মধ্যে কর্মরূপে পরিবর্তিত হবার যোগ্যতা থাকে বটে, কিন্তু তখন পর্যন্ত তারা কর্ম হয় না। পরমাণুগুলি যখন আকাশ-মণ্ডলে ছড়িয়ে থাকে, তখন সেগুলি পরমাণুমাত্র—কর্ম নয়। কিন্তু কর্মে পরিণত হবার যোগ্যতা তার আছে। একটা কথা মনে রাখবেন, প্রতিটি পরমাণুই কর্মে পরিণত হয় না। যে পরমাণুগুলির কর্মে পরিণত হবার যোগ্যতা আছে কেবলমাত্র তারাই কর্মে পরিণত হয়।

কর্মের চার অবস্থা

পরমাণু বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন, হাইড্রোজেন পরমাণু, অক্সিজেন পরমাণু, নাইট্রোজেন পরমাণু। অনেক গ্যাস আছে। তাদের পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন রকমের। তাদের নিজের নিজের ক্ষমতা আছে। যেগুলি কর্ম-বর্গনা, যেসব পরমাণু কর্মের রূপে পরিবর্তিত হতে পার, তাদেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পরমাণুদের বহু বর্গ আছে, বহু বর্গনা আছে, বহু সমূহ আছে। তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এমন এক অণু বর্গনা, আছে, যে কর্ম রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। ঐ বর্গনা আমাদের প্রবৃত্তি ও চঞ্চলতা কর্তৃক আকৃষ্ট হয়। আকৃষ্ট হল এবং আকর্ষণের মুহূর্তেই তার প্রণালীবদ্ধতা শুরু হয়ে যায়। আগে কোনই ব্যবস্থা হয় না। ঐ অবস্থায় একটি বিভাজন সম্পন্ন হয়। যে পরমাণুগুলি আসে, তাদের বিভাজন শুরু হয়ে যায় এবং স্বভাবও নির্মিত হতে শুরু করে, স্থির করে, কোন্ ধরনের পরমাণু কোন্ নির্দিষ্ট স্বভাবে কাজ করবে। প্রথমে দুটি

ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়—একটি হল, বিভাজন-ব্যবস্থা এবং অপরটি হল, স্বভাব-নির্মাণ-ব্যবস্থা, প্রকৃতি-ব্যবস্থা—অর্থাৎ তাদের প্রকৃতি কেমন হবে। তাদের কাজ কি হবে? কি করবে তারা? এর সঙ্গে আরও দুটি ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। একটি, অনুভাগ ব্যবস্থা বা ফল দেবার ক্ষমতা। ঐ পরমাণুগুলোর মধ্যে যে রসাণু বা রস-শক্তি থাকে, রসের যে পরিপাক হয় তারাই নির্ধারণ করে কোন্ ধরনের রসের সংবেদন হবে এবং তার প্রভাব কেমন হবে। এই হল অনুভাগ বা ফলদান করার শক্তি।

কর্তৃত্ব এবং ফলভোগের সংযুক্তি

বহুবার প্রশ্নটি ওঠে, কর্মের তো ফল পাওয়া যায়, কিন্তু কর্মফল দেয় কে? কর্মফলদাতাটি কে? বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নকে বিচার করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ফলদাতা একটি সত্তা আছে। মানুষ কাজ করে, কিন্তু সে স্বয়ং তার ফল ভোগ করতে চায় না। তাহলে নিয়ামক কেউ না কেউ অবশ্যই আছেন, কোন এক নিয়ন্তা নিশ্চয়ই আছেন যিনি ফল দান করেন। একথাও খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়, মানুষ নিজের কর্ম ফল ভোগ করতে চাইবে কেন? ভালো কাজের ফল সে অবশ্যই ভোগ করতে চাইবে, কিন্তু খারাপ কাজের ফল কিছুতেই সে ভোগ করতে চাইবে না। কখনই সুমতি তার হবে না যে, যে কাজটা সে খারাপ করেছে তার ফল সে ভোগ করতে চাইবে। এই পরিস্থিতিতে এই তর্ক ওঠাও স্বাভাবিক, ফলদাতা তাহলে কেউ না কেউ অবশ্যই আছেন। এর সমাধান স্থূল ব্যবস্থার আধারে এভাবে করা হয় যে, কোন অপরাধীই নিজের অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে চায় না। বিচারক বা শাসনকর্তা তাকে দণ্ড দেন, তার দণ্ডদানের ব্যবস্থা করেন। অপরাধের দণ্ড দেবার জন্য যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি থাকেন, এই বিশ্বের বিরাট ব্যবস্থার জন্য কোন নিয়ামক বা নিয়ন্তা যদি না থাকেন, কোন শাসন-কর্তা না থাকেন, তাহলে শাস্তি-দানের ব্যবস্থা চলে কিভাবে? এই

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথাও বলা যায়, ফলদাতা কেউ না কেউ অবশ্যই আছেন এবং সেটাও এমন কিছু অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কিন্তু এই তর্কের যখন মীমাংসা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে করলে নতুন কিছু কিছু তর্ক চলে আসে। নতুন কিছু প্রশ্ন ওঠে। এসব প্রশ্ন জটিলতা-সৃষ্টিকারী প্রশ্ন।

সর্বশক্তি-সম্পন্নতার প্রশ্ন

যদি কোন নিয়ন্তা, নিয়ামক, প্রশাসক বা ফলদাতা থাকেন, তাহলে ফল দেবার প্রসঙ্গটি চলে আসবে দ্বিতীয় নম্বরে। প্রথমেই যে কথাটি আসবে তা হল, তাহলে কর্তৃত্বকারী কোন ব্যক্তিও অবশ্যই আছেন। কর্তৃত্ব এবং তার ফল ভোগ—পরস্পর অঙ্গাঙ্গী-জড়িত প্রশ্ন। কেউ যদি আমাদের দিয়ে কাজ করান, তাহলে ফল ভোগ করার কেউ না কেউ অবশ্যই আছেন। কাজ সম্পন্ন করানোর যদি কেউ থাকেন তাহলে একটা দিক সামনে আসবে: তিনি নিশ্চয়ই এমন বিরাট এক সত্তা হবেন যিনি এই বিরাট জগতে সব কিছু করান, করাতে পারেন, তিনি সব কাজ সম্পন্ন করানোর ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু তিনি এমন কাজ কেন করান যাতে প্রাণীদের অশুভ ফল ভোগ করতে হয়? মানুষের দ্বারা কেন অপ্রিয় ব্যবহার সম্পন্ন হবে? কেন তাকে অপ্রিয় ফল ভোগ করতে হবে? এ এক অতি জটিল প্রশ্ন। অপরকে জটিলতায় ফেলে দিতে পারে এই প্রশ্ন। যদি ফলভোগের ব্যাপারটিকে আমরা মেনে নিই তাহলে বলতে হয়, এমন একটি শক্তি-শালী সত্তা আছে যা ফলভোগের মাধ্যম হয়ে ওঠে। যদি সেখানে ন্যায় অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তাকে শক্তি-সম্পন্ন সত্তা বলে সম্বোধিত করতে মন চায় না। কারণ এত অসঙ্গতি, অভাব ও অতিভাবের কারণে সৃষ্ট বিপদ, অন্যায়, অত্যাচার, ক্রূরতা, প্রতারণা প্রভৃতিকে যদি কোন কর্তৃত্ব সত্তার সঙ্গে জোড়া যায় এবং ঐ শক্তিসম্পন্ন সত্তার কারণে ঐসব ঘটনা যদি সংঘটিত হয় তাহলে ঐ সত্তাকে আমরা কিভাবে পরম সত্তা বলতে পারি?

প্রতিটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই চায়, ঐ রাজ্যের শাসনব্যবস্থা যেন শ্রেষ্ঠ হয়, যেন সেখানে শোষণ ও অত্যাচার না থাকে। এই উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থাও তারা করতে চায়, কিন্তু পারে না কারণ ঐরকম সর্বশক্তিসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। তাই এটা তার সাধ্যের বাইরে। তারা কেবলমাত্র চেষ্টা করে যাতে অব্যবস্থার সৃষ্টি না হয়। সেরা সরকারের লক্ষণ হল, তার প্রশাসনের দ্বারা অপরাধের সংখ্যা কম হয়, খারাপ কাজও কম হয় এবং একজন মানুষের প্রতি অন্য মানুষের অন্যায় ও ক্রূরতাসম্পন্ন আচরণ কম হয়। সর্বশক্তিসম্পন্ন না হয়েও তাঁরা এই ধরনের ব্যবস্থা করে থাকেন। যদি তা সর্বশক্তিসম্পন্ন সত্তা হয়, সব কিছু করতে সমর্থ থাকে অথচ এমন ব্যবস্থা না করে তাহলে ঐ সরকারেরর শাসনকালে ঐ সাম্রাজ্যে, ঐ বিরাট সাম্রাজ্যে অপরাধটি চলে, অন্যায় ও ক্ররতা অনুষ্ঠিত হয়, শোষণ-দমন চলে, এমন সব কাজ সম্পন্ন হয় যা মানবীয় সত্তাকে নিপীড়িত করে এবং তা রীতিমত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাদশাহ বীরবলকে প্রশ্ন করলেন, 'বল তো, আমার এবং ঈশ্বরের মধ্যে প্রভেদ কি ?' বীরবল বললেন—'জাঁহাপনা ! তফাৎ অনেক। আপনি যখন আমার ওপরে বিরূপ হন তখন আমাকে আপনি নিজের সাম্রাজ্য থেকে বাইরে বের করে দেন, দেশ থেকে নির্বাসিত করেন। কিন্তু ঈশ্বর হলেন এমন একজন যিনি নিজের দেশ থেকে কাউকেই নির্বাসিত করেন না।' ঈশ্বর যদি দেশ থেকে কাউকে তাড়িয়ে দেন তাহলে সে যাবে কোথায় ? আমরা একথা মেনে নিয়েছি, ঈশ্বরের সত্তা সর্বব্যাপী। এই পৃথিবীতে এমন একটি কণাও নেই যেখানে ঈশ্বরের সত্তা নেই। তাই তাঁর দেশ থেকে যদি উনি কাউকে তাড়িয়ে দেন তাহলে সে বেচারা যাবে কোথায় ?

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের বলেছিলেন, 'আমার রাজ্য থেকে চলে যাও।' যুধিষ্ঠির এসে বললেন, 'প্রভু ! আপনি আর যে কোন আদেশ দেবেন তা আমি সহাস্যে মেনে নেব, কিন্তু আপনার রাজ্য থেকে

চলে যাওয়ার ব্যাপারটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? আপনার রাজ্য তো সর্বব্যাপী। আপনিই এবার আমাকে বলুন, আমি যাব কোথায়? আপনিই আমাদের স্থান নির্দেশ করে দিন।' যুধিষ্ঠির অনেক অনুরোধ করলেন। তখন কৃষ্ণ বললেন, 'দক্ষিণে চলে যাও। পাণ্ডু মথুরায় গিয়ে বসবাস কর। কৃষ্ণ স্থান নির্দেশ করলেন। ওঁরা উত্তর থেকে দক্ষিণে এলেন।

এসব তবু সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু, রাজ্য থেকে চলে যাওয়া—তা কিভাবে সম্ভব হতো? বাসুদেব কৃষ্ণের রাজ্য ছিল বড়—পৃথিবীর সর্বত্র। তাহলে মানুষ কোথায় যাবে?

সঞ্চালিত ব্যবস্থা

ঐশ্বরিক সত্তার প্রশ্নটিও খুব বড়। এই সত্তায় যদি ঐ সব চলতে থাকে, যা মানবীয় সত্তায় চলে, তাহলে সর্বশক্তি-সম্পন্নতার কথা অ-যথার্থ হয়ে পড়ে। এই প্রশ্নের সমাধানও খুব জটিল। এমন কথা বলব না যে, এই প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা কখনই করা হয় নি। চেষ্টা করা হয়েছে। একটা সমাধানও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সমাধানও অ-সমাধানে পর্যবসিত হয়েছে। প্রশ্নটিকে সমাহিত করার জন্য যে সমাধান দেওয়া হয়েছে. সেগুলিও অনেক নতুন নতুন প্রশ্ন তুলেছে। তাই তা বাস্তবে সমাধানকারী হতে পারে নি! প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেছে। চিকিৎসকের উদ্দেশ্য হল রোগীকে সুস্থ করে তোলা। কিন্তু তিনি যদি তার বদলে রোগীকে আরও রোগগ্রস্ত করে তোলেন, তাহলে আমরা তাঁকে খুব সম্মান দিতে পারি না। যদি মানুষের রোগ-সৃষ্টিকার কোন বিরাট শক্তির অস্তিত্ব থাকে তাহলে তা বোধগম্য মনে হয় না। কর্তৃত্বের প্রসঙ্গের সঙ্গে যখন ফলদানের ব্যাপারটি সংযুক্ত হয়, তখন নতুন চিন্তার একটি মাত্রা খুলতে পারে। নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এমনও হতে পারে, সেখানে কর্তৃত্ব অপর কারও হাতে থাকবে না, ফল দেবার শক্তিও থাকবে না।

শরীরের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মনযোগ দিতে হবে। আমাদের শরীরে উভয় ধরনের ব্যবস্থাই আছে। শরীরের কিছু কিছু অংশ সঞ্চালিত হয় নাড়ি সংস্থান দ্বারা। আমাদের শরীরের অনেক কাজই এর দ্বারা সঞ্চালিত হয়। আমি হাত নাড়াচ্ছি। এটি স্বাভাবিক ক্রিয়া নয়, স্বতঃ-সঞ্চালিত ক্রিয়া নয়—বরং নাড়িগুলিতে উত্তেজনা সৃষ্টির পর সম্পন্ন এক ক্রিয়া। আমি শ্বাস গ্রহণ করছি। এই কাজ কারুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এটি হল স্বতঃ-সঞ্চালিত ক্রিয়া। আমাদের অনেক ক্রিয়া স্বতঃ- সঞ্চালিত, আবার অনেক কাজ প্রেরণাজনিত। উভয় ধরনের কাজই আমাদের শরীরে সম্পাদিত হচ্ছে। আমরা ভোজন করি। ভোজনের পরেই ঐ কাজ থেকে নিবৃত্ত হই। পরের কাজগুলি শরীরে আপনা থেকেই হতে থাকে, স্বতঃ-সঞ্চালিত হয়। আমরা খাই। খাওয়ার পর খাদ্যকে হজম করার উপযোগী রস নিজে থেকেই তার সঙ্গে মেশে। নিচে নামে। পাচন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। পরিশ্রুত হয়। রসের ক্রিয়া তৈরি হয়। রস তৈরি হয়। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সার পদার্থ যা ছিল তা ছড়িয়ে পড়ে। রক্ত তৈরি হয়। ক্রিয়াগুলি সঞ্চালিত হয়। আসার পদার্থগুলি বৃহদন্ত্রে চলে গেল। উৎসর্গ-ক্রিয়া সম্পন্ন হল। এসব কাজ আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়। আপনি কিছুই জানতে পারবেন না। আপনি তার জন্য কোন চেষ্টাও করেন নি। তবু ঐ কাজগুলি সম্পন্ন হয়। কখনও কি আপনি এ নিয়ে ভাবেন যে, ভোজনকৃত খাদ্যগুলিকে হজম করতে হবে, রস তৈরি করতে হবে, রক্ত-মাংস তৈরি করতে হবে? কখনও ভাবেন না, ভাবার কোন চেষ্টাও করেন না, অথচ কাজগুলি সম্পন্ন হয়। যেখানে যা হবার তা আপনা থেকেই হতে থাকে। যে শক্তি অর্জন করার তা অর্জিত হয়। যা শক্তিতে পরিবর্তিত হবার, তা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

পরিণাম : স্বতঃ-উদ্ভূত

এভাবেই আমরা কাজ করি। ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া হয়। ঐ প্রতিক্রিয়াস্বরূপই আমরা অণুগুলিকে আকর্ষণ করি। এটাও এক ধরনের আহার, আহরণ। আমাদের আহারের অর্থ বুঝতে হবে। কিন্তু সীমিত অর্থে তাকে যেন না নিই। মুখ দিয়ে আমরা যা খাই তাই কেবল আহার নয়। আমাদের শরীরের যে কোন কণার সাহায্যে, আমাদের শারীরিক চঞ্চলতার সাহায্যে যেসব অণু আকৃষ্ট হয়, সে সবই হল আহার। কর্ম-অণুকে গ্রহণও আহার। আমরা ওগুলিকে টানি, নিজের দিকে আকর্ষণ করি। ঐ অণু এসে আমাদের সঙ্গে মিলে যায়, আটকে যায়। আটকে যাবার পর ওর যে ব্যবস্থা হয়, তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়। এ হল আপনা থেকে সংঘটিত ব্যবস্থা। ঐ গৃহীত অণুগুলির বর্গীকরণও হয়। তার বিভাজনও হয়! তার স্বভাবও নির্মিত হয়, ঠিক যেমন ভোজনের মাধ্যমে খাদ্যরূপে গৃহীত নানা ধরনের পদার্থের স্বভাব নির্ণীত হয়। শরীরে যদি প্রোটিনের প্রয়েজেন থাকে তাহলে ভোজনে গৃহীত খাদ্যে যে প্রোটিনের অংশ থাকে তা ঐ প্রোটিনের অভাবকে পূরণ করে। চকচকে ভাবের প্রয়োজন পড়লে গৃহীত স্নেহপদার্থের দ্বারা তা পূর্ণ হয়। শ্বেতসারের প্রয়োজন পড়লে তা শ্বেতসারধর্মী দ্রব্য কর্তৃক পূর্ণ হয়। ভিটামিনের প্রয়োজন পড়লে তা ভোজনের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং নিজের কাজ শুরু করে দেয়। বহুবার এমন আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে, রোগ হয়েছে শরীরের কোন অংশে, পেটে পাঠানো হল ওষুধ এবং ঐ রোগাগ্রস্ত অংশ সুস্থ হয়ে উঠল। আঙ্গুলে ব্যথা হলে ওষুধ ঐ আঙ্গুলে গিয়ে কাজ করবে। ওখানে পৌঁছে যাবে। ছোট ট্যাবলেট খাওয়া হয়। মাথায় ব্যথা, আঙ্গুলে বাথা, পিঠে ব্যথা—যেখানেই ব্যথা হোক, ঐ ওষুধে কাজ হবে এবং অসুস্থ অঙ্গটি সুস্থ হয়ে উঠবে। প্রশ্ন উঠবে, ঐ ওষুধ অসুস্থ অঙ্গে কেন পৌঁছয়? অন্য অঙ্গে কেন পৌঁছয় না? চোখে ব্যথা হলে ওষুধ

আঙ্গুল পর্যন্ত পৌঁছয় না কেন? উত্তর হল, শরীরে স্বাভাবিক ব্যবস্থা রয়েছে। যে অঙ্গে যে তত্ত্বটি কম রয়েছে, পদার্থ সেই ঘাটতিকেই আগে পূরণ করবে। যে তত্ত্ব যেখানে কম থাকে, ঐ তত্ত্ব ঐ স্বভাবতই আকৃষ্ট হবে। ওটা ওখানেই যাবে। যে কোষগুলিতে, শরীরের যে অঙ্গগুলিতে প্রোটিন কম আছে, আমরা প্রোটিন ভাজন করলে ঐ প্রোটিন ঐ কোষে এবং ঐ অঙ্গগুলিতে আরও বেশি আকৃষ্ট হবে। কারণ শরীরে আকর্ষণের একটি ব্যবস্থা আছে। কেবল আমাদের শরীরেই নয়, সারা পৃথিবীতে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের এমন এক ব্যবস্থা আছে যে, নিজ নিজ অনুকূল পরিবেশের প্রতি, নিজ নিজ স্বজাতির প্রতি সকলেই একটা গতি প্রাপ্ত হয়। নিজ জাতিভুক্ত জিনিসগুলি তাকে টেনে নেয়।

আমাদের কর্ম পরমাণুগুলোরও ঐ ব্যবস্থা আছে। যে পরমাণু গৃহীত হয় তা নিজ নিজ জাতির পরমাণু কর্তৃক আকর্ষিত হয় এবং ঐ দিকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা নিজের কাজ করতে শুরু করে। এতে ফলের শক্তিলাভও ঘটে। পরমাণুগুলি ঐ ধরণের ফলদানে সমর্থ, ফল দানের ব্যবস্থা তাদের থাকে।

দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে চিকিৎসক বলেন, ভিটামিন 'এ' বেশি করে খাও। একথা তাহলে স্পষ্ট, দৃষ্টিশক্তিকে বাড়ানোর ক্ষমতা ভিটামিন 'এ'-র আছে। চর্মরোগ হলে চিকিৎসক ভিটামিন 'এ'-র প্রসঙ্গই উত্থাপন করেন না। তিনি বলেন—ভিটামিন 'ডি' খাও। ভিটামিন 'ডি'-এর যে ক্ষমতা আছে তা চর্মরোগকে নিবারণ করতে পারে। ভিটামিন 'এ' বা 'ডি'-র এই পরিণতির কোন নিয়ামক বা নিয়ন্তা নেই। ওষুধ খাবার পরে প্রয়োজনীয় পরিণতি সৃষ্টি চিকিৎসকের হাতে নেই। এই পরিণতি স্বতঃ-উদ্ভূত।

ফলদানের মন্দীভূত ও তীব্র ভাব

এই বিশ্বের প্রতিটি পদার্থের, প্রতিটি পরমাণুর নিজ নিজ এক বিশেষ সত্তা আছে। যে কর্ম পরমাণুগুলিকে আমরা আকর্ষণ করি,

তার মধ্যে ঐ সময় এক বিশেষ ধরনের ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। ঐ ক্ষমতার নাম রসানুভাব বা অনুভাগ বন্ধন। এর অর্থ হল, ফল দেবার ক্ষমতা বা ফলশক্তি। কর্মের সব পরমাণুর ফলদানের ক্ষমতা সমান ভাবে নির্ণীত হয় না। বরং তা হয় বিভিন্ন ধরনের। আমরা জানি, পৃথিবীর সব পদার্থ একই ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন হয় না। হোমিও-প্যাথিক ওষুধগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। এদের কিছু হল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, আবার কিছু নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন। কিছু কিছু ওষুধ এক লাখ পোটেন্সির হয়, আবার কিছু মাত্র ত্রিশ বা তারও কম পোটেন্সিসম্পন্ন। ক্ষমতা-নির্মাণে কত প্রভেদ হয় তা লক্ষ্য করুন।

গরুর দুধে স্নেহজাতীয় পদার্থ আছে, মহিষের দুধে আছে, আবার তিল বা সরষের তেলেও স্নেহপদার্থ আছে—কিন্তু স্নেহপদার্থের মাত্রায় অনেকটা তারতম্য আছে। মাত্রা সকলের ক্ষেত্রে এক নয়।

শক্তি এবং মাত্রার এই তারতম্য সৃষ্টি হয় পদার্থের বিশেষ গঠনের ওপর। একইভাবে কর্মের ফলদান-শক্তির তারতম্য আছে এবং এই তারতম্যই ঐ কর্ম-পরমাণুগুলি গঠনের কারণ হয়। আমাদের রাগ-দ্বেষের তীব্রতা এবং মন্দীভূত ভাবের আধারেই ঐ গঠন সম্পন্ন হয়।

যে মুহূর্তে আমরা কর্ম-পরমাণুগুলিকে আকর্ষণ করি, ঐ সময়টাতে যদি রাগ-দ্বেষ তীব্র হয় তাহলে ঐ কর্ম-পরমাণুর ফলদানশক্তিও হয় তীব্রতর। আবার, ঐ সময়ে যদি রাগ-দ্বেষ কম হয় তাহলে ফলদান-শক্তি হয় মন্দীভূত। তীব্রতা এবং মন্দীভূত ভাবের এই যে তারতম্য, এগুলি সবই হয় আমাদের আবেগ ও রাগ-দ্বেষের আধারে। এইজন্য সাধনার একটি বড় সূত্র হল, যা করবে তা অনাসক্তভাবে কর। আসক্তিকে তীব্রতর হতে দিও না। এর তাৎপর্য হল, আসক্তি যত তীব্র হবে, কর্মফল তত তীব্র হবে। আসক্তি যত কম হবে, কর্মের ফলও তত কম হবে। অনুভাবের তীব্রতা এবং মন্দীভূত ভাব আসক্তির তীব্রতা এবং মন্দীভূত ভাবের ওপর নির্ভরশীল।

প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি

একথা সত্যি, সাধক প্রবৃত্তিকে সর্বদা আটকাতে পারেন না। সাধকের পক্ষে প্রবৃত্তিগুলিকে আটকানোর প্রশ্নটিও বড় নয়। যিনি সাধনা করবেন, তাঁর পক্ষে খাওয়া, শ্বাস নেওয়া, কথা বলা, চিন্তা করাটা জরুরী। জীবন সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজ এবং প্রবৃত্তিও জরুরী। এগুলিকে আটকানো যায় না। কেউ যদি মৌনতা অবলম্বন করতে চান তাহলে তিনি এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা, একদিন, দশ দিন বা এক মাস পর্যন্ত তিনি মৌন থাকতে পারেন। বারো বছরও মৌন থাকা যায়। কিন্তু কোথে কথা বলতেই হবে। কথা না বললে কাজ চলবে কি করে? কথা বলাটা একটা স্বাভাবিক ব্যবস্থা। একে বাদ দেওয়া যায় না। চলাটাও একটা ব্যবস্থা। সেটাও স্বাভাবিক। সারা জীবন এক জায়গায় বসে থাকা যায় না। ধ্যানের সময় এক জায়গায় বসে থাকা যায়, কিন্তু সারা দিন বসে তো ধ্যান করা যায় না। কায়োৎসর্গের সময় কিছু সময় স্থির থাকা যায়। কিন্তু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে রকম করা সম্ভব নয়। প্রবৃত্তিকেও ত্যাগ করা যায় না। চিন্তাও একটি প্রবৃত্তি। তাকেও আটকানো যায় না। এটা ঠিক, ধ্যানের সময় আমরা নির্বিকল্প থাকতে পারি, নির্বিচার থাকতে পারি, একই বিচারে একাগ্র থাকতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য তেমন থাকা যায় না। চিন্তা ছাড়া কি কাজ চলতে পারে? পারে না। চিন্তা প্রয়োজন, গতি প্রয়োজন, কাজ প্রয়োজন। শরীর, মন ও বাক্যের প্রবৃত্তিকে বন্ধ করা যায় না।

আমরা যখন কর্মের কথা বলি, তখন সূক্ষ্ম জগৎ পর্যন্ত আমাদের পৌঁছনো দরকার। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—উভয়ের পেছনেই একটি তত্ত্ব রয়েছে। ঐ পর্যন্ত পৌঁছনোর অভ্যাস আমাদের করতে হবে। বাস্তবে এই হল সাধনা, সাধনার সার্থকতা।

সামায়িক ঃ উদাত্তীকরণের প্রক্রিয়া

প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি আসক্তি এবং অনাসক্তির সঙ্গে সংযুক্ত। প্রবৃত্তির প্রতি আসক্তি যাতে না থাকে বা কম হয়, তা অভ্যাস করতে হবে। প্রবৃত্তি থাকুক, কিন্তু তার পেছনে যেন আসক্তি ও রাগ-দ্বেষের ভাব কম হয়। প্রবৃত্তির সঙ্গে সমভাবের ধারা যেন জুড়ে যায়। প্রবৃত্তির ইচ্ছা করলেও ঐ প্রবৃত্তির পেছনে এক সতর্ক প্রহরীর সন্ধান পাওয়া যাবে, সে আপনাকে সতর্ক করতে থাকবে। প্রবৃত্তিতে যদি কোন দোষ আসতে শুরু করে, তখনই কানে এক ধ্বনি গুঞ্জন করে উঠবে ঃ সমভাব, তটস্থতা, সামায়িক, সমতা। তখন প্রবৃত্তিতে আগত দোষগুলি আপনা থেকেই নিচে চলে যাবে, দূরে সরে যাবে। প্রবৃত্তির দোষগুলিকে প্রক্ষালন করার জন্য, সেগুলিকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করার জন্য আমাদের যে বিষয়ের অভ্যাস করতে হয় সেটিই হল সমভাবের অভ্যাস, সমতার অভ্যাস, সামায়িকের অভ্যাস। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একেই মার্গান্তরীকরণ এবং উদাত্তীকরণ বলা হয়েছে।

প্রবৃত্তির চারটি কারণ

প্রবৃত্তির শমন, বিলয়ন, মার্গান্তরীকরণ এবং উদাত্তীকরণ হয়। এই হল চারটি কারণ। প্রথম কারণটি হল শমন। যে প্রবৃত্তি সমাজসম্মত নয়, ব্যক্তি তা করতে চায়, কিন্তু সামাজিক প্রাণী ঐ প্রবৃত্তিকে কার্যে পরিণত করে না, তাকে শাসন করে, ব্যক্তির নিজের ইচ্ছাতে বাধা দেয়। প্রতিটি ইচ্ছার পূর্তি সাধিত হয় না। কোন মানুষই নিজের সব ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারে না। কিছু ইচ্ছা পূর্ণ হয়, কিছুর অর্ধেক পরিপূর্ণ হয়, আবার কিছু বাদ দিতে হয়। রাস্তায় চলতে চলতে একটা সুন্দর বাড়ি দেখা গেল। ইচ্ছা হল, বাড়িটাকে দখল করে নিই। কিন্তু তা হবে কি করে? হবে না। কারণ সামাজিক অবস্থা ঐভাবে দখল করতে দেবে না। মনে লালসা হল,

এমন সুন্দর বাড়িতে থাকব, ওটা অধিকার করে নেব, কিন্তু তা হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় হল—প্রবৃত্তির বিলয়ন। বিলয়নও দমন করার প্রবৃত্তি। কিছু কিছু প্রবৃত্তি এমন হয় যেগুলি মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু আর একটি প্রবৃত্তি সামনে এসে গেল, অমনি সেটা দূর হয়ে গেল। এক প্রবৃত্তি অপরের মাঝে বিলীন হয়ে গেল, তার বিলয়ন ঘটল।

তৃতীয় হল—প্রবৃত্তির মার্গান্তরীকরণ। এর অর্থ হল, প্রবৃত্তির রাস্তাকে বদলে দেওয়া, তার দিক পরিবর্তন করা। ফ্রয়েডের ভাষায় মূল প্রবৃত্তি হল, কামশক্তি। ফ্রয়েডের যাবতীয় মনো-বিজ্ঞানে কেন্দ্রীয় শক্তি হল, কামশক্তি। তিনি বলেছেন, এর মার্গান্তরীকরণ করা সম্ভব। কোন এক ব্যক্তি একটি সুন্দর মহিলাকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হল, কিন্তু তাকে পেল না। ইচ্ছা যতই তীব্র হোক না কেন, তাকে পাওয়া যায় না। তখন সে মনের দিককে পরিবর্তিত করে। কেউ অভিনেতা হয়, কেউ চিত্রশিল্পী হয়, কেউ লেখক হয়, আবার কেউ কবি হয়। এক এক জন এক এক রকম হয়। মানসিক বিশ্লেষণ অনুসারে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি-চিত্রকর যাঁরা হয়েছেন, তাঁদের পেছনে রয়েছে মার্গান্তরীকরণের ব্যাপার।

চতুর্থ হল—প্রবৃত্তির উদাত্তীকরণ। কর্মশাস্ত্রের ভাষায় একে বলা হয়, ক্ষয়োপশম। এ হল মোহ, আসক্তি এবং রাগ-দ্বেষের দোষগুলিকে পরিশোধন ও পরিমার্জনের প্রক্রিয়া। জৈন আচার্যরা এজন্য দুটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন—প্রশস্ত রাগ এবং অপ্রশস্ত রাগ। রাগ ভাল নয়, খারাপ। কিন্তু ধর্মের প্রতি, গুরুর প্রতি, ইষ্টদেবের প্রতি যে রাগ, তা হল প্রশস্ত রাগ। জৈন আগামগুলিতে একটি বহুপ্রচলিত শব্দ আছে—'ধম্মানুরাগরত্তে'—ধর্মানুরাগরক্ত, অর্থাৎ ধর্মের প্রতি অনুরাগ থেকে সৃষ্ট রক্ত। এগুলি সবই হল প্রশস্ত

রাগ। এর তাৎপর্য হল, রাগের যে দোষ এবং তীব্রতা ছিল, তা পরিশোধিত করা হয়েছে। আসক্তির মাত্রাকে কম করা হয়েছে। মাত্রা এত কম করা হয়েছে যে, তা আর রাগ-দ্বেষমুক্ত থাকে নি— রাগের উদাত্তীকরণ ঘটেছে। উদাত্তীকরণের প্রক্রিয়া হল ক্ষয়োপশমের প্রক্রিয়া, এতে কর্মের কিছু দোষ সর্বদা ক্ষীণ করা হয় এবং কিছু দোষের উপশম ঘটানো হয়। এতে এক ধরনের শুদ্ধতার স্থিতি নির্মিত হয়। এরই নাম উদাত্তীকরণ—রাগ ও আসক্তির সংশোধন।

সাধনার মার্গঃ দমন নয়, উদাত্তীকরণ

দমনের ব্যাপারটা সাধনার কথা নয়। ইচ্ছাকে যদি দমনই করতে হয়, তাহলে সাধনার প্রসঙ্গই ব্যর্থ। এর জন্য সাধনা করার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি ব্যক্তিকেই কিছু না কিছু দমন করতে হয়। কোন ব্যক্তিই নিজের সব আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারে না। সামাজিক বন্ধনের দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। শাস্তির বিধান-ব্যবস্থার ক্ষেত্র, রাজনীতির ক্ষেত্র—এ সবই হল দমনের ক্ষেত্র। সর্বত্রই কিছু না কিছু বন্ধন থাকে। সমাজের বন্ধন, পরিবারের বন্ধন, রাজ্যের বন্ধন। সর্বত্রই বিধিনিষেধ রয়েছে। দমন করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই।

সাধনার প্রয়োজন হল মার্গান্তরীকরণ, উদাত্তীকরণ। সাধনার মার্গ দমনের মার্গ নয়। এ হল উদাত্তীকরণের মার্গ। আমরা উদাত্তীকরণ করব, তা না হলে মার্গ পরিবর্তন করব।

প্রেক্ষাঃ মার্গান্তরীকরণের উপায়

চোখের কাজ হল দেখা। চোখ দেখে রূপকে। রূপের প্রতি রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয়। দুটি ব্যাপার হতে পারে— হয় প্রীত্যাত্মক অনুভূতি, নয়তো অপ্রীত্যাত্মক অনুভূতি। প্রশ্ন উঠবে, তাহলে আমরা কি করব। সমাধানের ভাষায় বলতে পারি, আমরা

মার্গান্তরীকরণ করব বা দিক-পরিবর্তন করব। বাইরে দেখব না, ভেতরে দেখবার চেষ্টা করব। প্রেক্ষা করব—প্রকম্পনের প্রেক্ষা করব। প্রেক্ষা হল মার্গান্তরীকরণের উপায়। মার্গকে এমনভাবে পরিবর্তিত করব যাতে বাইরের আকর্ষণ ভেতরের আকর্ষণে পরিবর্তিত হয়। ঔৎসুক্যতা যেন পরিবর্তিত হয়। বাইরের জিনিস দেখারই ঔৎসুক্য থাকে। ঘটনা ঘটে, ব্যক্তি উৎসুক হয়। সাধনার সবচেয়ে বড় কথা হল—আকর্ষণের ধারণাকে বদলানো। বাইরের ঔৎসুক্যতা যখন বন্ধ হয়, তখন ভেতরের আকর্ষণ ও উৎসুক্যতা বাড়ে। একেই পতঞ্জলি বলেছেন 'প্রত্যাহার।' প্রত্যাহার হল মার্গান্তরীকরণের উপায়। ইন্দ্রিয়ের দিক পরিবর্তিত করতে হবে। মনের দিক বদলাতে হবে। যাতে তারা বহির্গামী না হয়, অন্তর্মুখীতে পরিণত হয়।

সাধনার মুখ্য সূত্র হল—মার্গান্তরীকরণ।

গৌতম প্রশ্ন করেছিলেন—ভগবান! ধর্ম-শ্রদ্ধা থেকে কি পাওয়া যায়?

ভগবান বলেছিলেন—গৌতম! ধর্ম-শ্রদ্ধা থেকে অনুৎসুক্যতা সৃষ্টি হয়। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা যখন ঘনীভূত হয়, আকর্ষণ হয়, ঔৎসুক্যতা সৃষ্টি হয়, তখনই তৈরি হয় অনুৎসুকা। বাইরের প্রতি যে উৎসুক্যতা ছিল, বাইরের দিকে যা ধাবমান ছিল, বাইরের জিনিস শোনার, দেখার, চোখে দেখার যে প্রবৃত্তিগুলি বহির্গামী হয়ে ছিল, সাধনার বিকাশ ঘটতেই, সাধনমার্গে চলে আসতেই তার দিক পরিবর্তিত হয়, ঔৎসুক্যতা শেষ হয়ে যায়। এই অনুৎসুকতা ভেতরের ঔৎসুকতায় পরিবর্তিত হয়। ভেতরে যখন ঔৎসুক্যতা জাগে তখন বাইরের ঔৎসুক্যতা শেষ হয়ে যায়।

মার্গান্তরীকরণের এই প্রক্রিয়া হল সাধনার বিকাশের প্রক্রিয়া।

নিষ্কর্ষ

উদাত্তীকরণ হল ক্ষয়োপশমের প্রক্রিয়া। আমরা কর্মকে শোধন

করব। শোধনের দ্বারা প্রবৃত্তির সঙ্গে রাগ ও দ্বেষের যে ধারা যুক্ত হচ্ছে যে, রাগ-দ্বেষ নিরন্তর আমাদের কর্মে ফল দান করার ক্ষমতা সৃষ্টি করে চলছে, যা আমাদের বিচার-বোধকে প্রভাবিত করছে,তাকে আমরা ক্ষীণ করব। তার ধারাকে পালটে দেব, তাকে শান্ত করব। উদাত্তীকরণের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন এক বিন্দুতে আমরা পৌঁছব যেখানে প্রবৃত্তি থাকবে, অথচ তার যাবতীয় দোষ সমাপ্ত হয়ে যাবে। তার সাথে যে দোষগুলি জুড়ে যাচ্ছিল, তার ধারা সমাপ্ত হবে। এখানেই হল সাধনার সার্থকতা। কর্মের যে ফলদান-শক্তি আছে, তাকে কম করার জন্যই সাধনা করা হয়। এর অভ্যাসে একটি মার্গের সন্ধান পাওয়া যায়। তা সাধনার শেষ নয়, শুরু মাত্র। এই যাত্রা যে শুরু করে সে যে কোন প্রবৃত্তিই করুক না কেন, তা আগের মত হয় না। এর সঙ্গে এখন আসক্তি ও রাগ-দ্বেষের প্রবাহ যুক্ত হয় না, যেমন আগে জুড়ত। অর্থাৎ তার মার্গ পরিবর্তিত হবে, অথবা একেবারেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই তথ্যকে যদি আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারি, তাহলে কর্মের ফলদানশক্তিকে অনুধাবন করতে পারব। সাধনার সার্থকতাকেও বুঝতে পারব।

কর্মের যে ফলদানশক্তি আছে তা স্বাভাবিক, স্বয়ং-ব্যবস্থাসম্পন্ন। এতে অপরের হস্তক্ষেপ নেই, কোন ব্যবস্থাপকের অপেক্ষা করারও প্রয়োজন পড়ে না। এ হল স্বতঃ-সঞ্চলিত ব্যবস্থা। ফলদান কিভাবে হবে, তা বিচারের আবশ্যকতা এতে নেই।

একটি মানুষ ঘৃণা করে, ঈর্ষা করে, অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে। এর কি ফললাভ হবে, তা ভাবার প্রয়োজন নেই। আজকের মনোবিজ্ঞান বলে, যে কুচিন্তা করে, তার আল্‌সার বা ক্ষত হয়। ঈর্ষা, ঘৃণা প্রভৃতি থেকে অনেক রোগ সৃষ্টি হয়। ক্যানসারও হতে পারে। মানসিক যে রোগগুলি আমাদের স্নায়ু-সংস্থানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, সেই রোগ সৃষ্টি হয়। আমাদের মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে

এর সম্বন্ধ আছে। কোন ব্যবস্থাপক নেই, ব্যবস্থা করতে সক্ষম কেউ নেই। যেমনি একটি হবে, অপরটি হয়ে যাবে। দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে। ফল দেবার জন্য কোন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। তার নিজেরই ফলদানের ক্ষমতা আছে। ঐ ক্ষমতাকে আমরা বুঝব। আসক্তি দ্বারা, রাগ-দ্বেষ দ্বারা, কষায় দ্বারা আমরা তেমন ধরনের কর্ম-পরমাণুর মধ্যে এমন সংরচনা তৈরি হতে দেব না, এমন ফলশক্তি উৎপন্ন হতে দেব না, যার পরিণাম খারাপ, যা আমাদেরই ভুগতে হবে।

১২.

কর্মের বন্ধন

- কর্মের আকর্ষণ হয় চঞ্চলতা দ্বারা।
- কর্মের অবস্থান হয় কষায় দ্বারা।
- সাধনার আধার-বিন্দু দুটি—চঞ্চলতাকে আটকানো, কষায়কে ক্ষীণ করা।
- মনোবিজ্ঞান অনুসারে মনের তিনটি বিভাগ—
    - অদস্ (Id) মন
    - অহং (Ego) মন
    - অধিশাস্তা (Super Ego) মন
- প্রতিপক্ষ ভাবনার সাহায্যে সংস্কার-বিশোধন।

প্রবৃত্তির মূল—কর্মশরীর

মন দু রকমের— চেতন মন এবং অচেতন মন। চেতন মন যা কিছু করে তা কেবল বর্তমানেরই নয়, তাতে অচেতন মনেরও অংশ থাকে। তার প্রভাব থাকে। এ হল উপলব্ধ তথ্যের স্বীকৃতি। যদি সূক্ষ্ম পর্যায়ে যাই তাহলে কর্মশাস্ত্রে এই স্বীকৃতিও পাওয়া যায় যে, মানুষ যে কাজ করে তা কেবল বর্তমান পরিবেশ ও বর্তমান পরিস্থিতি কর্তৃক প্রভাবিত হয়েই করে না, প্রভাবের হেতু খুবই সূক্ষ্মে এবং বহু দূরে চলে যায়। ঐ হেতু হল কর্মশরীর বা পূর্ব-অর্জিত কর্মসমূহ। এতে প্রভাবিত হয়ে মানুষ কাজ করে। দমিত ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা অচেতন মনে চলে যায় এবং সেগুলি জাগ্রত

হলে চেতন মন প্রভাবিত হয়ে কাজ করতে শুরু করে। মনোবিজ্ঞানের এই ভাষাকে আমরা কর্মশাস্ত্রীয় ভাষায় পরিবর্তিত করে এভাবে বলতে পারি যে, পূর্ব-অর্জিত কর্ম যখন উদিত হয়, যখন তার নিজের ফল দিতে শুরু করে, তখন স্থূল মন তদ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সেই অনুসারে তা ব্যবহার ও আচরণ করতে থাকে।

অর্জন এবং উপভোগ

দুটি কাল আছে। একটি হল, ক্রিয়া বা কার্যের কাল, প্রকৃতির কাল এবং দ্বিতীয়টি হল কর্ম-বন্ধনের কাল। যখন কোন প্রবৃত্তি হয়, তখন সেই ক্ষণটিতে কর্মের বন্ধন ঘটে। প্রবৃত্তির ফল পাওয়া যায়। প্রবৃত্তির ফল হল, কর্ম-অর্জন। তা তখুনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফল হয়। কারণ, প্রতিটি ক্রিয়া পরিণামকে সঙ্গে নিয়ে চলে। পরিণাম পরে হয় না, সঙ্গে সঙ্গেই হয়। ক্রিয়া এবং পরিণামের মধ্যে কখনই এমন আড়াল থাকতে পারে না যে, আজ ক্রিয়া করলাম তো তার পরিণাম দেখা দেবে শত বছর বা হাজার বছর পরে। একজন লোক ধন উপার্জনের প্রবৃত্তি করল। এর পরিণাম ধন-প্রাপ্তি বা অ-প্রাপ্তি—তখুনি হয়ে যাবে। ধন অর্জিত হল, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তার সম্পূর্ণ উপভোগও তখুনি পাওয়া যায়, কিন্তু পরিণামের উপভোগ চলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। অর্জন ঐ সময়েই হয়, উপভোগ চলতে থাকে।

কর্মের বন্ধন, কর্ম-পরমাণু অর্জন হল ক্রিয়ারই পরিণাম। অর্জন সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। এমন কখনই হয় না যে, ক্রিয়া এখন হচ্ছে এবং কর্মের বন্ধন পরে হবে। এমন কখনই হতে পারে না। কর্মের বন্ধন হয় সঙ্গে সঙ্গে। ঐ মুহূর্তে। যা অর্জিত হয়েছে, সংগৃহীত হয়েছে, তা কতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকবে,— সেটা একটা স্বতন্ত্র নিয়ম। এমন কখনও হয় না, যে মুহূর্তে ক্রিয়া হল সেই মুহূর্তে তা এল এবং নিজের ফল দান করে চলে গেল। এমন হয় না। অর্জনের সময় মুহূর্তের, কিন্তু উপভোগের সময় হয় দীর্ঘ। প্রাণী দীর্ঘকাল

পর্যন্ত অর্জিত কর্মকে উপভোগ করতে থাকে। প্রাণী যা অর্জন করে, যে কর্ম-পরমাণুগুলিকে সঞ্চয় করে, সেই কর্ম-পরমাণুগুলি সঞ্চয়ের মুহূর্তেই ফল দানে সমর্থ হয় না। প্রবৃত্তি বা আস্রবের প্রধান ফল হল কর্ম অর্জন। তা প্রবৃত্তির সময়েই হয়ে যায়। কিন্তু অর্জিত কর্ম-পরমাণুগুলি কখন সক্রিয় হবে, কতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সক্রিয়তা থাকবে, তার নিয়মটি কিন্তু অর্জনের নিয়ম থেকে ভিন্ন হয়। সক্রিয়তা সঙ্গে সঙ্গেই আসে না। আজ শিশু জন্মাল। আইনের দৃষ্টিতে সে সম্পত্তির অধিকারী হয়ে গেল, কিন্তু ঐ সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ অধিকার সে প্রাপ্ত হবে তখনই যখন সে নাবালক অবস্থা পার হয়ে সাবালক হয়ে উঠবে। যতক্ষণ না সে সাবালক হচ্ছে ততক্ষণ তার তার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন কোন অভিভাবক। শিশু ঐ সম্পত্তিতে কার্যকরী স্বামিত্ব পাবে না। জন্মজাত অধিকার তার রয়েছে, কিন্তু কার্যকরী স্বামিত্ব সে পাবে সাবালক হবার পর।

কর্মের ফলদানের কাল-সীমা

কর্ম-জগৎ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ নিয়ম প্রযোজ্য। যে কর্মে-বন্ধন ঘটেছে, যে কর্ম-পরমাণুগুলি অর্জিত হয়েছে, তা আজই কার্যকর হবে না। কিছু সময় পর্যন্ত ঐ কর্ম-পরমাণুগুলি সত্তায় থাকবে, উদিত হবে না। ঐ সত্তা-সময়কে বলা হয় 'অ-বাধা-কাল।' এর তাৎপর্য হল, কর্ম-পরমাণুগুলি অস্তিত্বে রয়েছে, কিন্তু এখনও কার্যকরী নয়। তারা কিছু করতেও সমর্থ নয়। নিজের পরিণাম দেখানোর ক্ষমতাও তার মধ্যে প্রকট হয় নি। তাদের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু তারা পড়ে আছে অব্যক্ত রূপে। বীজ বপন করা হয়েছে। তার অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু অভিব্যক্তি ঘটে নি, অঙ্কুরের রূপে তা প্রকটিত হয় নি। অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হতে খানিকটা সময় লাগবে। অঙ্কুরিত হলে তবে তা চারাতে পরিণত হবে, এগিয়ে যাবে, ওপরে উঠবে। বীজ ভূমিতে বপন করা হয়েছে, এই হল বন্ধন-কাল। এর পরে আসবে সত্তা-কাল। কর্ম যতক্ষণ সত্তাকালে থাকবে, ততক্ষণ তা কার্যকরী হবে

না। নিজের পরিণামও তা দিতে পারবে না। প্রত্যিটি কর্মেরই নিজ নিজ অস্তিত্ব-কাল থাকে। যখন ঐ অস্তিত্ব-কাল বা সত্তা-কাল বা অ-বাধা-কাল সম্পূর্ণ হয় তখন কর্ম বিপাকের স্থিতিতে আসে এবং নিজের ফল দিতে শুরু করে। ফলদান কতক্ষণ পর্যন্ত হবে, তারও একটা সীমা আছে। কর্মশাস্ত্রের ভাষায় ঐ সীমাকে বলা হয় স্থিতিকাল। এ হল কর্ম-বন্ধনের চতুর্থ অবস্থা বা ব্যবস্থা।

কর্ম-বন্ধনের চার অবস্থা এবং তাদের ঘটক

প্রথম অবস্থা হল—কর্ম-পরমাণু আসার ও তাদের সংগ্রহের। একে বলা হয় 'প্রদেশ বন্ধন'।

দ্বিতীয় অবস্থা হল—কর্ম-পরমাণুর স্বভাব তৈরির। কোন্ কর্ম কোন্ স্বভাবের হবে, সেই অবস্থাকে বলা হয় 'প্রকৃতি বন্ধন'।

তৃতীয় অবস্থা হল—কর্ম-পরমাণু থেকে রস-শক্তি নির্মাণের অবস্থা। কোন্ কাজে কতটা রস-শক্তি আছে, সেই অবস্থাকে বলা হয় 'অনুভাগ বন্ধন'।

চতুর্থ অবস্থা হল—কর্ম-পরমাণুর স্থিতিকালের। কোন্ কর্ম আত্মার সঙ্গে কত সময় থাকবে, সেই অবস্থাকে বলা হয় 'স্থিতি বন্ধন'।

এই চার অবস্থা কর্ম বন্ধনের সঙ্গে নিষ্পন্ন হয়। কর্মের স্থিতিকাল অনুসারে তার সত্তা-কাল হয়। যখন তা সম্পূর্ণ হয় তখন এক একটি নিষেকের, পরমাণুপুঞ্জের প্রকটীকরণ হতে শুরু করে এবং প্রাণী ফল ভুগতে শুরু করে। যখন সমস্ত পরমাণুপুঞ্জ সমাপ্ত হয়ে যাবে, কর্ম-স্থিতি সমাপ্ত হবে, তখন কর্ম নিজের ফল প্রদর্শন করে শেষ হয়ে যাবে, বিনষ্ট হয়ে যাবে, আত্মা থেকে বিলীন হয়ে যাবে। একে বলা হয় কর্ম-ক্ষয়।

এই হল চার অবস্থা। এর ঘটক হল রাগ ও দ্বেষ। আমাদের রাগাত্মক এবং দ্বেষাত্মক প্রবৃত্তি দ্বারা এগুলি সংঘটিত হয়। আমরা নিজেদের চঞ্চলতা দ্বারা কর্ম-পরমাণুগুলিকে আকর্ষণ করি। কষায়

দ্বারা ঐ কর্ম-পরমাণুগুলিকে আটকে রাখি। আকৃষ্ট করা এবং আটকে রাখা—দুটি পৃথক প্রসঙ্গ। আকর্ষণ হয় মন, বাক্য ও শরীরের চঞ্চলতা দ্বারা, এবং তা আটকে থাকে কষায় দ্বারা। কষায় দ্বারা ওদের বেঁধে রাখা হয়। কষায় যত তীব্র হবে, তত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কর্ম-পরমাণু আত্মার সঙ্গে আটকে থাকবে। কর্ম-পরমাণুগুলিকে আটকে রাখা হল কষায়ের কাজ এবং ওদের আকৃষ্ট করা হল চঞ্চলতার কাজ।

কর্মশাস্ত্র ঃ সাধনার প্রসঙ্গে

এটি কি আমাদের সাধনার সূত্র হতে পারে না? এটি কি সাধনার আধার হতে পারে না? এটি সাধনার সূত্র হতে পারে, তার আধার হতে পারে।

আমাদের সাধনার আধার-বিন্দু দুটি—চঞ্চলতাকে আটকানো এবং কষায়কে কম করা, রাগ-দ্বেষকে কমানো। তটস্থ হওয়া, সমভাবে থাকা, স্থির থাকা—এ হল সাধনার দুটি সূত্র। সম্পূর্ণ কর্মশাস্ত্রে সাধনাবিষয়ক অধ্যায়টিকে যদি আপনি বোঝেন, তাহলে দুটি বিষয় খুবই সুস্পষ্ট হবে ঃ চঞ্চলতার দ্বারা কর্ম-পরমাণু আকৃষ্ট হয় এবং কষায়ের দ্বারা তা আটকে থাকে, নিজের ফল দান করে। ফলের তীব্রতা বা মন্দীভূত ভাবটি নির্ভরশীল কষায়ের আধারের ওপর। স্থিতি এবং ফলদান-শক্তি—উভয়ই কষায়ের ওপর নির্ভরশীল। কষায় কর্ম-স্থিতিকে বাড়ায় বা কমায়, আবার কষায়ই ফলদান-শক্তির তীব্রতা বা মন্দীভূত ভাব আনে। কর্মের আকর্ষণ হয় কেবল চঞ্চলতার আধারে।

কর্মকে আটকাতে হলে এমনভাবে আমাদের চলতে হবে যাতে প্রথমে চঞ্চলতা ধীরে ধীরে চলে যায়, স্থিরতার মাত্রা বাড়ে। শরীরের চঞ্চলতা যাতে কম হয়, শেষ হয়, সেজন্যই কায়োৎসর্গ করা হয়। চঞ্চলতা যাতে কমে সেজন্য আমরা শ্বাসের প্রেক্ষা করি—শ্বাসকে মন্দীভূত করি, সূক্ষ্ম করি। এতে কায়ার চঞ্চলতাও কমে।

শ্বাস হল কায়ারই এক অংশ। শ্বাস শরীর থেকে ভিন্ন নয়। চঞ্চলতা কম করার জন্যই আমরা শ্বাসের সংযম করি। মনকে স্থির করার চেষ্টা করি, নির্বিচারতা ও নির্বিকল্পতার সাধনা করি চঞ্চলতাকে কম করার জন্যই। বাণীর চঞ্চলতা যাতে কম হয় সেজন্য মৌনতা অবলম্বন করি। বাণীর চঞ্চলতা কম হলে মনের চঞ্চলতাও কম হয়। আবার, শরীরের চঞ্চলতা কম হলে কর্ম-পরমাণুর আসাও কমে যায়।

দ্বিতীয় কথা হল, কায়ার যে যৎসামান্য প্রবৃত্তি শেষে থাকে, বাক্যের যে অল্পমাত্রায় প্রবৃত্তি-শেষ থাকে এবং মনের যে স্বল্পমাত্রায় প্রবৃত্তি-শেষ থাকে, তার সঙ্গে যেন আসক্তি না যুক্ত হয়, রাগ-দ্বেষের ভাব না যুক্ত হয়। তটস্থতার বিকাশ হোক, সমতার বিকাশ হোক এমনভাবে যেন অবশিষ্ট চঞ্চলতা বা প্রবৃত্তি দ্বারা যেসব কর্ম-পরমাণু আকৃষ্ট হবে সেগুলি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকতে না পারে এবং নিজেদের তীব্র অনুভব ও প্রভাব আমাদের ওপর ফেলতে না পারে। এতে সাধনার কোন দিকই বাকি থাকে না। সম্পূর্ণ সাধনা এতে সমাহিত হয়। সার কথা হল—চঞ্চলতাকে আটকানো এবং সম-ভাবে থাকা। এই দুই তটের মাঝে প্রবাহিত হচ্ছে সাধনার যাবতীয় ধারা। এই দুই তটই হল সাধনার। এই দুই তটকে বাদ দিয়ে কিংবা এই দুই তটকে অতিক্রম করে প্রবহমান সাধনার কোন ধারা নেই। যদি থাকে তাহলে তা মোক্ষ বা মুক্তির—স্বতন্ত্রতার সাধনা নয়। আরও কিছুর সাধনা হতে পারে। তা বীতরাগতার সাধনা নয়, অন্য কিছুর। এভাবে তো প্রতিটি প্রবৃত্তিই হল সাধনা। সাধনা ছাড়া কোন প্রবৃত্তিই হয় না। প্রতিটি প্রবৃত্তিকে নিষ্পন্ন করার জন্য সাধনা আকাঙ্ক্ষিত। কোন কার্যও সাধনা ছাড়া হয় না। সাধ্য ছাড়া কোন কার্যও হয় না। প্রতিটি প্রবৃত্তিতে তাই সাধ্য, সাধন এবং সাধনা থাকে। যে কোন প্রবৃত্তি আপনি করুন, তার সাধ্য হবে, আপনি এর কি করতে চান। তার সাধনা হবে, আপনি কোন্

কোন্ সাধনা থেকে ওদের নিষ্পন্ন করতে চান। আর এর সাধনা হবে, আপনার ঐ নিষ্পত্তিতে কিভাবে জপ-তপ হবে?

সাধনার দুই তট

যে প্রসঙ্গে আমরা সাধনার আলোচনা করছি, তা অন্যান্য সাধনা থেকে কিছুটা পৃথক। আমাদের যাবতীয় সাধনার ধারা যেন দুই তটের মাঝখান দিয়েই প্রবাহিত হয়। একটি তট হল, স্থিরতার। অপর তট হল, সমতার, বীতরাগের, অ-কষায়ভাবের, রাগ-দ্বেষের ন্যূনতার। এই দুই তটের মাঝখান দিয়েই সাধনার ধারা প্রবাহিত হোক, এটাই কাম্য। তারপর ইচ্ছেমত আমরা কোন প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি করব, কাজ করব বা করব না, বলব বা বলব না, ভাবব বা ভাবব না, খাব বা খাব না। আমরা যা কিছুই করি না কেন, ঐ দুই তটের বন্ধনকে এমন দৃঢ় করে রাখব যে, কোথাও যেন ওতে ছিদ্র না থাকে, জল এদিক-ওদিক না গিয়ে ঠিক মাঝখান দিয়েই প্রবাহিত হয়।

কর্মের আকর্ষণ এবং সংশ্লেষের হেতু

প্রশ্ন উঠবে, কর্মের আকর্ষণ-প্রক্রিয়া এবং সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার পেছনের কারণটি কি? এই দুই প্রক্রিয়া দুটি আস্রবের দ্বারা সম্পন্ন হয়। একটির নাম হল, যোগ এবং অপরটির নাম, কষায়। যোগ আস্রব এবং কষায় আস্রবের দ্বারাই কর্মের আকর্ষণ ও সংশ্লেষ হয়ে থাকে। চঞ্চলতা স্পষ্ট, কিন্তু কষায় ততটা স্পষ্ট হয়। চঞ্চলতা স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু কষায় ভেতরে লুকিয়ে থাকে। তা দেখা যায় না। সেই নিগূঢ়ের মধ্যে আমাদের যেতে হবে, রহস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে। কোথাও কোথাও আমাদের রহস্যবাদী হতে হবে এবং যা লুকোনো আছে, তার তল পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে।

মনোবিজ্ঞানের অধ্যায়ে মনের তিন বিভাগ

মনোবিজ্ঞান প্রসঙ্গে মনের তিনটি বিভাগ—

১। অদস্ মন (Id)

২। অহং মন (Ego)

৩। অধিশাস্তা মন (Super Ego)

প্রথম ভাগে হল 'অদস্' মন। এই ভাগে আকাঙ্ক্ষাগুলি তৈরি হয়। যত রকম প্রবৃত্তিধর্মী আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছা আছে, সবই উৎপন্ন হয় এই মনে। এতে অচেতনের ভাগ বেশি, চেতনের ভাগ কম।

দ্বিতীয় ভাগে হল 'অহং' মন। সামাজিক ব্যবস্থা থেকে যে নিয়ন্ত্রণ পাই, তার সাহায্যে আকাঙ্ক্ষাগুলি এখানে নিয়ন্ত্রিত হয়, কিছুটা পরিমার্জিতও হয়। যেন অঙ্কুশ চালানো হয় আকাঙ্ক্ষাগুলির ওপরে। মনে যেসব আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা তৈরি হয়, 'অহং' মন তাদের ক্রিয়াশীল করে না।

তৃতীয় হল, 'অধিশাস্তা' মন। অহং-এর ওপরে এই মন অঙ্কুশ চালনা করে এবং তাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

চঞ্চলতার আধার : অ-বিরতি

চঞ্চলতা আপনা থেকেই হয় না। এর পেছনে কোন না কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে। আমরা আপনা থেকেই বলি না। বলার প্রয়োজন পড়ে, আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, কোন বিকল্প তৈরি হয়, তখন আমরা বলি। মাঝে মাঝে আমি মৌনতা অবলম্বন করার বিষয় চিন্তা করি। দেখে আমার খুব অবাক লাগে, মানুষ মৌনতা অবলম্বন করে এবং এত প্রবৃত্তি করে যে, যিনি বলেন তিনিও বোধ হয় ততটা করেন না, বা বলার সময়েও অতটা করার প্রয়োজন পড়ে না। দেখে ভারি বিচিত্র লাগে। বাণী মৌন রয়েছে, কিন্তু সঙ্কেতের মাধ্যমেই এত প্রবৃত্তি সম্পাদিত করা হয় যে কথা যিনি বলেন তিনিও ততটা করেন না। একে মৌনতা বলা যায় না। মৌনতার অর্থ শুধুমাত্র কথা বলা বন্ধ করা নয়। এর অর্থ হল, বলার আকাঙ্ক্ষাই কম হয়ে যাবে। বলার প্রেরণা যেখান থেকে আসে, যে কারণে আমরা বলতে বাধ্য হই, সেই প্রেরণাকে কম করানোই হল মৌনতা।

বাণীর প্রয়োগ বন্ধ করে শরীরকে কাজে লাগানো, সঙ্কেতের সাহায্য নিয়ে প্রবৃত্তি করা মৌনতা নয়।

কিছু লোক মৌনতা অবলম্বন করেও 'উ-উ' প্রভৃতি ধ্বনি দ্বারা নিজের কার্য সমাধা করেন। এটা কোন্ ধরনের মৌনতা?

আকাঙ্ক্ষা কম হওয়া, প্রয়োজন কম হওয়া, ইচ্ছা কম হওয়া, অপেক্ষা কম হওয়ার অর্থ হল, চঞ্চলতা আপনা থেকে কমে আসা। চঞ্চলতা আপনা থেকে আসে না। চলমান বস্তু আপনা থেকে চলে না। তাকে চালায় অন্য কেউ। চাকা ঘোরে—কখনও হাওয়ায়, কখনও বিদ্যুতে, কখনও অন্য কোন প্রক্রিয়ায়। আপনা থেকে চাকা ঘোরে না। তার জন্য প্রয়োজন কোন প্রেরণার। চঞ্চলতা আপনা থেকে হয় না। চঞ্চলতার পেছনে আরও কিছু থাকে।

পারিভাষিক শব্দাবলীতে চঞ্চলতাকে যোগ বলা হয়। এই যোগ হল আস্রব। যোগ আস্রব আপনা থেকেই প্রবৃত্তি হয় না, তার পেছনে কোন না কোন প্রত্যাশা থাকে। এই প্রত্যাশাই হল 'অ-বিরতি'। অ-বিরতি অর্থে লুকোনো বাসনা। লুকোনো জ্বালা, লুকোনো আগুন। আগুন জ্বলছে। বাসনা রয়েছে। সুখ লাভের বাসনা, দুঃখ মেটানোর বাসনা। প্রিয়কে লাভ করার বাসনা, অপ্রিয়কে দূর করার বাসনা। অনুকূলকে পাওয়ার বাসনা, প্রতিকূলকে শেষ করার বাসনা। সুখ-সুবিধা লাভ করার বাসনা, কষ্টকে মেটানোর বাসনা। এই যে বিভিন্ন ধরনের মনোগত বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, একেই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়েছে 'অদস্ মন'। কর্মশাস্ত্রের ভাষায় এ হল অ-বিরতি আস্রব। অ-বিরতির অর্থ হল, বিরতির অভাব। এখনও পর্যন্ত বাসনা মেটে নি, পিপাসা মেটেনি, অতৃপ্তি রয়েছে। গলা পর্যন্ত শুকিয়ে আছে। কত জল খেলাম, কিন্তু গলা এখনও শুকনো রয়েছে, পিপাসা মেটে নি। সমস্ত সংসারের জল খেলাম, অথচ পিপাসা মিটল না। এই হল অদম্য বাসনা। অদম্য বাসনার এই স্রোতকেই বলা হয়েছে অবিরতি আস্রব। এর

মাত্রা যত বেশি হবে, চঞ্চলতা তত বাড়বে। চঞ্চলতা যদি স্বাভাবিক হতো, তাহলে সব প্রাণীর মধ্যেই তা সমান থাকত।

অন্তর্বৃত্তি : বহির্বৃত্তি

কিছু লোক ব্যালকনিতে বসে আছে। রাস্তায় বাজনা বাজছে। কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে তা দেখছে, কেউ শান্তভাবে চুপচাপ বসে আছে। এই পার্থক্য কেন? যাদের মধ্যে অ-বিরতি প্রবল, বাসনা, প্রবল, উৎসুক্য প্রবল, দেখতে দৌড়বে, চলে যাবে, শুনতে চাইবে, চেষ্টা করবে। যাদের অ-বিরতি কম, বাসনা কম, তারা আপনা আপনি শান্তভাবে বসে থাকবে। অন্তর্বৃত্তি হয়ে বসে থাকবে। তাদের বহির্বৃত্তি থাকবে না। বাইরেও তারা যাবে না। এই আকর্ষণ কম হওয়া, সহজভাবে অন্তর্বৃত্তি হওয়া।

মানসশাস্ত্রে দু রকমের বৃত্তির উল্লেখ আছে—অন্তর্বৃত্তি এবং বহির্বৃত্তি। কামশক্তি যখন বাড়তে থাকে, ব্যক্তি তখন বহির্বৃত্তি সম্পন্ন হয়ে যায় এবং বাইরে দৌড়তে শুরু করে। কামশক্তি যখন প্রত্যাবৃত্ত হয়, দমিত হয়, ব্যক্তি তখন ভেতরে লেপটে যায়। তার বাইরের বৃত্তি সমাপ্ত হয়ে যায়। ঠিক যদি আমরা কর্মশাস্ত্রীয় ভাষাকে প্রয়োগ করি, তাহলে বলতে হয়, যখন অবিরতি তীব্র হয় তখন পুরুষ বাইরে পালাতে চায়। তার আকাঙ্ক্ষা এমন বেড়ে যায় যে, সারা সংসারকে সে নিজের হাতের মুঠোয় আনতে চেষ্টা করে এবং সব কিছুই বাইরে বাইরে দেখে, ওপর ওপর দেখে। অ-বিরতি যখন কম হয়, তখন ব্যক্তি নিজের ভেতরে সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। ভেতরে সঙ্কোচন আরম্ভ হলে আকাঙ্ক্ষা কম হয়, চঞ্চলতা আপনা থেকেই কম হয়। এক সংস্কৃত কবি তাই বলেছেন—

> আশা নাম মনুষ্যাণাং, কাচিদাশ্চর্যশৃঙ্খলা।
> যথা বদ্ধাং প্রধাবন্তি, মুক্তাস্তিষ্ঠন্তি পঙ্গুবৎ॥

আশা নামে একটি শৃঙ্খল আছে। এক অদ্ভুত শৃঙ্খল। লোহার শিকলে লোককে বেঁধে দিন, সে চলতে পারবে না। শৃঙ্খলকে খুলে

দিন, সে চলতে শুরু করবে। আশারূপী শৃঙ্খল দিয়ে লোককে বেঁধে দিন, সে দৌড়তে শুরু করবে। শৃঙ্খল খুলে দিলে সে পঙ্গুর মত বসে যাবে। কি রকম উলটো কথা দেখুন! একটি শৃঙ্খল এমন যা দিয়ে বাঁধলে মানুষ চলতে পারে না, খুলে দিলে তবে সে দৌড়তে পারে। আর একটি শৃঙ্খল এমনই যা দিয়ে বাঁধলে মানুষ দৌড়তে শুরু করবে, আবার মুক্ত হলেও এক পা-ও চলতে পারবে না। কি অদ্ভুত কথা!

অ-বিরতির কারণ—মূঢ়তা

চঞ্চলতা সৃষ্টিকারী, সক্রিয়তা সৃষ্টিকারী যে তত্ত্ব, তারই নাম হল অ-বিরতি। এ হল এক এমন পিপাসা যাকে এখনও পর্যন্ত মেটানো যায় নি। এত ভোগ করেও তাকে মেটানো সম্ভব হল না। চঞ্চলতার এটাই বড় স্রোত। একটি প্রশ্ন উঠবে, আমরা যখন এতটা জেনে গেছি যে চঞ্চলতার স্রোতই হল আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, অতৃপ্তি, তবে কেন তাকে মেটাতে পারি না? কেন এমন হয়? মানুষ জানে, অথচ কেন তাকে মেটাতে পারে না, তারও একটা কারণ আছে। মাঝে মাঝে ভ্রম হয়, মানুষ বুঝি তা বুঝে ফেলেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা জানতে পারে নি। এর কারণ হল, মিথ্যা দৃষ্টিকোণ। আমাদের দৃষ্টিকোণই কিছুটা এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, যা থেকে পিপাসা মেটে, তা থেকে আমরা দূরে চলে যাই, আর যাতে পিপাসা বেড়ে ওঠে তাকেই পান করি পিপাসা মেটাবার আশায়। আচার্য পূজ্যপাদ লিখেছেন—

মূঢ়াত্মা যত্র বিশ্বস্তঃ, ততো নান্যদ্ ভয়াস্পদম্।
যতো ভীতস্ততো নান্যদ্, অভয়স্থানমাত্মনঃ ॥

মূঢ় আত্মা যাতে বিশ্বাস করে, তার চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর বস্তু পৃথিবীতে নেই। মূঢ় আত্মা যাকে ভয় পায়, যাকে দেখে দূরে পালায়,তার চেয়ে বড় কারণ-দানকারী বস্তু সংসারে নেই।

ভয়ংকর বস্তুতে বিশ্বাস করা এবং বিপদ কাটিয়ে উঠতে সমর্থ বস্তু

যেতে দূরে চলে যাওয়া, এ কখন হয়? তখনই হয় যখন আত্মা মূঢ় হয়, দৃষ্টিকোণ মিথ্যা হয়, মোহ প্রবল হয়। রাগ-দ্বেষ যখন প্রবল হয়, কষায় যখন প্রবল হয়, তখন এমন হয়। মিথ্যা দৃষ্টি যতক্ষণ আমরা এসব বুঝতে পারব না।

একটি চক্র

কর্ম-বন্ধন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মহাবীরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'ভন্তে! কর্মের বন্ধন কিভাবে হয়? এর প্রক্রিয়া কি?'

ভগবান বলেছিলেন—যখন জ্ঞানাবরণ কর্মবিশিষ্ট উদয়াবস্থায় হয়, তখন দর্শনাবরণ কর্মেরও উদয় হয়। জানায় যখন আবরণ আসে, তখন দেখাতেও আবরণ চলে আসে। যখন দর্শনের আবরণ হয়, তখন দর্শন মোহ কর্মের উদয় হয়। দর্শন মোহের উদয় হলে মিথ্যাত্ব আসে। এর অস্তিত্বে নিত্যকে অনিত্য, সুখকে দুঃখ, অনিত্যকে নিত্য এবং দুঃখকে সুখ বলে মনে হয়। তখন ব্যক্তি দুঃখের সাধনকে সুখের সাধন এবং সুখের সাধনকে দুঃখের সাধন বলে মনে করতে থাকে। তখন সে পিপাসা মেটাতে সক্ষম সাধনকে পিপাসা-সৃষ্টিকারী সাধন এবং পিপাসা-সৃষ্টিকারী সাধনকে পিপাসা মেটাতে সক্ষম সাধনা বলে মনে করতে থাকে। সব কথাই তখন উলটে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যাত্বের বন্ধন ছিন্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ কর্মের চক্র ছিন্ন হতে পারে না। একে ভাঙ্গতেও পারা যায় না।

মিথ্যাদৃষ্টির অস্তিত্বকালে একথা জানা সত্ত্বেও যে পিপাসা রয়েছে এবং পিপাসা মেটাবার সাধনও রয়েছে, আমরা ঐ সাধনকেই খুঁজে বেড়াই, যাতে পিপাসা আরও বেড়ে যায়। এর কারণ, এর খোঁজে মিথ্যাত্ব অবস্থিত রয়েছে। মিথ্যা দৃষ্টিকোণ, মতির বিপর্যয়, বুদ্ধির বিপর্যস্ত ভাব—সত্যের বিপরীত গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করে।

মিথ্যা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আকাঙ্ক্ষা থাকবে, পিপাসা যতক্ষণ বজায় থাকবে প্রমাদও হতে থাকবে, ভ্রান্তি হতে থাকবে, বিস্মৃতি হতে থাকবে। বিস্মৃতি—যেমন, আমরা একবার জেনে

নিয়েছি যে, ধন সুখের সাধন নয়। স্মৃতিতে এই তথ্য অঙ্কিত আছে, কিন্তু যখন আমরা কার্যক্ষেত্রে নামি, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তখন এই কথাকে ভুলে যাই যে, ধন-সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য সুখের সাধন নয়। তখন এই কথাই আমার মনে করি বা মনে করতে শুরু করি যে, সংসারে কোন সার বস্তু থাকলে তা হল ধন, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য এ সব কিছুই আসার, ব্যর্থ ও মিথ্যা। টাকা থাকলে সব কিছুই আছে, টাকা না থাকলে কিছুই নেই, ধনই সার, সারভূত ও একমাত্র পদার্থ। এখন প্রশ্ন উঠবে, কেন এমন হয়? এর সমাধান হল আমরা ভুলে যাই, বিস্মৃতি হয়, প্রমাদ সৃষ্টি হয়—এজন্যই এমন হয়।

চঞ্চলতা-চক্রের অন্ত: কিছু উপায়

অস্তিত্বের মধ্যে যতক্ষণ চার তত্ত্ব—মিথ্যাত্ব, অবিরতি, প্রমাদ এবং কষায় থাকে, ততক্ষণ চঞ্চলতাকে আটকানো যায় না। চঞ্চলতার চক্রকে ধীরগতি করা যায় না। এত জোরে এই চাকা ঘুরতে থাকে যে তার অনুমান করাও শক্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তি ধ্যান করার জন্য বসল, অমনি কখনও আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল, কখনও প্রমাদের অন্ধকার চারদিক আবৃত করে ফেলল, কষায়ের আগুন জ্বলে উঠল এবং ব্যক্তি ধ্যান থেকে ধীরে সরে গেল। ধ্যান ভঙ্গ হল, সঙ্কল-বিকল্পের জালে আটকা পড়ল। ঐ জালে এমন সমাধি তৈরি হবে যে প্রকৃত সমাধির প্রান্ত খসে পড়বে। আমরা শোধন করতে করতে অগ্রসর হই নি। আমাদের বৃত্তিগুলি অ-শোধিত—তাই এমন হচ্ছে।

সাধনার সফলতার জন্য কর্মশাস্ত্রীয় এই রহস্যগুলিকে অনুধাবন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। মিথ্যা দৃষ্টিকোণ ত্যাগ করে আমরা সম্যক্ দৃষ্টিকোণ গঠন করব, অ-বিরতিকে ছেড়ে বিরতিকে গ্রহণ করব, প্রমাদকে ছেড়ে অপ্রমাদে আসব এবং কষায়ের আগুনকে শান্ত করব। এগুলি হলে চঞ্চলতা আপনা থেকেই কম হতে থাকবে।

লোকে জিজ্ঞেস করে—প্রথম থেকেই মন চঞ্চল হয়ে আছে, তাকে শান্ত করব কি করে? এমন কোন জাদু নেই যে, মন

একেবারে প্রথম ক্ষণেই শান্ত হয়ে যাবে। মনকে শান্ত করার একটি প্রক্রিয়া আছে। ঐ প্রক্রিয়া ভেতর দিয়ে পার হলেই মন শান্ত হয়ে যাবে। ঐ প্রক্রিয়া হল : মিথ্যা দৃষ্টিকোণ, অ-বিরতি, প্রমাদ এবং কষায়কে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকুন, মন শান্ত হয়ে যাবে। ঐ চারটিকে ক্ষীণ করার চেষ্টা করুন, ক্ষীণ করার সাধনা করুন, এমন একদিন আসবে যেদিন মন শান্ত হবে, বাণী শান্ত হবে, শরীর শান্ত হবে। এই প্রক্রিয়াকে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে অবলম্বন করব এবং তা চালিয়ে যাব। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বিচরণ করেই আমাদের লক্ষ্যে সফল হতে হবে। তাৎক্ষণিক লাভের জন্য এ কথা যেন আমরা না ভাবি, সাধনার প্রথম মুহূর্তেই সিদ্ধি হবে। তা তখনও হয় না, হবেও না। তাই এই প্রক্রিয়াই অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হবে। নিরাশ হলে চলবে না।

শ্বাস প্রেক্ষা অথবা শরীর প্রেক্ষা—যাই আমরা করি না কেন, তার অর্থ আমরা সকলে না-ও বুঝতে পারি, কিন্তু এ কথা যেন নিশ্চিত থাকে যে, একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা বিচরণ করছি। ঐ চক্রব্যূহকে তারই সাহায্যে ভাঙবার চেষ্টা করে থাকি। প্রশ্ন উঠবে, আমরা অভ্যাসকালে অনুপ্রেক্ষার চিন্তা করি, চিন্তারত প্রেক্ষায় মনকে এদিক থেকে ওদিকে ঘোরাতে হয়, তাহলে চঞ্চলতা মেটানোর উপায় হবে কিভাবে? প্রশ্নটি সঠিক। আমরা অনুপ্রেক্ষার সময় চঞ্চলতাকে মেটাই না, মেটানোর চেষ্টাও করি না। এক ধরনের চঞ্চলতার সামনে আমরা অন্য ধরনের চঞ্চলতাকে খাড়া করি।

চঞ্চলতার সমাপ্তি চঞ্চলতায়

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—'বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্'। এক পক্ষকে গুড়িয়ে দিতে হলে তার প্রতিপক্ষ তৈরি কর। অশুভকে ছিন্ন করতে হলে শুভ তৈরি কর। ত্যাগ করতে হবে উভয়কেই—শুভকে এবং সেই সঙ্গে অশুভকেও। পাপকে ত্যাগ করতে হবে, পুণ্যকেও ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু অশুভকে ত্যাগ করার জন্য শুভের সঙ্কল্প

করুন। খারাপকে ত্যাগ করার জন্য ভালোর সঙ্কল্প করুন। খারাপ অভ্যাসকে ত্যাগ করার জন্য ভালো অভ্যাস রপ্ত করুণ। নইলে খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করা যাবে না। একবার ঐ অভ্যাস চলে গেলেও ফের তা আসবে। আমি দেখেছিলাম, একটি লোকের নস্য নেবার অভ্যাস ছিল। সারা দিনে পঞ্চাশ থেকে একশো বার নস্য ব্যবহার করত। নস্যের দুর্গন্ধ যেমন তার অনুভব হত না, তেমনি ঐ অভ্যাসের প্রতি তার কোন ঘৃণাও ছিল না। একদিন সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ঐ অভ্যাস ত্যাগ করার সঙ্কল্প করল। তখন সে নস্য নেওয়ার অভ্যাস ছেড়ে আতর ব্যবহার করতে লাগল। ক্রমে আতর ব্যবহার করাই তার অভ্যাসে দাঁড়াল এবং নস্য সেবনের অভ্যাস চলে গেল।

খারাপ অভ্যাসকে ত্যাগ করার জন্য ভালো অভ্যাসের প্রয়োজন পড়ে। এভাবে এক ধরনের চঞ্চলতা মেটাতে অন্য ধরনের চঞ্চলতার সাহায্য নিতে হয়। পুরানো চঞ্চলতাকে মেটাবার জন্য নতুন চঞ্চলতার সাহায্য নেওয়া হয়। এরকম করতে করতে এমন একটা দিন আসবে যেদিন যাবতীয় চঞ্চলতাই মিটে যাবে, শেষ হবে।

১৩.

সমস্যার মূল বীজ

- যোগ্যতাধর্মী ক্ষমতা—লব্ধিবীর্য।
- ক্রিয়াত্মক ক্ষমতা—করণবীর্য।
- শরীর মনকে প্রভাহিত করে এবং মন শরীরকে প্রভাবিত করে। তুয়েরই মূল হল কর্ম।
- কালের প্রভাব কাললব্ধি মারফৎ বিকাশ।
- ব্যবহাররাশি এবং অব্যবহার রাশি।

সমস্যা এবং কর্ম

কিছু মানুষ আছেন যাঁরা জানেন না তাদের কি করতে হবে। কিছু মানুষ তা জানেন, কিন্তু করতে সমর্থ হন না। কিছু মানুষ জানেন, কিন্তু প্রকৃত সত্যটিকে জানেন না। কেউ কেউ করেন, কিন্তু সঠিক ভঙ্গিতে তা করেন না। এ ধরনের হরেক রকম সমস্যা আছে এবং প্রত্যেক মানুষকেই কিছু না কিছু সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। এই সমস্যাগুলি দেখা দেয় কেন? এর হেতু কি? কর্মশাস্ত্র এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছে এবং তার সমাধানও দিয়েছে।

জ্ঞানের অন্য শাখা, যা স্নায়বিক উত্তেজনা এবং পরিস্থিতির জন্য মানবিক আচরণকে ব্যাখ্যা করে, তা শরীর ছাড়িয়ে যেতে পারে না। এগুলি তার বিষয়ও নয়। এর বিষয় শরীরেই আবদ্ধ রয়েছে।

মানসশাস্ত্র মনোবিশ্লেষণ করেছে এবং মানসিক সমস্যাগুলির প্রসঙ্গে তা বিচারও করেছে, তার সমাধানও দিয়েছে। কিন্তু ঐ

সমাধান পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতিজনিত স্নায়বিক উত্তেজনা—এই দুয়ের মধ্যেই সমাহিত হয়ে যায়। উভয়কে ছাড়িয়ে তা এগিয়েও যায় না। যায় অবচেতন মন পর্যন্ত। কিন্তু, অবচেতন মনেও কেন এমন হয়, তার কোন সঠিক সমাধান পাওয়া যায় না।

কর্মশাস্ত্র এর মূল কারণের ওপর যেমন বিচার করেছে, তেমনি পরিস্থিতিগুলির ওপরেও বিচার করেছে। পরিস্থিতিগুলিকে তা অস্বীকার করে নি, কারণ পরিস্থিতিগুলিই নিমিত্ত হয়ে ওঠে। নিমিত্তকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে ঘটনা ঘটে, তার মূল হেতু কি, সেই প্রমাণে গেলে দেখা যাবে প্রতিটি সমস্যার পিছনে কোন না কোন কর্মের প্রেরণা আছে।

অজ্ঞানের প্রসঙ্গটি ধরুন। মানুষ জানে না। কর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলে উনি বলবেন— মানুষ তা জানে না। এর মূল কারণ হল, জ্ঞানাবরণ কর্মের উদয়। ব্যক্তিটির চেতনাকে জ্ঞানের আবরণে প্রভাবিত করেছে, তা তার জ্ঞানের বিকাশ ঘটতে পারছে না।

মানবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত উত্তর দেবেন অন্য ভাবে। তিনি বলবেন— এই ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকশিত হয় নি, তাই তার জ্ঞানের বিকাশ কম। মানবশাস্ত্রে পণ্ডিত শরীরের আধারে কারণটিকে খুঁজবেন এবং কারণ-গুলিকে বিশ্লেষণ করবেন।

একটি প্রশ্ন ওঠে, কেন মস্তিষ্ক বিকশিত হয় নি? এর কোন কারণ তো নিশ্চই থাকবে। কারণ নিশ্চয়ই আছে। ঐ কারণ লুকোনো রয়েছে সূক্ষ্ম শরীরে। স্থূল শরীরে তা প্রকটিত হয় নি। ঐ ব্যক্তির জ্ঞানের আবরণের এমন প্রবল উদয় হয়েছে যে, জ্ঞানের সংবাহক অবয়ব তৈরি হয় নি বা হলেও তা অর্ধ-সমাপ্ত রয়েছে। জ্ঞানাবরণের কারণেই মস্তিস্ক বিকশিত হয়। অমনস্ক প্রাণীদের (Non Vergetta) পৃষ্ঠরজ্জু এবং মস্তিষ্ক নেই, সমনস্ক প্রাণীদের (Vergetta) উভয়ই থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষোক্তদের

সকলের বিকাশ সমান হয় না। জ্ঞানাবরণ বিলয়ের আধারেই ঐ তারতম্য ঘটে।

একটি লোক জানে। তার জ্ঞান আছে। কিন্তু সে করতে পারছে না। নিজে থেকেই অকর্মণ্য হয়ে যায়। কর্মশাস্ত্র বলে—এরও একটা কারণ আছে। ঐ কর্মই ঐ ব্যক্তির শক্তিকে বেঁধে রাখছে তাকে স্খলিত করছে। কর্ম শক্তিকে প্রতিহত করছে। তাতে অবরোধ তৈরি করছে। কর্মশক্তিতে তা সহযোগিতা করছে না, বাধা উৎপন্ন করছে।

ক্ষমতা দু রকমের

ক্ষমতা দু রকমের—যোগ্যাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক। যোগ্যাত্মক ক্ষমতা হল আত্মার গুণ। ক্রিয়াত্মক ক্ষমতা নিষ্পন্ন হয় আত্মা ও শরীরের যোগ থেকে। কর্মশাস্ত্রের ভাষায় যোগ্যাত্মক ক্ষমতাকে বলা হয় 'লব্ধিবীর্য' এবং ক্রিয়াত্মক ক্ষমতাকে বলা হয় 'করণবীর্য'। যে ব্যক্তির মধ্যে লব্ধিবীর্য নেই, শক্তির মূলত বিকাশ ঘটে না, সে কিছু করতে পারে না। অনেক কিছু সে করতে চায়, কিন্তু করতে পারে না। আবার যে ব্যক্তির লব্ধিবীর্য রয়েছে, অথচ করণবীর্য নেই, ক্রিয়াত্মক ক্ষমতা নেই, সে ব্যক্তি উপলব্ধি পেলেও কিছুই করতে পারে না। যার মধ্যে উভয়ই থাকে, কেবল সেই ব্যক্তিই কিছু করতে পারে।

মন এবং শরীরের যোগ

কর্মশাস্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুকে বুঝতে হলে আমাদের আত্মা ও শরীর, মন এবং শরীর—উভয়ের যোগকে ঠিকভাবে বুঝতে হবে। শরীরের ওপর মনের প্রভাব আছে, শরীরেরও প্রভাব আছে মনের ওপর। আত্মার ওপর শরীরের প্রভাব আছে, আবার শরীরেরও আত্মার ওপরে প্রভাব আছে। কেবল আত্মা বা শরীরের সাহায্যে আমাদের ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম যাবতীয় কাজ করা সম্ভব নয়। আত্মার যা মূলভূত কার্য, তা কেবল আত্মার সাহায্যে নিষ্পন্ন

হয়। ঐ কার্যগুলি হল—চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ, আনন্দের পূর্ণ বিকাশ, অর্থাৎ অনন্ত চৈতন্য, অনন্ত আনন্দ ও অনন্ত শক্তি প্রাপ্তি। সেই চৈতন্য যার একটি কণাও আবৃত হয় না, সেই আনন্দ যাতে কখনও বিকার উৎপন্ন হয় না, শোকলহরী যাতে কখনও আসে না, সেই অখণ্ড ও বাধাহীন আনন্দ, সেই বাধাহীন স্খলনহীন বন্ধনহীন শক্তি—এগুলি কেবল আত্মাতেই হতে পারে। কিন্তু যেখানে শরীর আছে, শরীরের দ্বারা চৈতন্য প্রকটিতে হচ্ছে, তা অখণ্ড হবে না। শরীরের মাধ্যমে প্রকটিত আনন্দও বাধাহীন হবে না। শরীরের মাধ্যমে প্রকটিত শক্তি অব্যাহত হবে না। মাধ্যমের দ্বারা যা প্রকট হয়, তা কখনও পূর্ণ হয় না। মাধ্যমের অর্থ হল, ক্র্যাচ। নিজের পা দিয়ে হেঁটে চলা মানুষটি যে শক্তিকে অনুভব করে, ক্র্যাচের সাহায্য নিয়ে পথ চলা মানুষটি সেই শক্তি কখনই অনুভব করতে পারে না। পায়ের শক্তি যার কম, তাকেই ক্র্যাচের সাহায্য নিতে হয়। পায়ের শক্তির যদি পুরোপুরি থাকে, তাহলে ক্র্যাচ নিরর্থক। মানুষও তেমনি মাধ্যমের সাহায্য নেয় তখনই যখন তার পূরকের প্রয়োজন পড়ে। চোখের শক্তি কম হয়েছে, তখন প্রয়োজন পড়ে চশমা লাগানোর। চশমা হল শক্তির পূরক। দৃষ্টিশক্তি যদি ঠিক থাকে তাহলে চশমার দরকার পড়ে না, মাধ্যমের প্রয়োজন পড়ে না।

আত্মার অভিব্যক্তির মাধ্যম হল শরীর। শরীরের মাধ্যমেই কেবল আত্মার শক্তিগুলি অভিব্যক্ত হয়। চৈতন্যের অভিব্যক্তি, আনন্দের অভিব্যক্তি, শক্তির অভিব্যক্তি—যাবতীয় অভিব্যক্তিগুলি হয় শরীরের মাধ্যম থেকে।

অভিব্যক্তির মাধ্যম

চৈতন্যের অভিব্যক্তির সাধন হল—ইন্দ্রিয়গুলি, মন এবং বুদ্ধি। আনন্দের অভিব্যক্তির মাধ্যম হল, অনুভূতি। শক্তির অভিব্যক্তির মাধ্যম হল শরীর। হাত-পা প্রভৃতি অবয়ব শক্তির অভিব্যক্তির

মাধ্যম। ইন্দ্রিয়গুলিও শক্তির অভিব্যক্তির মার্গ। শক্তি ছাড়া কিছুই হয় না। চৈতন্যের অভিব্যক্তিও শক্তি ছাড়া হতে পারে না। আনন্দের অভিব্যক্তিও শক্তি ছাড়া হতে পারে না। সকলের সঙ্গেই শক্তির মাধ্যম যুক্ত রয়েছে। সব অভিব্যক্তির মাধ্যম হল শরীর। এজন্যই শরীর মন কর্তৃক এবং মন শরীর কর্তৃক প্রভাবিত হয়। চৈতন্যের বিকাশ হয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক নেই, ইন্দ্রিয়ের যে আকার ও গোলক তৈরি হয়েছে তা ঠিক নেই, সুস্থ নেই, তাহলে চৈতন্যের শক্তি কোনই কাজে আসবে না, তার কোন উপযোগও হবে না, ফলে সেগুলি অনুপযুক্তই থেকে যাবে। আনন্দের বিকাশ ঘটলেও যদি অভিব্যক্তির মাধ্যম ঠিক না থাকে, তাহলে তা কার্যকর হবে না। শরীরও ঠিক থাকা দরকার, অনুরূপ হওয়া দরকার, ইন্দ্রিয়ের গোলকগুলি সুস্থ ও সক্ষম হওয়া দরকার, তবেই এতে শক্তি অভিব্যক্ত হতে পারবে, নইলে নয়। বিদ্যুতের প্রবাহ নিরন্তর গতিশীল থাকে। যদি বালব ঠিক থাকে, তাহলে তার অভিব্যক্তি ঘটবে, আলো জ্বলবে। কিন্তু যদি বালব ঠিক না থাকে, তাহলে বিদ্যুৎ থাকলেও তার অভিব্যক্তি ঘটবে না, প্রকাশ হবে না, অন্ধকার মিটবে না। মাধ্যম ঠিক থাকা দরকার, তবেই অভিব্যক্তি ঘটতে পারে।

নিমিত্তের মূল স্রোত : কর্ম

একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, শরীর মনকে প্রভাবিত করে এবং মন শরীরকে প্রভাবিত করে। শরীর যেমন প্রভাবের নিমিত্ত হয়, তেমনি মনও প্রভাবের নিমিত্ত হয়। কিন্তু নিমিত্তের মূল স্রোত হল কর্ম।

কেউ কেউ বলেন, পরিস্থিতির জন্য এরকম হয়। কিন্তু এতে আমরা অপবাদকেও পেয়ে থাকি। কখনও কখনও এমনও হয় যে, বাতাবরণ শান্ত, মন শান্ত, কোনই গোলমাল নেই, কিন্তু হঠাৎ মনে উদাস ভাবের উদয় হল, মন চিন্তায় ভরপুর হল, শোকাকুল হয়ে

উঠল। আবার কখনও মন হঠাৎ আনন্দে বিভোর হয়ে উঠল, উজ্জ্বলতা ফুটে পড়তে লাগল চারদিকে। এগুলি কারণযুক্ত হলে আমরা সহজেই সব কিছু বুঝতে পারি। কোন হাস্যকর ঘটনা যদি ঘটে, আর যদি হাসি পায় কিংবা চিন্তা উদ্রেককারী কোন ঘটনা ঘটার পর মন যদি চিন্তায় ভরে যায়, তাহলে তার কারণ আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু যদি অকারণে মনে হর্ষ বা বিষাদ উৎপন্ন হয়, তাহলে তা আমাদের খুবই আশ্চর্য করে। হর্ষ, বিষাদ, চিন্তা যা শোকের কোন প্রত্যক্ষ হেতু যখন দেখা যায় না তখন বিস্ময়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কর্মশাস্ত্র এই অহেতুক আবেগগুলি নিয়েও বিচার-বিবেচনা করেছে এবং এর সমাধান করতে গিয়ে বলেছে, নিমিত্ত পাওয়া গেলে বা পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে হর্ষ, ভয়, শোক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু কখনও কখনও ভয়-বেদনাযুক্ত কর্মের প্রবল উদয় হলে ঐ কর্ম-পরমাণুগুলি এমন প্রবলভাবে উদিত হয় যে, শোক বা চিন্তা সৃষ্টি হয়। শোক-বেদনাযুক্ত কর্ম পরমাণুগুলি যখন তীব্রভাবে উদিত হয়, তখন ব্যক্তি অকারণে ক্রুদ্ধ হয়। এই ধরনের ক্রোধকে বলা হয় 'অপ্রতিষ্ঠিত ক্রোধ'। এর অর্থ হল, অকারণে উৎপন্ন ক্রোধ। এর কোন প্রতিষ্ঠা নেই, কোন কারণ নেই, নিমিত্ত নেই। এর হেতু হল কেবল কর্মের উদয়ের প্রবলতা। ক্রোধ-বেদনার পরমাণুগুলি এমন প্রবলভাবে এক সাথে উদিত হয় যে, ব্যক্তি বসে বসেও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনেও আমরা এমন অবস্থাকে অনুভব করি।

অকারণ বা কার্য-কারণ এক

সব কিছুই কারণযুক্ত হয় না, অকারণেও অনেক কিছু হয়। অনেকান্ত—স্বীকৃতি অনুসারে প্রতিটি কারণের পেছনে বাহ্য কারণের অনিবার্যতা যে থাকতেই হবে এমন নয়। কখনও কখনও কারণ প্রচ্ছন্নও থাকে, পৃথক কারণও থাকে না। অর্থাৎ, সেখানে কার্য ও কারণ দুই নয়। হঠাৎ জেগে ওঠা ক্রোধে বাইরের কোন কারণ

থাকে না, তাতে কারণ নিজের ভেতরে সমাহিত থাকে। ক্রোধ-বেদনার উদয়ই ক্রোধের কারণ, এর অন্য কোন কারণ, পরিস্থিতি বা নিমিত্ত নেই। এমনও ব্যাপার ঘটে। কর্মশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার আলোচনায় আমরা পরিস্থিতিবাদকে সার্বভৌম সিদ্ধান্ত রূপে স্বীকার করতে পারি না। এটা নিমিত্তের অস্বীকার নয়, পরিস্থিতির অস্বীকার নয়। পরিস্থিতি যেমন হয়, মানুষ তেমনই হয়ে যায়—এ কথায় সত্য আছে বটে, কিন্তু তা পুরোপুরি সত্যি নয়। সাপেক্ষবাদের আধারে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন পুরোপুরি সত্যতা কোন একটা বিশেষ কথার মধ্যে আসতে পারে না। এগুলি সবই অপূর্ণ সত্য। পরিস্থিতিবাদ মিথ্যা নয়। কর্মবাদে পরিস্থিতির স্থান আছে, নিমিত্তেরও স্থান আছে। পরিস্থিতিই সব কিছু, বা পরিস্থিতিই মানুষকে তৈরি করে, বা আমাদের প্রত্যেক আচরণ বা ব্যবহার পরিস্থিতি কর্তৃক প্রভাবিত হয়েই সংঘটিত হয়, এমন চিন্তা ভ্রমাত্মক। যদি পরিস্থিতিবাদকে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করতে হয়, তাহলে তার চক্রকে কখনও ভাঙ্গা যাবে না, কখনই তা ছিন্ন হবে না। সে ঘুরতেই থাকবে অবহমান কাল ধরে। একটি প্রশ্ন ওঠে, যদি এই পরিস্থিতি-চক্রকে ছিন্ন করা না যায়, তাহলে কর্ম-চক্রকে কিভাবে ছিন্ন করা যাবে? সেটাও তো একটা চক্র। কারণ, প্রতিটি ঘটনার পেছনেই যদি কর্মের হাত থাকে এবং প্রতি ঘটনাই যদি কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয় বা প্রভাবিত হয়ে সংঘটিত হয় তাহলে কিভাবে এই কর্ম-চক্রকে ছিন্ন করতে পারা যাবে?

সব কিছুই কর্ম থেকে নয়

কর্মের স্বীকৃতিও চূড়ান্ত নয়। সব কিছুই কর্ম থেকেই ঘটিত হয়, এই স্বীকৃতি অনুচিত। সব কিছুই কর্ম দ্বারা হয় না। এমন স্থিতিও আছে যেগুলি কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয় না। ব্যক্তির সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

এক ব্যক্তির অনাদি কাল থেকে মিথ্যাদৃষ্টি রয়েছে। তার মিথ্যাদর্শন অনাদি। সে প্রতিটি তত্ত্বকেই মিথ্যা দৃষ্টিতে দেখে। সত্যের প্রতি তার দৃষ্টি সঠিক নয়। অনাদিকাল থেকে যখন এমন চলছে, তখন এই মিথ্যা-চক্রকে কিভাবে ভাঙ্গতে পারবেন? কিন্তু আত্মার মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে যা পরিপূর্ণভাবে কর্ম দ্বারা কখনই প্রভাবিত হয় না! কর্মের পুরো সাম্রাজ্যও যদি হয়ে যায় তাহলেও তা তাকে কখনই মেটাতে পারে না। তাকে ভাঙ্গতে পারে না। কর্মের সাম্রাজ্য, মোহের সাম্রাজ্য এজন্যই স্থাপিত হয় এবং ততক্ষণই এগুলি চলে যতক্ষণ আত্মা নিজের শক্তির প্রতি জাগ্রত না হয়, জানার ক্ষণ প্রাপ্ত না হয়।

কোন রাষ্ট্রে বিদেশী শাসন ততদিনই চলতে থাকে, যতদিন ঐ দেশের জনতা জাগ্রত না হয়। পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের ইতি-হাসেই এই ঘটনা ঘটেছে। বিদেশী শাসকবর্গ ততদিনই ঐসব দেশ শাসন করতে পেরেছে যতদিন ঐসব দেশের জনতা জেগে ওঠে নি কিংবা দেশের জনতাকে জাগ্রত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির উদয় না হয়েছে। জনতা যখনই জেগে উঠেছে বা জনতাকে জাগ্রত করতে সক্ষম ব্যক্তি, প্রাণের উদয় ঘটাতে সক্ষম ব্যক্তি দেশে আবির্ভূত হন, তখন বিদেশী শাসন আর চলতে পারে না, তার শেকড় নড়ে ওঠে নিজের সত্তা গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।

কাল: কর্ম দ্বারা অপ্রভাবিত

কালেরও একটি শক্তি আছে যা কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এক কাল আসে, একটি সময় আসে, একটি এমন মুহূর্ত আসে যখন কাললব্ধির ফলে আত্মা সহজ রূপে জেগে ওঠে। তাতে নিজের অস্তিত্বের প্রতি জাগরূকতার ভাব এসে যায়। ঐ সময়ে মিথ্যাত্ব এবং মোহের সাম্রাজ্য প্রথম বার কেঁপে ওঠে এবং ধীরে ধীরে তার মূল ছিন্ন হতে শুরু করে।

সব কিছুই যদি কর্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হত, যদি কর্মের পূর্ণ সত্তা হত,

কর্মের সার্বভৌম সাম্রাজ্য হত, তাহলে কখনই এই সাম্রাজ্যকে ছিন্ন করা যেত না। এ কথা যদি আমরা মনে রাখি যে, সব কিছুই পরিস্থিতির দ্বারা সম্পন্ন হয় না, তাহলে সব কিছুই যে কর্ম দ্বারা সম্পন্ন হয় না তা বোঝা যায়। এই পৃথিবীতে কেউ অখণ্ড সাম্রাজ্য বা একচ্ছত্র আসন লাভ করে না। সব কিছুরই অবকাশ আছে। কাললব্ধিরও অবকাশ আছে। এই কাললব্ধি দ্বারা কিছু বিশিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হয়।

ব্যবহার-রাশি : অব্যবহার-রাশি

অক্ষয়-কোষ থেকে বেরিয়ে বনস্পতির বিকাশশীল জগতে আসা—এটা একটা ঘটনা। প্রাণীজগতের দুটি রাশি আছে—একটি হল ব্যবহার রাশি, অপরটি হল অব্যবহার রাশি। অব্যবহার রাশি বনস্পতির এমন একটি সম্পদ যা কখনই সমাপ্ত হয় না। তাতে অনন্ত জীব থাকে। এই যে দৃশ্যমান জগৎ, এতে যত জীব আছে, সবই অব্যবহার রাশি থেকে বেরিয়ে আসে। এই রাশি হল সূক্ষ্ম জীবের রাশি। এগুলি অক্ষয় কোষ, কখনই শেষ হয় না। অনন্তকালেও শেষ হয় না।

দ্বিতীয় রাশি হল, ব্যবহার রাশি। এ হল স্থূল প্রাণীদের জগৎ। যে কোন জীবই মুক্ত হোক, সে মুক্ত হয় ব্যবহার রাশি থেকে। যে জীব অব্যবহার রাশিতে পড়ে আছে, সে কখনই মুক্ত হয় না। ওখান থেকে মুক্তির দিকেও আসতে পারে না। মুক্ত হবার জন্য তাকে ব্যবহার রাশিতে আসতে হয়। আমাদের চৈতন্যের যত বিকাশ হয়, তা ব্যবহার রাশিতেই হয়। অব্যবহার রাশিতে কারুর বিকাশ হতে পারে না। সেখানে একটি মাত্র ইন্দ্রিয়, একমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ই থাকে। এরা সবাই বনস্পতির জীব। এদের অনন্ত কোষ আছে। এর থেকেই জীব বেরিয়ে আসে, কিন্তু তা কখনই খালি হয় না। এখানে কেবল একটি ইন্দ্রিয়-চেতনার বিকাশ হয়,

আর কোন বিকাশ হয় না। মনের বিকাশ নয়, অন্য ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ নয়, বুদ্ধির বিকাশ নয়। কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় বা ত্বকের বিকাশ, প্রগাঢ় মূর্চ্ছা, প্রগাঢ় নিদ্রা। যা চৈতন্যপ্রাপ্ত, তার সূচক হল কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়, আর কিছু নয়।

কিছু জীব এই অব্যবহার রাশি থেকেই ব্যবহার রাশিতে আসে। কেন আসে, সেটা একটা প্রশ্ন। যদি কর্মই সব কিছু হতো, তাহলে সেখান থেকে তো সে ছাড়া পেত না। কিন্তু কাললব্ধি, কালশক্তির আধারে সে সেখান থেকে বেরিয়ে ব্যবহার-রাশিতে চলে আসে। কালের শক্তি অসীম। ঐ শক্তির ভিত্তিতেই সে ওখান থেকে বেরিয়ে আসে। যদি কর্মের ভিত্তিতে বের হতো তাহলে যেমন ভাবে আর দশটা জীব বেরোয়, সে ভাবেই শত-হাজার জীবও বেরিয়ে আসতে পারত। লক্ষ, কোটি জীবও বের হতে পারত। অনন্তও বেরিয়ে আসত। কিন্তু তারা কর্মের শক্তি থেকে বেরোয় না। বেরোয় কালের শক্তি থেকে, কাললব্ধি থেকে।

ব্যবহার রাশির জীবের দুটি শ্রেণী আছে—একটি হল, কৃষ্ণপক্ষ, অপরটি শুক্লপক্ষ। কিছু জীব হল কৃষ্ণপক্ষসহ, আবার কিছু হল শুক্ল-পক্ষসহ। চাঁদের যেমন দুটি পক্ষ হয়, কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ, কালো এবং সাদা, তেমনি আমাদের জীবনে দুটি পক্ষ থাকে—কৃষ্ণ এবং শুক্ল—কালো এবং সাদা। কৃষ্ণপক্ষ হল আমাদের মন্দ কর্মের সূচক, তমসাবৃত বৃত্তিগুলির সূচক। আর শুক্লপক্ষ হল আমাদের বিকাশের সূচক, বন্ধনমুক্তির এবং অগ্রসর হওয়ার সূচক।

কৃষ্ণপক্ষে যে ব্যক্তি থাকে, সে আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটাতে পারে না। যিনি শুক্ল পক্ষে আছেন, তিনিই কেবল আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটাতে পারেন। তাঁর বাতাবরণ, 'অরা' বা আভামণ্ডল, পর্যাবরণ—সবই শুক্ল হয়ে যায়। ঐ ব্যক্তির আশেপাশে শুক্লতার একটা আবরণ ঘিরে ফেলে। আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে অগ্রসর হয় সে। তাঁর বিকাশ শুরু হয়ে যায়।

একটা প্রশ্ন ওঠে, একটি জীব কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্লপক্ষে কেন আসে? এর কোন হেতু নেই। কর্ম একমাত্র কারণ নয়। কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্লপক্ষে আসার কারণ হল, কাললব্ধি। কালের শক্তিতেই এমন হয়।

স্বভাব: কর্ম দ্বারা অপ্রভাবিত

পরিস্থিতির যেমন একটি শক্তি আছে, কালেরও তেমন একটি শক্তি আছে। একইভাবে স্বভাবেরও একটি শক্তি আছে, যার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিকাশের স্বভাব দেখা যায় না। তার চৈতন্য তো আছে, কিন্তু চৈতন্যের বিশিষ্ট বিকাশের ক্ষমতা তার নেই। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, কেন তা হয় না। এর কোন উত্তর দেওয়া যায় না। কর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতেও এর কোন সমাধান নেই। এর একটি মাত্র উত্তর বা সমাধান হতে পারে যে, ঐ জীবগুলির স্বভাবই এমন যে তারা চৈতন্যের বিকাশ ঘটাতে পারে না। তার মধ্যে চৈতন্যের বিকাশ ঘটতে পারে না। এটি স্বভাবেরও শক্তির উদাহরণ। কালের যেমন নিজ শক্তি আছে স্বভাবেরও তেমনি নিজস্ব শক্তি আছে। পরিস্থিতির যেমন নিজস্ব শক্তি আছে, তেমনি কর্মেরও নিজস্ব শক্তি আছে।

কর্ম সার্বভৌম সত্তা নয়

এই আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, কর্মের সাম্রাজ্য সার্বভৌম নয়। যা কিছু হচ্ছে, সব কর্মের মাধ্যমেই হচ্ছে—এই ধারণাকে আমাদের বাদ দিতে হবে। কর্মের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করাই মিথ্যা দৃষ্টিকোণ। কর্ম থেকে সব কিছু হয় না, এটাই সত্যি। যে যে ঘটনা কর্ম দ্বারা হওয়ার যোগ্য, যা কর্মের সীমায় আসে, তা-ই কর্মের দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু সব ঘটনাই কর্ম দ্বারা সংঘটিত হয় না। এখন একটা কথা খুব চালু হয়েছে: কি করব ভাই, এমন কর্ম করেছিলাম! কর্মের এমনই যোগ ছিল! প্রতিটি ঘটনার

সঙ্গেই, তা শুভ বা অশুভ হোকে, ভাল বা মন্দ হোক, এই ব্যাখ্যাই আমরা দিই যে, কর্মের জন্যই তা হয়েছে। কর্মের প্রভাব ও প্রতাপ তাতে রয়েছে, নইলে এমন হতো না। এটা ভুল, বিরাট ভুল। কারুর হাতেই আমরা একাধিকার সঁপে দেব না। প্রকৃতির সাম্রাজ্যে অধিনায়কতাবাদ নেই। জাগতিক নিয়মে কেউ অধিনায়ক বা অধিনিয়ন্তা হয় না। সেখানে কারুরই একচ্ছত্র অধিকার নেই। কালের মধ্যে, কিছু স্বভাবের মধ্যে, কোন কোন পরিস্থিতি এবং কর্মের মধ্যে কিছু শক্তি নিহিত রয়েছে। কিছু শক্তি নিহিত রয়েছে আমাদের পুরুষার্থের মধ্যে। এই পুরুষার্থের কর্মকে বদলে দেবার শক্তিও আছে। আমাদের শক্তির প্রতীক হল পুরুষার্থ। আবার, পুরুষার্থ হল আমাদের ক্ষমতার প্রতীক। আমরা এর দ্বারা কর্মকেও বদলে দিই। কর্মশাস্ত্রেও একটি নিয়মে বলা হয়েছে, কর্মকে বদলানো যায়। একচ্ছত্র অধিকার কারুরই নেই। সকলের এখানে মিলিত অধিকার। একচ্ছত্র অধিকার নয়, যাবতীয় অধিকার বিভক্ত হয়ে রয়েছে।

কর্মই যদি সব কিছু হতো, কর্মই যদি একচ্ছত্র অধিকার পেত, তাহলে কোন প্রাণীই অব্যবহার-রাশি থেকে ব্যবহার রাশিতে আসতে পারত না, অবিকশিত প্রাণী থেকে বিকশিত প্রাণীর শ্রেণীতে আসাও সম্ভব হতো না।

কর্মই যদি সব কিছু হতো তাহলে সাধনার অযোগ্য স্থিতি থেকে বা নিজের অবিকশিত চৈতন্যের ভূমিকা থেকে, আধ্যাত্মিক চেতনার বিকশিত ভূমিকায় আনা যেত না।

কর্মই যদি সব কিছু হতো তাহলে প্রাণী বন্ধন ছিন্ন করে কখনই মুক্ত হতে পারত না।

কর্ম সব কিছু নয়। কর্মের বাইরেও অনেক তত্ত্ব থাকে যা নিজের সীমায় কার্যকরী হয়।

অব্যবহার-রাশি থেকে ব্যবহার-রাশিতে আসা, অ-বিকাশ থেকে বিকাশের পথে আরও এগিয়ে যাওয়া, চৈতন্যের অবিকশিত ভূমিকা থেকে ঘটিয়ে উর্ধ্বারোহণের মাধ্যমে বিকশিত ভূমিকায় আসা, বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির পথে আরও এগিয়ে যাওয়া, আববণ থেকে অনাবরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া, পরমুখাপেক্ষিতার শৃঙ্খলকে ছিন্ন করে স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন কাললব্ধির সম্পূর্ণ পরিপাক হয়। নইলে প্রশ্ন যেমন ছিল তেমনই থাকবে: একশত ব্যক্ত যদি মুক্ত হতে পারে, তাহলে সব কিছুই মুক্ত হবে না কেন? সবই মুক্ত হতে পারে। সব কিছুরই মুক্ত হওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু সব কিছুই মুক্ত হতে পারে না। যার কাললব্ধি পরিপক্ক হয়েছে, সে-ই কেবল মুক্ত হতে পারে। শেষ কাললব্ধির পরিপাকের প্রতীক্ষা আমরা করি। এর সবটাই পুরুষকারের সাহায্যে হয়, এমন নয়। আবার সব কিছুই কর্ম দ্বারা হয়, এমনও নয়।

কর্মের সাম্রাজ্য একচ্ছত্র নয়, এজন্যই কর্মের ব্যূহকে ছিন্ন করা সম্ভব হয়। মোহের সাম্রাজ্যও একচ্ছত্র নয়, তাই মোহের চক্রব্যূহও ছিন্ন করা যায়।

ভিন্ন কর্ম: ভিন্ন প্রভাব

আমাদের জীবনে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে তা হল, মোহ কর্ম। একদিকে হল অজ্ঞান, অন্যদিকে মোহ—জীবনের এই দুই হল প্রভাবকারী তথ্য। জ্ঞানাবরণ কর্মের জন্য আমরা সত্যকে জানতে পারি না। অন্তরায় কর্মের জন্য আমরা শক্তিকে ব্যবহার করতে পারি না, আবার দর্শনাবরণ কর্মের জন্য সঠিকভাবে সত্যকে দেখতে পাই না। মোহ কর্মের জন্য জানা, দেখা এবং শক্তি-সামর্থ্যের উপযোগ করতে থাকা সত্বেও সঠিক আচরণ করা যায় না।

দৃষ্টিতে কোন বিকার উৎপন্ন হলে তা মোহ কর্মই সম্পন্ন করে।

আচরণের বিকৃতি হয় মোহ-কর্মের জন্যই। মোহ-কর্ম হল কেন্দ্রীয় কর্ম। আগম সূত্রে একে বলা হয়েছে সেনাপতি। সেনাপতির মৃত্যু হলে সেনারা যেমন পালিয়ে যায়, ঠিক তেমনি মোহ কর্ম নষ্ট হয়ে গেলে শেষের সমস্ত কর্মও ছিন্ন হয়ে যায়। মোহকে সহযোগিতা করে দুটি জিনিস। একটি হল, মমকার এবং অপরটি হল, অহংকার। এরা হল দুই সেনানী।

মমকার

অনাত্মীয় বস্তুগুলিতে আত্মীয়তার অভিনিবেশ হল মমকার। যা আত্মীয় নয়, তাতে আত্মীয়তার ভাব রাখাই হল মমকার। যেমন—আমার শরীর, আমার বাবা, মা, আমার ভাই, আমার বোন, আমার পুত্র। সবচেয়ে আগে মমকার দেখা দেয় শরীরের প্রতি। এটিই হল সবচেয়ে কাছের। এর পর দেখা দেয় পিতা, মাতা প্রভৃতির প্রতি। এরা হল দু নম্বরে। তৃতীয় নম্বরে আসে—আমার ঘর, আমার চাকর, আমার ধন, আমার হাতি, আমার উট, আমার ঘোড়া। এগুলির প্রতিও মমকার হয়। এই মমকার আবার বাড়তে বাড়তে এত বেড়ে ওঠে, এর সীমা এমন বিস্তৃত হয়ে যায় যে, হাজার হাজার জিনিস এসে যায়। সীমার বিস্তারের কোন অন্ত আসে না।

অহঙ্কার

কর্ম প্রভৃতি কারণে প্রাপ্ত অবস্থায় 'আমি'কে স্বীকার করে নেওয়াই হল অহঙ্কার। যা 'আমি' নয়, আত্মা নয়, তাকে আত্মা স্বীকার করা হল অহঙ্কার। অনাত্মীয়কে আত্মীয় বলে মেনে নেওয়া যেমন 'মমকার', তেমনি অনাত্মকে আত্মা বলে মেনে নেওয়া 'অহঙ্কার'। যেমন—আমি ধনী, এখন ধনই বা কে, আর আমিই বা কে ? যা আত্মীয় নয়, তাকেই আত্মীয় বলে মেনে নেওয়া হয়। এসব অবস্থা বৈভাবিক, নানা কারণে এগুলি তৈরি হয়। আমি

কখনও বলি, 'আমি রোগগ্রস্ত', আবার কখনও বলি, 'আমি সুস্থ।' ঐ রোগগ্রস্ত হওয়া যেমন 'আমি' নয়, সুস্থ হওয়াও তেমনি 'আমি' নয়। প্রসন্ন হওয়াও 'আমি' নয়, আবার অপ্রসন্ন হওয়াও 'আমি' নয়। আমি ধনী, আমি নির্ধন, আমি প্রসন্ন, আমি অপ্রসন্ন, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি বড়, আমি ছোট—এ সবই হল অহঙ্কার। আত্মা বড় নয়, ছোটও নয়। কিন্তু অহঙ্কারের জন্য এসব আছে, চলতে থাকে। দৃষ্টিকোণ এবং আচরণ—উভয়ের মধ্যে বিকৃতির বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে।

১৪

আবেগ ঃ উপ-আবেগ

- আবেগ এবং উপ-আবেগ।
- আবেগের চারটি স্থিতি—তীব্রতম, তীব্রতর, মন্দ এবং মন্দতর।
- চার অবস্থার ক্ষয়ে বীতরাগতা প্রাপ্তি। দুটি মার্গ—প্রথমটি হল, মোহের প্রবলতার—আধ্যাত্মিক চেতনা মূর্ছিত।
হল, মোহের বিলীন হওয়ার—আধ্যাত্মিক চেতনা বিকশিত।

আবেগ এবং প্রভাব

মানসশাস্ত্র অনুসারে আবেগ হল ছটি—ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, শোক, প্রেম এবং ঘৃণা। জীবনে আবেগের প্রভাব অনেক। মানবিক যাবতীয় আচরণের ব্যাখ্যা আবেগের আধারেই করা হয়ে থাকে। কোন্ ধরনের স্থিতি তৈরি হয়, তা স্পষ্ট। কোন ব্যক্তি যদি ঘুষি তোলে, তাহলে আমরা বুঝতে পারি তার রাগ হয়েছে। আবেগের আগমনে এক ধরনের স্থিতি তৈরি হয়, অনুভূতি আসে। স্নায়ুতন্ত্রের ওপরে, পেশীগুলির ওপরে তার প্রভাব পড়ে। এক ধরনের উত্তেজনায় অনুরূপ সক্রিয়তা আসে। পেশীগুলি এই অনুসারে কাজ করতে শুরু করে। আবেগের প্রভাব পড়ে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে, পেশীগুলিতে, রক্তে, রক্তপ্রবাহে, ফুসফুসে, হৃৎপিণ্ডের গতিতে, শ্বাসে এবং গ্রন্থিগুলির ওপরে।

ভয়ের আবেগ এলে স্নায়বিক তরঙ্গ ওঠে। মস্তিষ্ক পর্যন্ত তা

খবর নিয়ে যায়। উত্তেজনা তৈরি হয়। রেচন-তন্ত্রকেও তা প্রভাবিত করে। হজমশক্তিকে প্রভাবিত করে। ঐ শক্তি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। উত্তেজনা পৌঁছে যায় মাংসপেশীগুলিতে। তারাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির স্রাব ক্ষরণের পরিমাণ বাড়ে, সেই কারণে ব্যক্তির মধ্যে বীরত্বপূর্ণ কিছু কাজ করার ক্ষমতা জাগ্রত হয়। সে সাহসী হয়ে উঠে কাউকে প্রহার করার অবস্থাতেও এসে পৌঁছয়। এ সব শারীরিক পরিবর্তনই সংঘটিত হয় আবেগের কারণে, কিন্তু বাইরে থেকেও তার লক্ষণগুলি প্রতীয়মান হয়ে ওঠে, যে কারণে আমরা মানুষটিকে দেখে বুঝে নিতে পারি সে ভয় পেয়েছে বা রেগে উঠেছে। আবেগের জন্য শারীরিক ক্রিয়ায় রাসায়নিক পরিবর্তন, শারীরিক লক্ষণগুলিতে পরিবর্তন এবং অনুভূতিতে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এ সব কথার সঙ্গে কর্মশাস্ত্রের একটি কথাও জুড়ে দিতে হয়। আবেগের কারণে অনেক কথাই হয়। এর সঙ্গে একটি কথা আগে জুড়ে দিন এবং পরে একটি কথা জুড়ে দিন। প্রথমে এ কথা জুড়ে নিন যে, ভয় পরিস্থিতি থেকে উৎপন্ন হয় না, পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়। উৎপন্ন হওয়া এবং উদ্ভূত হওয়া দুটি পৃথক কথা। পরিস্থিতি থেকে ভয় উদ্ভূত হল, জাগ্রত হল, যা নিদ্রিত ছিল তা জেগে উঠল। কিন্তু তা উৎপন্ন হল মোহের কারণে। ভয় উৎপন্ন হয় ভয়-বেদনা-মোহের কারণে। ঐ ব্যক্তির মধ্যে পরমাণুগুলি এমনভাবে সঞ্চিত থাকে যা কোন নিমিত্তের সাহায্য পেয়ে উৎপন্ন হয়। এ হল প্রথম সংযোগকারী কথা। এর পরে আর একটি কথা যুক্ত করুন। যে ভয় পায়, সে ভয়ের কারণে কেবল শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনই ঘটায় না, অপরাপর পরমাণুগুলিকেও সংগ্রহ করতে শুরু করে এবং সেই পরমাণু সংগ্রহের মাত্রা এত বেশি হয় যে মোহ অধিক পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

আবেগ ও উপ-আবেগ

কর্মশাস্ত্রে মোহনীয় কর্মের প্রসঙ্গে চারটি আবেগকে মানা

হয়েছে—ক্রোধ, মান, মায়া এবং লোভ। এদের বলা হয় 'কষায় চতুষ্টয়'। এই চারটি হল মুখ্য আবেগ। এ ছাড়া কিছু উপ-আবেগ আছে, তাদের সংখ্যা সাত বা নয়—হাস্য, রতি, অ-রতি, ভয়, শোক, ঘৃণা এবং বেদ। এই সাত অথবা নয় বেদকে স্ত্রীবেদ, পুরুষবেদ এবং নপুংসকবেদে যদি আমরা বিভক্ত করে নিই, তাহলে উপ-আবেগের সংখ্যা দাঁড়ায় নয়। এদের 'নয় কষায়' বলা হয়। এরা পুরোপুরি কষায় নয়। কষায়ের কারণে হয় 'নয় কষায়', মূল আবেগগুলির কারণে হয় উপ-আবেগ।

প্রশ্ন উঠবে, ঈর্ষা করা, আদর দেওয়া ইত্যাদি আবেগ কিনা। কর্মশাস্ত্রেও এগুলিকে আবেগ রূপে স্বীকার করা হয় নি। মানসশাস্ত্রেও আবেগরূপে এগুলি স্বীকৃত হয় না। মানসশাস্ত্রীয় পরিভাষায় ঈর্ষা প্রভৃতি মূল আবেগ নয়। এগুলি সংমিশ্রণ বা মিশ্রিত আবেগ। এতে অনেকগুলি আবেগের একত্র মিশ্রণ ঘটে, কিন্তু এগুলি মূল নয়। কর্মশাস্ত্রীয় পরিভাষা অনুসারেও এগুলি মিশ্রিত আবেগ, মূল নয়। ঐ অনুসারে মূল আবেগের সংখ্যা চার এবং উপ-আবেগের সংখ্যা সাত বা নয়।

ক্রোধ, মান, মায়া এবং লোভের মত উপ-আবেগগুলি অতটা তীব্র নয়। এদের মধ্যেও অনেক তারতম্য আছে। আমাদের দৃষ্টিকে, আমাদের চরিত্রকে এই মোহ-পরিবারই প্রভাবিত করে। যেমন দৃষ্টি, তেমন সৃষ্টি। যেমন দৃষ্টিকোণ, তেমন আচার। আচার এবং দৃষ্টিকোণের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ আছে। দৃষ্টিকোণ বিকৃত হলে আচার বিকৃত হয়। দৃষ্টিকোণ সম্যক হলে আচার সম্যক হয়। তা সম্যক হবার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। এমন তো হয় না যে, দৃষ্টিকোণ হবার সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় আচারও সম্যক হয়ে গেল। আচারের ক্রমিক বিকাশ হয়। আগে দৃষ্টিকোণ সম্যক হবে, তারপর আচার সম্যক হবে।

বৌদ্ধিক বিকাশ : আধ্যাত্মিক বিকাশ

যিনি ভৌতিক জীবন যাপন পছন্দ করেন, কেবলমাত্র তিনিই বৌদ্ধিক বিকাশের কথা চিন্তা করেন এবং বৌদ্ধিক বিকাশকে সবচেয়ে ওপরে স্থান দেন। যিনি আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের কথা চিন্তা করেন। আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের কথা চিন্তা করেন না। তাঁরা বৌদ্ধিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেও তাকে সর্বোচ্চ স্থান দেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনের পরম সাধ্য উপলব্ধ হয় না, তাকে পাওয়াও সম্ভব হয় না।

আমরা দেখি, অনেক বড় বড় বিদ্বান মানুষও খুবই অশান্ত। তাঁরা প্রতাড়িত এবং অশান্ত জীবন যাপন করেন। তাঁরা জ্ঞানী। জ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মন শান্ত নয়, অনেক সমস্যারই সমাধান তাঁরা করতে পারেন না, সমস্যার সমাধানও তাঁদের কাছে নেই। কেন এমন হয় ? এর একমাত্র কারণ, তাঁর মধ্যে বিদ্যার বিকাশ হয়েছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ হয় নি। কেবল বৌদ্ধিক চেতনা তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছে। যদি কেবলমাত্র চেতনার বিকাশ হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনা অবিকশিত থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, জীবনের পক্ষে তা খুবই বিপজ্জনক। সঙ্কট এবং ভয়ের এটি হল সবচেয়ে বড় বিন্দু।

বৌদ্ধিক চেতনার বিকাশের সম্বন্ধ রয়েছে মস্তিষ্কের সঙ্গে। মস্তিষ্কের শক্তি যদি প্রখর হয় তাহলে বৌদ্ধিক ক্ষমতা জেগে ওঠে। কর্মশাস্ত্রের ভাষায়, বৌদ্ধিকতার বিকাশ ঘটে জ্ঞানাবরণ কর্মের ক্ষয়োপশম থেকে। জ্ঞানের আবরণ যত অপসৃত হতে থাকে, বৌদ্ধিক ক্ষমতা ততই বিকশিত হতে থাকে। আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ হয় মোহ কর্মের বিলয় থেকে। কর্মশাস্ত্রের ভাষায় বলা হয়, মোহ কর্ম যখন উপশান্ত হয়, ক্ষীণ হয়, তখনই আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ হয়। আধ্যাত্মিক বিকাশের সম্পূর্ণ গাঁথা মোহকর্মের বিলয়ের সঙ্গে

যুক্ত রয়েছে। মোহ হলে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ হতে পারে না। তা তিনি যত বড় বিদ্বান হোন, বৈজ্ঞানিক হোন বা অন্য কিছু হোন।

বৌদ্ধিকতাসম্পন্ন বিরাট মানুষরা আত্মহত্যা করে নিজের প্রখর বৌদ্ধিক জীবনলীলা সমাপ্ত করেন। তাঁদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়। এই দ্বন্দ্বকে তাঁরা সমাহিত করতে পারেন না। এক সামান্য মানুষের যে মানসিক সমস্যা দেখা দেয়, তার সব কিছুই এক বিরাট বৌদ্ধিকতা-সম্পন্ন মানুষের মধ্যে হতে পারে। ঐ সমস্যাগুলি তাঁদের আলোড়িত করতে থাকে, তাঁদের আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে কারণ বৌদ্ধিক চেতনা তাঁদের মধ্যে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনা সুপ্ত রয়ে গিয়েছে, বিকশিত হয় নি, জাগ্রত হয় নি। আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণ যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ সমস্যাগুলির ব্যূহ ছিন্ন করতে পারা যায় না। তার প্রবাহকেও বন্ধ করা যায় না।

বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক, এই দুয়ের বিকাশে আমাদের জীবনে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত তৈরি হয়। এই দুয়ের সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। এই দুয়ের সমন্বয়ই হল জীবনের সর্বোচ্চ বিকাশ। আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের জন্য মোহকে অনুধাবন করা খুবই প্রয়োজন।

আবেগের তারতম্য ঃ চৈতন্য-বিকাশের বোধ-চক্র

মোহের মূল হল রাগ এবং দ্বেষ। রাগ এবং দ্বেষের সাহায্যে একটি চক্র ঘুরছে। ঐ চক্র হল আবেগ এবং উপ-আবেগের। রাগ-দ্বেষ আছে, এজন্য ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ—এই চার মূল আবেগ উৎপন্ন হয়। রাগ-দ্বেষ আছে, এজন্যই হাস্য, রতি, অ-রতি, ভয়, শোক, ঘৃণা, কাম-বাসনা প্রভৃতি যাবতীয় উপ-আবেগগুলি উৎপন্ন হয়। এ সবেরই মূলে রয়েছে রাগ ও দ্বেষ। আবেগের পৃষ্ঠভূমিতে এই দুই অনুভূতি কাজ করে। যতক্ষণ এই অনুভূতিগুলি থাকে, ততক্ষণ আবেগ এবং উপ-আবেগের উৎপত্তি বন্ধ করা যায় না। এই

চক্র ঘুরতে থাকে। কখনও একটি আবেগ উৎপন্ন হল তো কখনও অন্য আবেগ। একথা ঠিক, পরিস্থিতিগুলি এদের উৎপত্তিতে নিমিত্ত হয়, বাতাবরণও নিমিত্ত হয়। আবেগের তারতম্য সমগ্র আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের বোধ-চক্র। কষায় চতুষ্টয়, অর্থাৎ ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভের তারতম্যের প্রথম প্রকার হল, অনন্তানুবন্ধী। অনন্তানুবন্ধী অনন্ত অনুবন্ধ সৃষ্টি করে, এত বংশধর সৃষ্টি করে যার অন্ত নেই। বংশধরের পর বংশধর। এই ক্রম প্রায় ভাঙ্গেই না, বা ভাঙ্গলেও খুব কষ্টে ভাঙ্গে। যে আবেগ নিরন্তর বংশধর উৎপন্ন করে, বা যার বংশধর উৎপাদনের ক্ষমতা অটুট, তাকেই বলা হয় অনন্তানুবন্ধী। কখনও এমন হয় যে, কোন একটা ঘটনা ঘটল। তার প্রভাব পড়ল, কথা সমাপ্ত হল। এমনও হয় যে ঘটনা ঘটল, মনে বিচার এল এবং ঐ বিচারের শৃঙ্খল এত দীর্ঘ হল যে, ঐ মূল বিচার থেকে অনেক ছোট-বড় বিচার উৎপন্ন হতে লাগল। একের পর এক বিচার আসতে লাগল। তাদের শৃঙ্গলাও ভঙ্গ হল না। এই প্রাথমিক বিচার এমন বংশধর তৈরি করতে লাগল যে, তা কখনই সমাপ্ত হয় না। এই হল অনন্তানুবন্ধী।

এমন অনেক কীটাণু আছে যারা প্রচুর বংশধর তৈরি করে। তাতে খুব বড় জাল তৈরি হয়ে যায়। ঐ জাল অনেক বড়, কীটাণুগুলি বংশধর সন্তান তৈরি করে যেতে থাকে, কোথাও থামে না।

গ্রন্থিপাতের ক্রমপ্রর্যায়

এভাবে যে আবেগের বংশধর ক্রমেই বেড়ে চলে, সেই তীব্রতম আবেগ আমাদের দৃষ্টিকোণকে প্রভাবিত করে। ঐ আবেগ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সম্যক দৃষ্টিকোণ হতে পারে না। কারণ মূর্চ্ছা এমন সঘন হয় যে, প্রথম মূর্চ্ছা দ্বিতীয়কে, দ্বিতীয় তৃতীয়কে তৃতীয়, চতুর্থ মূর্চ্ছাকে ক্রমাগত উৎপন্ন করে যেতে থাকে। এর কখনও অন্ত হয় না। সম্যক দেখার অবসরও আমাদের মেলে না। একের পর এক

ত্রুটি আসতে থাকে এবং দৃষ্টিতে ভ্রম উৎপন্ন হয়। এই প্রখরতম আবেগ আমাদের দৃষ্টিকে বিস্মৃত করে।

আবেগের তারতম্য এবং ফলিত

এই হল গ্রন্থিপাতের ক্রমপর্যায়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তখন তা সহজে যায় না। শিলাখণ্ডে যেমন ফাটল হয়। বলা হয়, আবেগ যখন প্রবল হয়, তখন গ্রন্থিপাত ঘটে। আবেগ এলে আর যায় না। ক্রোধ অনন্তানুবন্ধী হয়, শিলায় একবার ফাটল হলে তা আর বোঁজে না। তা অখণ্ড হয়ে যায়। বালির ওপর একটা রেখা টানা হল, আর একটা রেখা টানা হল জলের ওপর। জলে টানা রেখা তখুনি মিলিয়ে যায়, মাটির রেখাও কঠিন পদার্থের ওপর মিলিয়ে যায়, কিন্তু তা শিলাখণ্ডের ফাটলের মত কঠিন হয় না। আবেগেরও ঐ চার স্থিতি বা অবস্থা হয়—তীব্রতম, তীব্রতর, মন্দ এবং মন্দতর। কর্মশাস্ত্রের ভাষায় এর চারটি নাম আছে—

তীব্রতম—অনন্তা
তীব্রতর—অপ্রতাখ্যানী
মন্দ—প্রত্যাখানী
মন্দতর—সংজ্বলন

প্রথম কোটির আবেগ হয় দৃঢ়তম। ঐ অবস্থায় রাগ-দ্বেষের গ্রন্থিটি এমন কঠিন হয় যে তাতে সম্যক্ দৃষ্টি পাওয়া যায় না। সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবার অবস্থাও তৈরি হয় না। তার উদয়ে ভৌতিক জীবন এমন মূর্চ্ছাময় ও প্রগাঢ় নিদ্রালু হয়ে যায় যে, ব্যক্তি সত্যকে দেখার কোন চেষ্টাই করে না, জাগরণের বিন্দুতে পৌঁছবার চেষ্টাও করতে পারে না। জীবনে কেবল মূর্চ্ছাই ব্যাপ্ত হয়। দৃষ্টি হয়ে পড়ে মূর্চ্ছিত। যথার্থ খুঁজেও পায় না। ঘুম-ঢুলুঢুলু চোখে মানুষ ঠিক দেখতে পায় না, নেশাচ্ছন্ন হয়ে সঠিকভাবে দেখতে পায় না, যথার্থ সম্বন্ধে কোন বোধও হয় না, কারণ সে তখন

মত্ত, সুপ্ত। যতক্ষণ আবেগের এই অবস্থা চলতে থাকে, রাগ-দ্বেষের গ্রন্থিটি থাকে তীব্র, ততক্ষণ সত্যের দর্শন লাভ হয় না। সম্যক দর্শন সে প্রাপ্ত হয় না। লাভ করে মিথ্যা দৃষ্টি। তার দর্শনও হয় মিথ্যা। তত্ত্বের হয় বিপর্যয়। জীবনে কেবল বিপর্যয় হতে থাকে। এই তীব্র আবেগের ফলে এমন রাসায়নিক প্রক্রিয়া তৈরি হয় যে, তা ব্যক্তিটির চিন্তা ও মননশক্তিকে বিকৃত করে দেয়। চিন্তা ও মনন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঐ আবেগের তীব্রতা যখন কম হয়, যখন তার পরিশোধন হয় তার অনুভব হয়, ক্ষীণ হয়, তখন দ্বিতীয় অবস্থা (অপ্রত্যাখ্যান) আসে।

অনন্তানুবন্ধী অবস্থার বিলয় ঘটলে দৃষ্টিকোণ সম্যক হয়ে যায়। সাধনার এই হল প্রথম ভূমিকা। আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশেরও এই হল প্রথম ভূমিকা। কর্মশাস্ত্রের ভাষায় এই ভূমিকার নাম হল—সম্যক দৃষ্টি গুণস্থান। সত্যকে সত্য বলে জানার এই হল ভূমিকা। এখানে অতত্ত্বে তত্ত্বের বুদ্ধি থাকে না। অসত্যে সত্যের ভাব থাকে না। ব্যক্তি যে যেমন, সে তেমন জানতে থাকে। তার দৃষ্টি সম্যক হয়ে যায়। সত্য উপলব্ধ হয়ে যায়।

আবেগের দ্বিতীয় অবস্থা বিদ্যমান থাকলে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের জন্য যে পিপাসাকে মেটানো প্রয়োজন, যে পিপাসা থেকে দূরে থাকতে চাই, যে পিপাসাকে বোঝাতে চাই, সেই অনন্ত পিপাসা কিন্তু মেটে না। এই হল পিপাসা এবং এই পিপাসাকে যে মেটানো যায় না, এই বোধটি যথার্থ হয়। যতই পান করুন, ঐ পিপাসা মিটবে না। যত পান করবেন, ততই যেন ঐ পিপাসা প্রজ্জ্বলিত থাকে। কিছুতেই তা নেভে না। নেভানোরও কোন পথও পাওয়া যায় না, কারণ তখন আবেগের দ্বিতীয় অবস্থা বিদ্যমান থাকে। ঐ অবস্থাই পথ প্রাপ্ত হতে দেয় না। তাতেই প্রভাবিত হয়ে ব্যক্তি পিপাসা মেটানোর পথকেই স্বীকার করে না। আবেগের এই গ্রন্থি তাকে তা করতে দেয় না। ঐ গ্রন্থির যে স্রাবক্ষরণ হয়,

তা-ই পিপাসা মেটানোর রাস্তায় মানুষকে চলতে দেয় না। এমন চেতনা তৈরি হয় যে ব্যক্তি তা জানার চেষ্টাও করতে পারে না।

অনেক বার আমি মানুষকে বলতে শুনেছি, অমুক পথ খুব ভালো। কিন্তু ঐ পথে আমরা চলতে পারি না। ধ্যান খুব ভালো, কিন্তু আমরা তা করতেই পারি না। নিষ্কর্মা হয়ে কে বসবে? কাজ অনেক, ব্যস্ততা খুব। ধ্যান করার ইচ্ছাই হয় না। সাধনা করি, এমন ইচ্ছাও হয় না। খানিকটা নিবৃত্তির বাসনাও হয় না। যদিও ধ্যান একটি প্রবৃত্তি, সাধনাও একটি প্রবৃত্তি, তবু তাতে মন লাগে না। যে কাজ আমরা দিনরাত করি, মন সেই প্রবৃত্তিতেই লাগতে চায়। এরও পেছনে কারণ আছে। মূল কারণ হল, অপর আবেগের উপস্থিতি। আধ্যাত্মিক চেতনা যেমন যেমন ক্রমিকভাবে বাড়তে থাকে তা অপর আবেগকে গলিয়ে দেয়, তার শোধন হতে থাকে, ব্যক্তির মধ্যে বিরতির দিকে অগ্রসর হবার ভাবনা জাগে। এই আবেগের নাম হল, অপ্রত্যাখ্যান।

আবেগের প্রথম অবস্থা

প্রথম আবেগ ছিন্ন হলে তবেই ভেদজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। আমি শরীর থেকে পৃথক, আমি শরীর নয়—এই বোধ স্পষ্ট ওঠে। আমি শরীর—এ হল অস্মিতা। অস্মিতা হল এক ধরনের ক্লেশ। ভেদজ্ঞান হলে অস্মিতা মিটে যায়, ক্লেশও তখন মেটে। এগুলি মেটা মাত্র-ই তৈরি হয় অপর সংস্কার। 'আমি শরীর নয়', 'আমি শরীর নই', 'আমি শরীর থেকে পৃথক'—এও হল এক সংস্কার। এ হল প্রতিপ্রসব, অর্থাৎ ঐ সংস্কারকে মেটাতে পারে এমন সংস্কার। শরীরের সঙ্গে অভেদানুভূতি, 'অহমেব দেহোস্মি'র যে ভাব, আমি শরীর, আমি দেহ—এই যে ভাব, এ হল মিথ্যা দৃষ্টিকোণ। তা সমাপ্ত হয়ে যায়। সেগুলিকে সমাপ্ত করার জন্য অপর সংস্কার তৈরি করতে হয়। 'আমি শরীর নয়'—এ হল প্রতিপ্রসব, প্রতিপক্ষের সংস্কার।

আবেগের দ্বিতীয় অবস্থা

আবেগের দ্বিতীয় অবস্থা (অপ্রত্যাখ্যানাবরণ) উপশান্ত বা ক্ষীণ হলে তবে ঐ পথে চলার ভাবনা তৈরি হয়। মনে তখন ভাবনা হয়, বিরতির, ত্যাগের রাস্তাই সেরা, তা পিপাসাকে মেটাতে পারে, অতএব ঐ পথেই চলতে হবে। কর্মশাস্ত্রের ভাষায়, তখন দেশবিরতি গুণস্থান উপলব্ধ হয়। আধ্যাত্মিক বিকাশের এ হল পঞ্চম ভূমিকা।

আবেগের তৃতীয়-চতুর্থ অবস্থা

আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্রমপর্যায়ে যখন আমরা এগিয়ে চলি, অভ্যাস করতে করতে যেমন যেমন মোহের বলয় ছিন্ন হতে শুরু করে, তার প্রভাব মন্দীভূত হতে থাকে, তখন তৃতীয় গ্রন্থিটি উন্মোচিত হয়। এই গ্রন্থির নাম হল, প্রত্যাখ্যানাবরণ। এ হল আবেগের তৃতীয় অবস্থা। একে ছিন্ন করলে ব্যক্তি বিরতির প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হয়ে পড়ে। যে চলতে শুরু করেছিল, সে চলার পথে পূর্ণ সমর্পিত হয়। এ হল আধ্যাত্মিক বিকাশের ষষ্ঠ ভূমিকা। এই ভূমিকায় ব্যক্তি সাধু হয়ে যায়, সন্ন্যাসী হয়। পঞ্চম ভূমিকা হল গৃহস্থ-সাধকের, আর ষষ্ঠ ভূমিকা হল মুনি-সাধকের। উভয়েই সাধনায় ইচ্ছুক, উভয়েই সাধনা-পথের পথিক। উভয়েই চলা শুরু করেছে, উভয়েই যাত্রার জন্য নিজেদের সমর্পণ করেছে। একজন গৃহস্থ জীবনে সাধনা করছে, আর একজন মুনি জীবনে সাধনা করছেন। গৃহস্থ জীবন থেকে মুনি জীবনে আসা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, কোন লাফ নয়। কোথাও কোথাও, কখনও কখনও আকস্মিক ঘটনাও ঘটে, বিরাট লাফের মত হয়। আমাদের বিকাশের ক্রমেও হঠাৎ কেউ দীর্ঘ লাফ দিতে পারে। বিকাশের কোন এক ক্রমে চলতে চলতে এমন লাফ আসতে পারে যে ব্যক্তি নতুন উপলব্ধি পেয়ে যায়, তার নতুন জন্মলাভ ঘটে, নতুন ঘটনা ঘটে। এই হল লাফ। কিন্তু গৃহস্থ জীবন থেকে মুনি জীবনে আসাটা কোন লাফ নয়। এতে নিশ্চিত ক্রমপর্যায়ের

ব্যবস্থা আছে। কেউ গৃহস্থ হয়ে সাধনা শুরু করে, আর কেউ মুনি হয়ে সাধনার পথে যাত্রা করেন। এর পেছনেও মোহের, আবেগের সিদ্ধান্ত কাজ করে। যে ব্যক্তির মোহের খানিকটা লয় ঘটেছে, একটি নিশ্চিত মাত্রার লয়, তাঁর মনে সাধনার ভাব জাগ্রত হয়। যাঁর মধ্যে মোহের অনেকটা লয় হয়েছে, তাঁর মনে সাধনার প্রতি সমর্পিত হওয়ার কথা জাগ্রত হয়।

যাবজ্জীবন : পূর্ণ সমর্পণের প্রতীক

ভগবান মহাবীর সাধু-জীবনের যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তা ছিল এক নতুন ব্যবস্থা। তিনি তাঁর ব্যবস্থাপত্রে বলেছিলেন, যিনি জৈন অনুশাসনে সন্ন্যাসী হবেন তাঁকে সারা জীবনের জন্য সাধু হতে হবে, সামান্য কিছু সময়ের জন্য নয়। তাঁকে আজীবন মুনিব্রত পালনের প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বৌদ্ধরা অন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। বৌদ্ধ অনুশাসনে ভিক্ষু হতে ইচ্ছুককে সারা জীবনের জন্য ভিক্ষু থাকার প্রতিজ্ঞা করার আবশ্যক হয় না। তিনি দু বছর, পাঁচ বছর, দশ বছর, পর্যন্ত সাবধিক ভিক্ষু থাকতে পারেন। এই তথ্যটিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয়। বুদ্ধদেব এমন স্তর স্থির করে দিয়েছিলেন যে, আজ সাধনার জন্য কেউ চলতে পারেন, ভিক্ষু হতে পারেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব ততক্ষণ ভিক্ষু থাকতে পারেন, আবার ইচ্ছা হলে ঘরে চলে আসতে পারেন।

কিন্তু মহাবীর সারা জীবন মুনি থাকার যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তা মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা থেকেও বড় কথা। তথ্যটি খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। এই ব্যবস্থার পশ্চাৎপট সম্বন্ধে মহাবীর বলেছিলেন, সাধনার প্রতি যিনি পূর্ণ সমর্পিত না হন, তিনি কিভাবে ভিক্ষু হবেন। সারা জীবন মুনি থাকার সঙ্কল্প যাঁর নেই, তিনি লক্ষ্যের প্রতি পরিপূর্ণ সমর্পিত হবেন কি করে? যাঁর পশ্চাৎপটে মোহ-বিলয়ের এমন প্রেরণা নেই, সাধনার প্রতি যিনি সদা-সমর্পিত নন, তিনি গৃহস্থ সাধু হতে পারেন, কিন্তু গৃহত্যাগী পরিপূর্ণ সাধু হতে পারেন কিভাবে? মোহ-

বিলয়ের এই তারতম্যের আধারে, এই কর্মপ্রেরণার বাস্তবতার আধারে মহাবীর এই অপরিহার্য কথাটি জুড়ে দিয়েছিলেন যে, কেউ মুনি হতে চাইলে তাঁকে সারা জীবনের জন্য মুনি হতে হবে, সারা জীবনের জন্য তিনি মুনি হবেন, অল্পকালের জন্য নয়। কারণ, প্রত্যাখ্যানাবরণের লয় যত ক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ মুনিত্ব আসতে পারে না।

ব্যবহার এবং নিশ্চয়ের ফলশ্রুতি

মুনিত্ব এবং শ্রাবকত্বের আমাদের ব্যবহারিক কল্পনা আছে। সম্যক্ দর্শনেরও এক ব্যবহারিক কল্পনা আছে। যেখানে সংঘ এবং সমাজ থাকে, সংগঠন থাকে, সেখানে ব্যবহারও থাকে। কিন্তু ব্যবহার তো ব্যবহারই হয়, তাতে বাস্তবিকতা থাকে খুবই কম। নিশ্চয় বাস্তবিক হয়। নিশ্চয় সত্যের উপলব্ধি হয় নিশ্চয়ের দ্বারা। নিশ্চয়কে ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা কেবল ব্যবহারের পথে চলি তাহলে যে সত্য প্রাপ্ত হওয়া উচিত তা হয় না।

অনেকান্ত দর্শনের দুটি পক্ষ—ব্যবহার এবং নিশ্চয়। অনেকান্তর পাখি ব্যবহার এবং নিশ্চয়, এই দুই ডানাকে ফড়ফড়িয়ে ওড়ে। একটি ডানার সাহায্যে তা উড়তে পারে না। একটি ডানাকে কেটে বাদ দেওয়াও যায় না। ব্যবহারকেও কাটা যায় না, নিশ্চয়কেও কাটা যায় না।

ব্যবহারের ভাষায় যখন আমরা চলি তখন জীব প্রভৃতি নটি পদার্থকে জানা-কে বলা হয় সম্যক্ দর্শন। শ্রাবকের ব্রতকে স্বীকার করে নিলে তা হয় পঞ্চম গুণস্থান, অর্থাৎ শ্রাবকত্ব, দেশবিরতি প্রাপ্তি। পাঁচ মহাব্রতকে স্বীকার করলে ষষ্ঠ গুণস্থান আসে, সর্ববিরতির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ হল ব্যবহারের ভাষাকে স্বীকার করা। কিন্তু যখন আমরা কর্মশাস্ত্রীয় ভাষায় চিন্তা করি, নিশ্চয়ের ভাষায় ভাবি, তখন আমাদের বলতে হবে যে, আবেগ চতুষ্টয়ের (ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ) তীব্রতম অবস্থার (অনন্তানুবন্ধী) সমাপ্তি হওয়ার পরেই

সম্যক্‌ দর্শন উপলব্ধ হয়। যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আবেগের এই তীব্রতম অবস্থা ক্ষীণ বা শান্ত না হয়, তাঁর সম্যক্‌ দর্শনের উপলব্ধি ঘটে না। তা তিনি যতবারই ঐ নয় পদার্থের পুনরাবৃত্তি করুন বা ওগুলিকে কণ্ঠস্থ করে উচ্চারণ করতে থাকুন। যে ব্যক্তির মধ্যে আবেগের দ্বিতীয় অবস্থার (অপ্রত্যাখ্যানাবরণ) উপশম বা ক্ষয় হয় না, ততক্ষণ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি দেশ-বিরতি শ্রাবক হতে পারেন না, তা তিনি যত-বারই ত্যাগের পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন। যে ব্যক্তির মধ্যে আবেগের তৃতীয় অবস্থার (প্রত্যাখ্যানাবরণ) উপশম বা ক্ষয় না. ততক্ষণ তিনিমুনি-সাধক হতে পারেন না, তা তিনি যতবারই দীক্ষিত হোন না কেন। যে ব্যক্তির মধ্যে আবেগের চতুর্থ অবস্থার (সংজ্বলন) ক্ষয় হয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বীতরাগ হতে পারেন না, চরিত্রকে উৎকৃষ্ট কোটিতে নিয়ে যেতে বা যথাখ্যাতকে পেতে পারেন না।

অন্তরঙ্গ : বহিরঙ্গ

আমরা অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয়ের প্রতিই দৃষ্টি দেব। কেবল বহিরঙ্গ সাধনা পর্যাপ্ত নয়। যতক্ষণ কষায় লয়প্রাপ্ত না হয়, অন্তরঙ্গের স্পর্শ না হয়, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক চেতনা উপলব্ধ হবে না। বহিরঙ্গ সাধনায় ব্যবহারের পূর্তি তো হতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ হতে পারে না।

কর্মশাস্ত্রের রহস্যকে না বুঝলে আমরা আধ্যাত্মিক বিকাশের সূক্ষ্ম রহস্যকে বুঝতে পারব না। আবার ঐ সূক্ষ্ম রহস্যকে বুঝতে না পারলে আধ্যাত্মিক চেতনার অন্তরঙ্গ পথকেও আঁকড়ে ধরা সম্ভব নয়। কর্মশাস্ত্রের গভীরে নেমে তার রহস্যকে আমাদের ধরতে হবে।

বীতরাগতা হল নগ্নতা

বীতরাগতাকে আরও বাড়ানোর পথে একটি বাধা তৈরি হয়, তা হল আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তি কখন পূজার পূজারী হয়ে যায়, কখনও

প্রিয় বস্তুকে আরও ভোগ করার বাসনায় তার ইচ্ছা অগ্রসর হয়, কখনও সে অনুকূলতা চায়, মনোজ্ঞতা চায়, অমনোজ্ঞতার হাত থেকে বাঁচতে চায়। এ সব তৈরি হয় আশংসা থেকে। যিনি বলা এবং করার মধ্যে সামঞ্জস্য না রাখেন, যেমন বলেন তেমন করেন না, বলেন একরকম আর করেন আর একরকম,—এরকম অবস্থা যতক্ষণ সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ অধ্যাত্মের উচ্চ ভূমিকা প্রাপ্ত হতে পারে না। যা বলা হয়েছে তেমনই করতে হবে—এই চেতনা যতক্ষণ পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত না হয়, তখন কখনও কখনও চলার পথে শিথিলতা আসে। কখনও ঐ শিথিলতা উৎপন্ন হয় বাতাবরণ থেকে, কখনও অন্যান্য কারণ থেকে।

এই চার আবেগ যখন নষ্ট হয়ে যায়, এর চার অবস্থা ক্ষীণ হয়ে যায়, সমাপ্ত হয়, তখন বীতরাগতার স্থিতি আসে, তখন চরিত্র যথাখ্যাত হয়। ঐ অবস্থায় কোন পরিস্থিতিতে লক্ষ্যের প্রতি শৈথিল্য আসে না। তখন বলা এবং করার মধ্যে, করা এবং বলার মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও থাকে না। কোন শক্তিই তাদের মধ্যে পার্থক্য আনতে পারে না। তখন মনুষ্যকৃত কষ্ট হোক বা তির্যচকৃত কষ্ট প্রাপ্ত হোক কিংবা দৈবী উপসর্গ প্রাপ্ত হোক, মরার বা বাঁচার যে কোন প্রসঙ্গই আসুক, আকর্ষণীয় কোন জিনিসের সঙ্গ থাকুক, নীরস কোন বস্তু থাকুক, ব্যক্তির চেতনায় কোন পার্থক্য দেখা যায় না। আত্মার সঙ্গে তখন তা একাত্ম হয়ে যায়, একরূপ হয়। ঐ যথাখ্যাত চরিত্র এমন অপ্রকম্প, এমন নিশ্চল হয় যে, সেখানে লুকোবার বিষয় সর্বদা সমাপ্ত হয়ে যায়। এ হল ছদ্মরহিত অবস্থা। ভেতরে এক ধরনের নগ্ন অবস্থা তৈরি হয়। কোন আবরণ থাকে না।

আবেগের প্রভাবক্ষেত্র

এ হল আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ-ক্রম। এসব হয় সম্পূর্ণভাবে মোহের লয়ের আধারে। মোহ যত প্রবল হয়, আমাদের

মূর্চ্ছাও তত প্রবল হয়। মূর্চ্ছা যত প্রবল হয় আমাদের আচার বিকৃত হতে শুরু করে এবং আমাদের দৃষ্টিকোনও মিথ্যা হতে শুরু করে। একটি পথ হল, মোহের প্রবলতার এবং দ্বিতীয় পথ হল, মোহের দুর্বলতার বা মোহ—বিলয়ের। প্রথম মার্গটি অনুসৃত হলে আধ্যাত্মিক চেতনা মূর্চ্ছিত হতে শুরু করে এবং দ্বিতীয় মার্গে চললে আধ্যাত্মিক চেতনা বিকশিত হতে থাকে। কোন্ প্রকারে মোহকে আমরা ক্ষীণ করব, সেটাই হল, সাধনার কেন্দ্রবিন্দু! মোহকে শান্ত করুন, রাগ-দ্বেষ কম হোক, আর এমন ধরনের জীবন যাপন করুন যাতে কষায় কম হতে থাকে, রাগ-দ্বেষ কম হয়—এ কর্মশাস্ত্রীয় মীমাংসা, তেমনি অধ্যাত্ম শাস্ত্রেরও মীমাংসা। অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মীমাংসা যেমন, স্বাস্থ্যশাস্ত্রীয় এবং মানসশাস্ত্রীয় মীমাংসাও তাই। আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনার ওপরেই কেবল এই আবেগগুলির প্রভাব পড়ে না, আমাদের মন, মনের শান্তি এবং স্বাস্থ্যের ওপরেও তার প্রভাব পড়ে। আজকের মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে, ব্যক্তির মনের উপর আবেগের প্রভাব কত বেশি এবং আবেগের ফলে কত রোগ তৈরি হয়। এসব আগেও আমাদের অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন আচার্যরাও স্পষ্টতার সঙ্গে এ কথা বলে গিয়েছেন, আবেগগুলির জন্য রোগ তৈরি হয়। বাত, পিত্ত এবং কফের অসমতার কারণেই রোগ উৎপন্ন হয়। আবেগের দ্বারা বাত, পিত্ত এবং কফ বিকৃত হয় এবং রোগ তখন খুব সহজেই আক্রমণ করে। প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থগুলিতে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে মানসশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে যেসব অনুসন্ধান চালানো হয়েছে, তাতেও এসব বিষয়ে আশ্চর্য্যজনক আলোকপাত করা হয়েছে। মনঃ-চিকিৎসাশাস্ত্র কিছু বিচিত্র কথা বলেছে। আমরা জানি, শরীরে রোগ তৈরি হয়। চিকিৎসক বলেন, রোগ উৎপন্ন হয় বীজাণুগুলির দ্বারা। মনঃ-চিকিৎসাশাস্ত্র অপর কিছু বলে। ঐ শাস্ত্র বলে, আমাদের শতকরা সত্তর থেকে

অধিকাংশ রোগই উৎপন্ন হয় মানসিক আবেগগুলির জন্য। ক্রোধ, ঈর্ষা, ভয় এবং লালসা—এই চারটি হল রোগ-উৎপাদক। অনেক রোগই গ্রন্থিগুলির স্রাবক্ষরণের জন্য বেড়ে ওঠে, কারণ তাতে অবাঞ্ছনীয় নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেও ঐ আবেগ ঘাতক। আবেগ কর্ম-পরম্পরাকে এগিয়ে দেয় বটে, কিন্তু শরীরের পক্ষে তা সুফলদায়ী হয়।

কর্মশাস্ত্রকে কেবল জানলেই আমাদের চলবে না, তার রহস্যকে জেনে তার থেকে আমাদের লাভবান হতে হবে। ব্যাপারটা হল, আবেগের নিয়ন্ত্রণ। আবেগগুলির ওপরে আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। কর্মশাস্ত্রের ভাষায় আবেগ-নিয়ন্ত্রণের তিনটি পদ্ধতি আছে—উপশমন, ক্ষয়োপশমন ও ক্ষয়ীকরণ।

আবেগ নিয়ন্ত্রণের তিনটি পদ্ধতি

উপশমন

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয়েছে দমনের পদ্ধতি। এক ব্যক্তি আবেগগুলিকে দমন করে চলেছেন। মনে যে ইচ্ছা উৎপন্ন হল, যেসব আবেগ এল, তাকে আটকানো হল, শান্ত করা হল, দমন করা হল। এই দমন চলতে থাকে। দমন করতে-করতে সে অধ্যাত্ম-বিকাশের একাদশ ভূমিকা পর্যন্ত এগোনো যায়। এটিও উচ্চ ভূমিকা। এর নাম হল, উপশান্ত মোহ। একে বলা হয় একাদশ গুণস্থান। এই ভূমিকায় মোহ শান্ত হয়ে যায়। শান্ত তা এমন পর্যায়ে আসে যে ব্যক্তি বীতরাগ হয়ে পড়ে। এগুলি দমনের পথ, বিলয়ের নয়। এজন্য কিছু সময় পরে এমন অবস্থা তৈরি হয় যে, দমিত কষায় জেগে ওঠে। এর মাধ্যমে এমন ধাক্কা লাগে, একাদশ ভূমিকায় গমনকারী সাধু নিচে গড়িয়ে যেতে থাকেন এবং আবার আবেগগুলির দ্বারা আক্রান্ত হন।

দমনের পদ্ধতিকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তা ব্যক্তিকে লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছুতে দেয় না।

ক্ষয়োপশমন

এ হল দ্বিতীয় পদ্ধতি। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয়েছে উদাত্তীকরণের পদ্ধতি। একে মার্গান্তরীকরণও বলা হয়। এর অর্থ হল—পথ বদলানো উদাত্ত করা, পরিষ্কৃত করা, পরিমার্জিত করা।

ক্ষয়োপশমনের অর্থ হল, কিছুকে দমন করতে করতে ক্ষীণ করা। কিছু দোষের উপশমন হল এবং কিছু ক্ষীণ হল। এতে উপশমন এবং ক্ষয় একই সাথে চলে।

ক্ষয়ীকরণ

এ হল তৃতীয় পদ্ধতি। এতে পরিপূর্ণভাবে ক্ষীণ করা হয়, সমাপ্ত করা হয়, লয় ঘটানো হয়। এর দ্বারা উপশমন হয় না। যা আসে, তাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। এটা নষ্ট করতে করতে এগিয়ে চলার পদ্ধতি। যে ব্যক্তি এমন করে সে সম্পূর্ণভাবে অগ্রসর হতেই থাকেন তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার ভূমিকা প্রশস্ত হতে থাকে।

আবেগের উপশমন হয়, ক্ষয়োপশমম হয়, ক্ষয়ীকরণ হয়।

মানসবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এ তথ্য স্বীকৃত হয়েছে যে আবেগগুলির ওপরে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। অনিয়ন্ত্রিত আবেগ কেবল ব্যক্তিরই নয়, সমাজেরও ক্ষতি করে। ক্রোধ উৎপন্ন হয়। যাকে আটকানো হবে তা নিয়ে পার্থক্য দেখা দেয়। এখানেই কর্মশাস্ত্রের অধ্যাত্ম-শাস্ত্রীয় পক্ষ এসে যায়। এ হল তার সাধনা-পক্ষ।

অধ্যাত্মশাস্ত্র এবং কর্মশাস্ত্র সংযুক্ত। এদের কখনও পৃথক করা যায় না।

আমরা এ কথা জেনেছি, সংসার চক্র চলেছে আবেগের দ্বারা। মানসিক অশান্তির চক্র চলেছে আবেগের দ্বারা। আবেগের জন্যই কত না রোগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, এসব আবেগের হাত

থেকে আমরা বাঁচব কিভাবে? কর্মশাস্ত্র এই প্রশ্নের সমাধান দেয় না। কি ঘটছে, কর্মশাস্ত্র থেকে সে কথাই উপলব্ধ হয়েছে। এখন ঐ আবেগের উপশমন ও ক্ষয়ীকরণের জন্য আমাদেয় কি করা উচিত, এই বোধ অধ্যাত্মশাস্ত্র থেকে পাওয়া যাবে। এই বিন্দুতে কর্মশাস্ত্র এবং অধ্যাত্মশাস্ত্র মিলে যায়। মোহ এবং আবেগের বিলয় কিভাবে করব, তার আলোচনা আমরা অধ্যাত্মশাস্ত্রীয় বিন্দু দ্বারা করব।

১৫.

আবেগ-চিকিৎসা

- প্রথম সাধন হল স্বরূপের সন্ধান, ভেদজ্ঞান-প্রাপ্ত।
- দ্বিতীয় সাধন হল বিপাক প্রেক্ষা, পরিণাম প্রেক্ষা।
- বিপাকের নিমিত্ত-সাপেক্ষতা।
- বিপাকের পাঁচটি নিমিত্ত—দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল, ভাব এবং ভব।
- বিপাকে পরিবর্তন করা যায়।
- বিপাক পরিবর্তনের দুটি উপায়—
  - বীতরাগ চেতনার বিকাশ
  - তিতিক্ষা চেতনার বিকাশ

ইষ্ট এবং অনিষ্ট — দু রকমের কর্ম-বিপাকে পদার্থের যোগ।

কর্ম-চিকিৎসার উপায়

কুশলী চিকিৎসক হন তিনিই, যিনি রোগ, রোগের হেতু, আরোগ্য এবং আরোগ্যের হেতু—এই চারটি জিনিসকে জেনে রোগের চিকিৎসা করেন। কুশলী সাধক হন তিনিই, যিনি কর্ম, কর্মের বীজ, কর্ম-মুক্তি এবং কর্ম-মুক্তির হেতুকে জানেন। কুশলী সাধক তিনি যিনি বন্ধ, বন্ধ-এর হেতু, বন্ধ-মুক্তি এবং বন্ধ-মুক্তির হেতুকে জানেন। এই সব ভালভাবে জেনে যিনি কর্মের চিকিৎসা করেন, তিনিই কুশলী সাধক হন।

কর্মকে না জানলে আধ্যাত্মিক বিকাশ হয় না, তাই কর্মকে জানা

প্রয়োজন। এর আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশে যা বাধা, তা হল কর্ম। ঐ বাধক তত্ত্বকে না জানলে বাধাকে মেটানো যায় না, আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটানো যায় না। এজন্যই কর্মকে জানাটা জরুরী। অন্য ভাষায় বললে বলতে হয়, বন্ধকে জানাটা জরুরী। বন্ধ বা কর্মকে জানাই পর্যাপ্ত নয়। তার হেতুকে না জানলে কিছুই হয় না। কর্ম বা বন্ধের হেতুকে না জানলে কর্ম বা বন্ধের সমাপ্তি ঘটানো যায় না। কর্মের বীজ হল, রাগ-দ্বেষ। রাগ ও দ্বেষকে না জানা পর্যন্ত রাগ ও দ্বেষ থেকে সৃষ্ট জীবের পরিণাম, জীবের বিভিন্ন পরিণতিও জানা যায় না। কর্মের চিকিৎসাও করা যায় না। এই জন্যই কর্মকে জানা যেমন প্রয়োজন, কর্ম-বীজকে জানাও তেমনি প্রয়োজন উভয়কে জেনেও যদি কর্ম-মুক্তি এবং কর্ম-মুক্তির হেতুকে না জানা যায় তাহলে কর্মের চিকিৎসা হয় না।

কর্ম-মুক্তির হেতু হল—সংবর এবং নির্জরা। যখন ধ্যানের সাহায্যে সংবর বা নিরোধের স্থিতি উপলব্ধ হয় এবং তপস্যা দ্বারা নির্জরা হয়, তখনই কর্মের সঠিক চিকিৎসা হয়।

কুশলী সাধকের পক্ষে তাই কর্ম, কর্মের হেতু, কর্ম-মুক্তি কর্ম-মুক্তির হেতু—চারটি জিনিসকেই জানা খুব প্রয়োজন। এদের না জেনে তিনি নিজের সাধনার বিকাশ ঘটাতে পারেন না।

আবেগ-শক্তির উপায়

আমাদের আবেগ নিরন্তর কর্মের আস্রব ঘটাতে থাকে, কর্মের আগমনের দ্বার উন্মোচিত করতে থাকে। কিন্তু কিভাবে ঐ দ্বারকে বন্ধ করা যায়? কিভাবে আবেগকে শান্ত করা যায়? মোহের আবেগ যদি শান্ত হতে থাকে, মোহের আবৃত্তিগুলি যদি শান্ত হয়, কম হয় তাহলে কর্মের চাপ আপনা থেকেই কমতে শুরু করে। ঐ আবেগগুলির, মোহের আবৃত্তিগুলিকে কিভাবে শান্ত করা যায়, সাধকের কাছে সেটাই জ্বলন্ত প্রশ্ন। আবেগগুলিকে শান্ত করার প্রশ্ন কেবল সাধকের সামনেই নেই, চিকিৎসকের সামনেও রয়েছে,

কারণ ঐগুলিকে শান্ত না করলে জীবন সুস্থভাবে চলতে পারে না। আবেগ হল বদ অভ্যাসের উৎপাদক। সুস্থ জীবনের জন্য এদের শান্ত করা প্রয়োজন। চিকিৎসকও তাঁর নিজস্ব সীমারেখার মধ্যে আবেগ শান্তকরণের উপায় খুজে থাকেন। যতগুলি আছে, তার সবগুলিরই কেন্দ্র রয়েছে আমাদের মস্তিষ্কে। যার মাধ্যমে ঐ আবেগ অভিব্যক্ত হয়, তার সবগুলিরই কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্কে। ঐ কেন্দ্রগুলিকে সমাপ্ত করলে আবেগ শান্ত হয়ে যায়। ক্রোধের একটি কেন্দ্র আছে, একটি বিন্দু আছে। ঐ বিন্দুকে সমাপ্ত করলে ক্রোধ আসা বন্ধ হয়ে যায়। মাদ্রাজে রয়েছে 'ব্রেন ইনস্টিটিউট'। ভারতের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র এটি। ওখানের চিকিৎসকরা কয়েকটি অস্ত্রোপচার করেছেন। কিছু অনুসন্ধানও ওঁরা চালিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, অস্ত্রোপচারের দ্বারা মদ্যপানের অভ্যাস ছাড়িয়ে দেওয়া যায়। মস্তিষ্কে একটি কেন্দ্র আছে, সেটি মাদক বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার উত্তেজনা সমাপ্ত করে দিলে মাদক দ্রব্য সেবনের অভ্যাস সমাপ্ত হয়, ঐ সংক্রান্ত ভাবনাও শেষ হয়। এ ধরনের অপারেশন ওঁরা করেছেন এবং তাতে সফলও হয়েছেন। ওঁদের সিদ্ধান্ত হল, অনেক আবেগ, অনেক উত্তেজনা, খিটমিটে স্বভাব, ঝগড়া করার প্রবৃত্তি—প্রভৃতি সব কিছুই মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে অপারেশন করে ঠিক করে দেওয়া যায়। প্রবৃত্তিগুলিকে মিটিয়ে ফেলা যায়।

আমাদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ তৈরি হয়—আলফা, বিটা, গামা ইত্যাদি। এই তরঙ্গগুলি আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তি তৈরি করে। এগুলি ছাড়া অন্য ধরনের তরঙ্গও আছে, সেগুলির বিকাশ যৌগিক পদ্ধতির দ্বারা করা যায়। সেগুলির অধ্যয়ন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাও সম্ভব।

আজ চিকিৎসাপদ্ধতি এত বিকশিত হয়েছে যে ঐ অপারেশন দ্বারা, ইলেকট্রিক শক দিয়ে বিভিন্ন আবেগ এবং অভ্যাসকে পুরোপুরি

মিটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। আবেগের কেন্দ্রকে একবার শেষ করে দিলে সারা জীবনেও তা আর কখনও সক্রিয় হতে পারে না। আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞান কামবাসনা, কষায়, ভয় প্রভৃতি যাবতীয় আবেগকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

চিকিৎসার সীমারেখা হল আমাদের দৃশ্য শরীর, ঔদারিক শরীর। শরীরের প্রধান অংশ হল মস্তিষ্ক। এরই মাধ্যমে চিকিৎসকরা গবেষণা করছেন, কোন্ ধরনের আবেগ-কেন্দ্রকে শুধরে দিলে মানুষ আবেগের প্রহার থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। শারীরশাস্ত্রীয় এবং চিকিৎসাশাস্ত্রীয় অনুসন্ধানের মূল প্রতিপাদ্য হল এটাই।

অধ্যাত্মশাস্ত্রীয় ফলা-ফলের ভিত্তিতেও এখন আমরা বিষয়টিকে আলোচনা করব। অপারেশন ছাড়াও কি এই আবেগগুলিকে শান্ত করা যায়? মস্তিষ্কের বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু এবং বিশেষ স্নায়ুগুলিকে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বাদ না দিয়ে কি ঐ উত্তেজনা, বাসনা এবং অভ্যাসগুলিকে শান্ত করা যায়? এই প্রশ্ন নিয়ে অতি প্রাচীন কালে অধ্যাত্মসাধক এবং অধ্যাত্ম-তত্ত্ববেত্তারা যে অনুসন্ধান চালিয়েছেন, পরীক্ষা এবং প্রয়োগকার্য সম্পন্ন করেছেন, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

অধ্যাত্ম-তত্ত্ববেত্তারা বলেছেন, আত্মিক প্রক্রিয়া দ্বারাও এসব করা সম্ভব। আত্মিক প্রক্রিয়ার প্রথম কথাই হল, স্বরূপানুসন্ধান বা নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান। এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমাদের সামনে একটিই প্রকাশ-কিরণ রয়েছে এবং সেটি হল, আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। আমাদের স্বভাব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, অস্তিত্ব স্বতন্ত্র এবং তাদের কখনই মেটানো যায়, না। ঐ স্বভাবকে কখনই দমন করা যায় না। ঐ স্বভাবকে কখনও পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্নও করা যায় না। হাজার বারও যদি কর্ম আক্রমণ করে, কর্মের পরমাণুগুলি যদি হাজার বার রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করে, তবু ওদের পুরোপুরি বিকৃত বা শক্তিহীন করা যায়

না। আমাদের কাছে প্রকাশের প্রথম রশ্মি হল এটিই। যদি তা না হতো তাহলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না। আমাদের কাছে ঐ স্বতন্ত্রতা রয়েছে বলেই তার সাহায্যে পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ সম্ভব হচ্ছে।

স্বরূপের সন্ধান

সবচেয়ে প্রথম কথা হল, নিজের স্বরূপের সন্ধান। যে ব্যক্তির মধ্যে এই সম্যক্ দৃষ্টি জেগে ওঠে, নিজের স্বরূপের সন্ধানের প্রসঙ্গটিকে যিনি চেতনার স্তরে নামিয়ে আনতে পারেন, সেই ব্যক্তি নিজ আবেগের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হন। স্বরূপের সন্ধানের অর্থ হল, ভেদজ্ঞান প্রাপ্তি। আধ্যাত্মিক ভূমিকায় এটি হল পরিবর্তনের প্রথম বিন্দু। এই ভেদজ্ঞান যখন জেগে ওঠে, তখন থেকেই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আমরা বদলাতে শুরু করি। এতে অন্তরের এমন পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে, ব্যক্তি এত রূপান্তরিত হয় যে, আগের মানুষটি এবং ভেদজ্ঞান বা সম্যক্ দৃষ্টি লাভের পর পরিবর্তিত মানুষটি আর একই মানুষ থাকেন না। তার ব্যক্তিত্বে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। জীবন এবং বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিকোণও বদলে যায়। জীবনকে দেখার কোনও পালটায়। যে দৃষ্টিতে আগে তিনি পদার্থকে দেখতেন, এখন আর সে দৃষ্টিতে পদার্থগুলিকে দেখেন না। যে দৃষ্টিতে আগে নিজেকে দেখতেন, সেই দৃষ্টিতে এখন আর নিজেকে দেখেন না। নিজেকে দেখার এবং পদার্থকে দেখার দৃষ্টিকোণও— উভয়ই বদলে যায়। দৃষ্টিকোণের এই পরিবর্তনের ফলে আবেগের উপর প্রচণ্ড আঘাত লাগে প্রচণ্ডভাবে সেগুলি প্রহৃত হয়। যে দৃষ্টিকোণের আধারে আগে আবেগগুলি পরিপুষ্ট ও সিঞ্চিত হতো, দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের ফলে সেগুলির পোষণ ও সিঞ্চণ বন্ধ হয়ে যায়, তাদের জীবনরস-প্রাপ্তি বন্ধ হয়। আবেগগুলি সিঞ্চিত হয় অহঙ্কার ও মমকার-এর দ্বারা। অহঙ্কার এবং মমকার যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আবেগগুলি পরিপুষ্ট হতে থাকে, বাড়তে থাকে, ফুলতে থাকে।

দৃষ্টিকোণ যেই বদলায়, অহঙ্কার এবং মমকার-এর গাঁট ভেঙ্গে যায়, অমনি আবেগের জীবনরস ও পোষণ রস প্রাপ্তি বন্ধ হয়ে যায়, তার আধারও শেষ হয়। এজন্যই আবেগের চিকিৎসার প্রথম সূত্র হল, দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন, সম্যক্ দৃষ্টি প্রাপ্তি।

বিপাক-প্রেক্ষা

এর দ্বিতীয় সূত্র হল, বিপাকের প্রেক্ষা, বিপাককে দেখা। এটাও খুধ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। বিপাক-প্রেক্ষা আমরা করি না, বিপাককে দেখি না। এজন্যই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিগুলি চলতে থাকে। যদি আমরা প্রবৃত্তির বিপাকের ওপরে দৃষ্টি দিই এবং যদি দেখার চেষ্টা করি এর বিপাক কি হবে, কি বিপাক হচ্ছে, তাহলে, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তথা আবেগ চলতে পারে না। ব্যক্তি যিনিই হোন না কেন, তিনি যা কিছু করেন এবং চিন্তা করেন, আমার আচরণ ও কার্যের পরিণাম কি হবে, কি বিপাক হবে, তাহলে বিবেকের অনেকটাই ভারসাম্য বজায় রেখে কাজ করতে পারবে। যদি এই পরিণাম এবং বিপাকের সম্বন্ধে চোখ বন্ধ করে কাজ করতে থাকি, তাহলে যে কাজ তার মাধ্যমে হবে তা হবে হানিকরাক এবং অনিষ্টকর। পৃথিবীতে যত অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ হয়েছে, হচ্ছে, তা চোখ বন্ধ করে থাকার জন্যই হয়েছে বা হচ্ছে। বিপাক-প্রেক্ষার চেতনা জাগ্রত হলে অবাঞ্ছিত কার্য ও অনিষ্টকর প্রবৃত্তি হতে পারে না। বিপাকের পেক্ষা হল ধ্যানের একটি অঙ্গ। জৈন দর্শনে ধর্ম-ধ্যানকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—আজ্ঞা বিষয়, অপায় বিচয়, বিপাক বিচয় এবং সংস্থান বিচয়, এর তৃতীয়টি হল, বিপাক বিচয়। বিপাক-বিচয় হল বিপাক, বিপাক-দর্শন। অনেকটা গভীরে গিয়ে আমরা দেখি, এখন কোন্ কর্মের বিপাক হচ্ছে। রোগের ক্ষেত্রে কোন্ কর্মের বিপাক হচ্ছে। ক্রোধ সৃষ্টি হল, তা কোন্ কর্মের বিপাক, তা আমরা দেখি, বিপাকের চিন্তা করি, বিচয় করি—

এখানে আমাদের মানস-স্থিতি বদলে যায়, তা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

কর্ম আট প্রকার এবং আটটি কর্মেরই নানা বিপাক আছে। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের শক্তি তথা মনের জ্ঞানশক্তিকে আবৃত করা হল জ্ঞানাবরণ কর্মের বিপাক। জ্ঞানাববণ কর্ম যখন বিপাকে আসে, তখন তা আমাদের জ্ঞানশক্তিগুলিকে আবৃত করে দেয়।

দর্শনাবরণ কর্মের বিপাক হলে আমাদের দৃষ্টিশক্তি আবৃত হয়। নিদ্রা আসে, গভীর নিদ্রা। এমন গভীর নিদ্রা যে ব্যক্তি সারা-দিনের কল্পনাগুলিকে ক্রিয়াশীল করে ফেলে। এমন প্রগাঢ় নিদ্রায় সে আচ্ছন্ন হয় যে, ঘুমের ঘোরেই সে মাইলের পর মাইল চলে যায়, কাজ করে ফেলে, কাউকে হয়ত মারে, কিছু ভেঙ্গে ফেলে, আবার ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে। এতসব কাণ্ড হবার পরেও তার ঘুম ভাঙ্গে না। এমন নিদ্রায় এক বিশেষ ধরনের শক্তি উৎপন্ন হয় এবং ঐ শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে ব্যক্তি অনেক অসম্ভব কাজও করে ফেলে। দর্শনাবরণ কর্মের বিপাকের জন্যই এমন হয়।

মোহ-কর্মের বিপাক হলে রাগ-দ্বেষের চক্র চলতে থাকে, বিভিন্ন ধরনের আবেগ উৎপন্ন হয়, নানা ধরনের বাসনা জেগে ওঠে, ভয় জাগে এবং অন্যান্য আবেগগুলিও কার্যরত হয়।

কর্ম-বিপাকের এই চক্র অবিরাম ঘুরতে থাকে। কখনও একটি বিপাক জেগে ওঠে, কখনও অন্যটি। এই নিরন্তরতা ভাঙ্গে না। এসব বিপাককে কি আমরা নিরস্ত করতে পারি? না, এদের নিরস্ত করা যার না। তবে, আমরা এদের আটকাতে পারি।

কর্মকে না বাঁধার, কর্মবীজকে সমাপ্ত না করার একটি প্রক্রিয়া আছে। কর্মের বন্ধন না থাকুক, আমরা যেন তাতে জাগরূক থাকি, অপ্রমত্ত থাকি। এটিও সাধনার একটি প্রক্রিয়া।

সাধনার আরও একটি প্রক্রিয়া হল, যে বিপাক আসতে পারে, আগেই তার প্রতি জাগরূক থাকা। ঐ বিপাককে হয় আমরা

বদলে দেব, নয়ত ঐ বিপাককে আসতেই দেব না। কর্মকে আমরা বেঁধে দিয়েছি। কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। আমাদের অজ্ঞানতাবশত, প্রমাদবশত, আমাদেরই ভুলের জন্য ঐ কর্ম এসে লেপটে পড়েছে। ঐ কর্ম পরিণাম দিতে সক্ষম। তার বিপাক-কাল আছে। আমরা জাগরূক থাকব। জেগে উঠব। আমাদের প্রমাদ-নিদ্রা ভাঙ্গবে। চেতনার কিছু রশ্মি আলোকিত হয়ে উঠবে। এসব কিছুই অসম্ভব নয়, সম্পূর্ণ সম্ভব। অসাধ্য কাজ নয়, সাধ্য কাজ। ঐ কর্মকে আমরা মাঝপথেই বদলে দেব, তার শক্তিতে এমন পরিবর্তন আনব যে, তার বিপাক না হয়। প্রসঙ্গটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরই দিকে আমাদের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

বিপাকের নিমিত্ত

বিপাক হয় কারণ থেকে। নিমিত্ত ছাড়া বিপাক হতে পারে না। প্রজ্ঞাপনা সূত্রে এর সুন্দর আলোচনা রয়েছে। বিপাকের জন্য পাঁচটি শর্ত আছে—দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল, ভাব এবং ভব। এই পাঁচটি শর্ত পূরণ হলে তবেই কর্মের বিপাক হতে পারে, অন্যথা নয়। এই আধারে কর্মের চারটি প্রকৃতি ভাগ করা হয়েছে—ক্ষেত্রবিপাকী, জীববিপাকী, ভাববিপাকী এবং ভববিপাকী। এই চারটিকে যদি আমরা ঠিকমত বুঝে নিই এবং কর্মশাস্ত্রের রহস্যের গভীরে গিয়ে তাকে ধরে ফেলি, তাহলে অনেক পরিবর্তন আনা সম্ভবপর। যদি কর্মের হেতুগুলিতে এবং বন্ধ কর্মগুলিতে কোন পরিবর্তন করা না যায় তাহলে সাধনার কোনই অর্থ হতে পারে না, তা অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। তাহলে আমাদের সাধনার প্রয়োজন কোথায়? কেন আমরা এত পুরুষার্থ করব? কেন প্রেক্ষা করব? কেন চোখ বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করব? যদি আমরা কিছু পরিবর্তন করতে না পারি তাহলে এসব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ, একেবারে শূন্য। কিন্তু এমন হয় না। সাধনার দ্বারা আমরা বদলে যেতে পারি। সাধনার মাধ্যমে আমরা ঐ বিপাকগুলির মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারি, এটা

আমাদের একটা খুব বড় ক্ষমতা। কিন্তু এসব তখনই সম্ভব হতে পারে যখন আমরা কর্মশাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করে কর্মের প্রকৃতি ও স্বভাবগুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে বুঝে নিই এবং কিভাবে ওদের পরিবর্তন আনতে পারি তার উপায়ও জেনে নিই।

পরমাণুগুলির একটি পরিণাম হল, বেদনীয় কর্ম। বেদনীয় কর্মের *দুটি প্রকৃতি* আছে—সাত *বেদনীয় এবং অসাত বেদনীয়।* সুখের বেদন হয়, আবার দুঃখেরও বেদন হয়। প্রীত্যাত্মক এবং অপ্রীত্যাত্মক, উভয় অনুভূতিই হয়। অসাত বেদনীয়ের উদয় হয় কেন? এর অনেক কারণ আছে। একটি কারণ হল, পরমাণু। ওগুলিতে এমন কোন স্পর্শ লেগেছে, এমন কোন আঘাত লেগেছে যে পায়ে ব্যথা হল। উদয় হল অসাত বেদনীয়ের। মন তাতে যায়, সাধানায় যায় না। মনের যাবতীয় শক্তি পায়ের ওপর প্রবাহিত হতে শুরু করে। সাধনার স্পর্শও তা করতে পারে না। অসাত বেদনীয়ের উদয়ের একটি কারণ হল, পরমাণুর পরিণাম। যেমন—খুব খেয়ে নিয়েছি, ক্ষিধের চেয়ে বেশি খেয়েছি। অজীর্ণ হল। পেটে ব্যথা শুরু হল। এখন সারা মন সেদিকেই ধাবিত হয়, বিপাকের দিকে যায়, সাধানার দিকে যায় না। পরমাণুর পরিণামের জন্য অসাতের যে বিপাক হয় তাকে আমরা বদলাতে পারি। এজন্যই বলা হয়—বেশি খাবে না। ভোজনের মাত্রাকে ঠিক রাখ। সাধনাক্ষেত্রে ভোজনের দিকে দৃষ্টি দেবার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিনি সাধনা করবেন তাঁর জানা দরকার, কখন খাবেন, কেন খাবেন, কতটা খাবেন আর কিভাবে খাবেন। খুব দই খেয়ে ধ্যান করতে বসলেন। ধ্যানের সময় ঘুম আসতে লাগল। এ হল দর্শনাবরণীয় কর্মের বিপাক। এখানে দর্শনাবরণীয় কর্মের বিপাকের কারণ হয়েছে আমাদের ভোজন। এজন্যই এমন ভোজন করা উচিত নয় যাতে অসাত বেদনীয় বা দর্শনাবরণীয় কর্মের বিপাকের কারণ তৈরি হয়। অনেক লঙ্কা-মসলা খেয়ে তামসিক ভোজন সেরে ধ্যানে বসলেন।

মনে উত্তেজনা উথলে উঠতে লাগল, বিকৃতি সৃষ্টি হতে শুরু করল, মন ধ্যান থেকে সরে গেল। এতে আমরা ভোজনের পরিণতি দ্বারা বিপাককে নিমন্ত্রণ জানালাম। এজন্যই বিপাকের নিমিত্তের ওপর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। উপাদানের মহত্ত্ব থাকলে নিমিত্তের মহত্ত্বও কম নয়। বরং নিজের জায়গায় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই আমরা কিভাবে বসব, কি ভোজন করব, কতটা আহার করব, কেমন করে আহার করব, কোন্ বাতাবরণে থাকব, এসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কষ্ট-সহিষ্ণুতার অভ্যাস

কিছু প্রসঙ্গ আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন, আবার কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, যেমন—বর্ষাঋতু। আকাশ মেঘে ঢাকা রয়েছে। এই পরিবেশ দর্শনাবরণীয় কর্মের উদয়ের সুযোগ করে দেয়। ঘুম আসতে থাকে। এটা আমাদের ভুলের পরিণাম নয়। আমরা বেশি খেলাম, অবাঞ্ছিত ভোজন হল এবং নিদ্রা আসতে লাগল—এটা আমাদের ভুলের পরিণাম। নিজের ভুলের জন্য আমরা কর্ম বিপাককে নিমিত্ত প্রদান করলাম। দুভাবেই বিপাকের উদয় হতে পারে। এক, প্রাকৃতিক পরিবেশ বা অন্য কারণ থেকে এবং দুই, আমাদের ভুল বা প্রমাদের কারণে। নিমিত্ত পেলেই বিপাকের উদয় ঘটবে। ঐ পরিস্থিতিতে আমরা কি করব? তখন কষ্টসহিষ্ণু হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। সাধনার জন্য, আবেগগুলিকে কম করার জন্য কষ্টসহিষ্ণুতার অভ্যাস করাটা খুবই প্রয়োজন। যিনি কষ্টসহিষ্ণু নন, বিপদের মোকাবিলা যিনি করতে পারেন না, তিনি যেমন সাধনা করতে পারেন না, তেমনি কর্মের চক্রব্যূহওে ভাঙ্গতে পারেন না।

অরাগ চেতনা, অদ্বেষ চেতনা

ভগবান মহাবীর ধর্মের দুটি লক্ষণের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ধর্মের প্রথম লক্ষণ হল অহিংসা, রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন না

হওয়া। ধর্মের দ্বিতীয় লক্ষণ হল, পরিষহসহন বা কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা। জীবনে দ্বন্দ্ব আসে। কখনও সুখ আসে, কখনও দুঃখ। কখনও থাকে অনুকূল পরিবেশ, কখনও প্রতিকূলতা। কখনও প্রিয়তার অনুভূতি হয়, কখনও অপ্রিয়তার। কখনও প্রশংসা হয়, কখনও নিন্দা। কখনও উপলব্ধি হয়. কখনও হানি। এই যে সব দ্বন্দ্ব আসে, একে সহ্য করার মত তিতিক্ষার চেতনা যতক্ষণ জাগ্রত না হয়, ততক্ষণ যেমন সাধনা হয় না, তেমনি আবেগও কমে না। এই পরিস্থিতিতে কর্মের বূহ্যকেও ছিন্ন করা যায় না। এজন্য আমাদের মধ্যে উভয় প্রকার শক্তিই জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। একটি হল অ-রাগ শক্তি এবং অপরটি হল অ-দ্বেষ শক্তি—অ-রাগ চেতনা এবং অ-দ্বেষ চেতনা। বীতরাগ চেতনার সঙ্গে সঙ্গে তিতিক্ষার চেতনাও জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। তিতিক্ষা না থাকলে রাগও আসতে পারে, দ্বেষও আসতে পারে। অনুকূলতায় রাগ আসবে। রাগকে সহ্য করার শক্তি থাকা প্রয়েজন। অনুকূলতাকে সহ্য করার শক্তি। মনের অনুকূল কোন ঘটনা ঘটলে যদি আমরা তা সহ্য করতে না পারি তাহলে রাগ উৎপন্ন হবে, আবেগও তৈরি হবে। প্রচুর হর্ষ হওয়াটা আধ্যাত্মের দৃষ্টিতে যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, স্বাস্থের দৃষ্টিতেও নয়। এটি অকালমৃত্যুর কারণ হয়।

একটি লোক ছিল খুবই গরীব। লটারিতে সে দু লাখ টাকা পেল। একজন এসে বলল—ভাই। তুমি তো বাজি মাত করে দিয়েছ। তোমার নানে লটারিতে দু লাখ টাকা উঠেছে। লোকটি বলল—দু লাখ! এই বলে সে ধরাম করে নিচে পড়ে গেল এবং ইহলোক ত্যাগ করল।

তিতিক্ষার চেতনা

অনুকূলতা প্রতিকূলতাকে সহ্য করার জন্য তিতিক্ষার চেতনা জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি বিরাট স্থিতিতে রয়েছে। তার উপলব্ধি বিরাট বড়। সমস্ত সংযোগ অনুকূল। হঠাৎ সব কিছু

হারিয়ে যায়। সত্তা হারিয়ে যায়, অধিকার হারিয়ে যায়। সম্পদ নষ্ট হয়, পরিবার বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এই স্থিতিতে প্রতিকূলতাকে সহ্য করার চেতনা যদি জাগ্রত না হয়, তাহলে ব্যক্তি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যার এই চেতনা জাগ্রত হয় তার ক্ষেত্রে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতায় কোনই পার্থক্য দেখা দেয় না।

জৈন আগমে নমি রাজর্ষির এক উদাহরণ দেওয়া আছে, ব্যবহারিক পৃথিবীতে তা প্রকৃত পক্ষে মান্য নয়, কিন্তু এই উদাহরণ হল সেই চেতনার প্রতীক, সেই চেতনার দিগদর্শক, যে চেতনার বিন্দুতে পৌঁছিলে ব্যক্তির মধ্যে তিতিক্ষার চেতনা জাগ্রত হয়, কোন প্রকম্পনই অবশিষ্ট থাকে না। রাগের কোন প্রকম্পন হয় না, দ্বেষেরও প্রকম্পন হয় না।

নমি রাজর্ষিকে বলা হয়েছিল—আপনার অন্তঃপুর জ্বলছে। আগুন লেগেছে তাতে। অগ্নিশিখা আকাশকে ছেয়ে ফেলেছে। আপনার প্রাসাদ জ্বলছে। আপনার নগরী জ্বলছে। নমি রাজর্ষি বললনে—আমি সুখে বেঁচে আছি, সুখেই রয়েছি। কার অন্তঃপুর। কার প্রাসাদ। কার নগরী। আমরা কিছুই নয়। মিথিলা জ্বললেও আমার কিছুই জ্বলছে না।

কি রকম ব্যবহারিক জগতের বাইরের কথা বলে মনে হচ্ছে। কি করুণাহীন কথা। করুণাবান কোন মানুষ কি এমন কথা বলতে পারেন? নিদারুণ ক্রুর ব্যক্তিই কেবল এমন কথা বলতে পারেন। কিন্তু আমরা বহু ক্ষেত্রে ভূমিকা ভেদকে না বুঝে ভয়ঙ্কর ভুল করে বসি। নমি রাজর্ষির এই স্থিতিকে যদি আমরা ক্রুরতায় পরিপূর্ণ বলে ধরি, তাহলেও কিন্তু বিরাট ভুল হবে। এ হল সেই তিতিক্ষার, সেই পরম চেতনার স্থিতি, যেখানে পৌঁছে সাধক অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতার প্রকম্পনের বাইরে চলে যান। এই চেতনা এমন অপ্রকম্প হয় যেখানে কেবল চেতনাই থাকে, আর কিছুই থাকে না।

রাগ ও দ্বেষ যাতে না থাকে সেজন্যই চেতনায় তিতিক্ষার বিকাশ

হওয়া প্রয়েজন। এই দ্বন্দ্বকে সহ্য করার উপযুক্ত চেতনার বিকাশ যদি না হয় তাহলে রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হবেই। কিছুতেই তাকে আটকানো যায় না।

প্রতিপক্ষ ভাবনার বিকাশ

এ বীতরাগ চেতনা এবং তিতিক্ষার চেতনা—উভয় ধরনের চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে আমরা কর্ম-বিপাকে পরিবর্তন আনতে পারি। যদি তিতিক্ষার চেতনা বিকশিত হয় তাহলে মোহনীয় কর্মের বিপাক হতে পারে না, আবেগ হতে পারে না। আবেগ তখনই হয় যখন তিতিক্ষার চেতনা বিকশিত হয় না। অহঙ্কার এবং মমকার-শূন্য চেতনা বিকশিত হয় না, এজন্যই আবেগ আসে। আমরা প্রতিপক্ষের চেতনাকে বিকশিত করব। ক্রোধ হলে মৈত্রীর চেতনাকে বিকশিত করব। মৈত্রীর সংস্কারকে সুদৃঢ় করব। মৈত্রীর সংস্কার দৃঢ় হলে ক্রোধের আবেগ আপনা থেকেই কম হতে শুরু করবে। এভাবে প্রতিপক্ষ ভাবনা হল সাধনার একটি বড় সূত্র।

দশবৈকালিক সূত্রে চারটি আবেগের প্রতিপক্ষ ভাবনার চমৎকার নিরূপণ করা হয়েছে। যদি ক্রোধের আবেগকে মেটাতে হয়, কম করতে হয় তাহলে উপষমের সংস্কারকে পরিপুষ্ট করতে হবে। ক্রোধের প্রতিপক্ষ হল উপশম। উপশমের সংস্কার যেমন পুষ্ট হবে, ক্রোধের আবেগ ততই ক্ষীণ হতে শুরু করবে। মানের আবেগ নষ্ট করতে হলে মৃদুতাকে পুষ্ট করতে হবে। মানের প্রতিপক্ষ হল মৃদুতা। মায়ার আবেগ নষ্ট করতে হলে ঋজুতার সংস্কারকে পুষ্ট করুন। ঋজুতা এবং মৈত্রীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মৈত্রী হল ঋজুতারই প্রতিফলন। যখন ঋজুতা থাকে তখন কারুর সঙ্গে শত্রুতাও থাকতে পারে না। শত্রুতার আগে আসে কুটিলতার সঙ্গে আসে শত্রুতা। কুটিলতা ছাড়া শত্রুতা সম্ভব নয়। যখন লুকোনোর প্রসঙ্গ, কিছু লুটে নেবার প্রসঙ্গ, কাউকে ঠকানোর প্রসঙ্গ আসে তখন কারুর সঙ্গে

অমৈত্রীর ভাব আসবে। যেখানে লুকোনোর কিছু নেই, সরলতা রয়েছে, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জীবন, সেখানে শত্রুতা থাকতে পারে না। মায়ার প্রতিপক্ষ হল ঋজুতা। লোভের আবেগকে যদি নষ্ট করতে হয় তাহলে সন্তোষকে বিকশিত করুণ, তাকে পুষ্ট করুন।

আবেগগুলিকে মেটাতে হলে প্রতিপক্ষের সংস্কারকে পুষ্ট করতে হবে। প্রতিপক্ষ সংস্কার যতক্ষণ পুষ্ট না হবে আবেগের তনুভাব না করা হবে, তাদের ততক্ষণ ক্ষীণকায় করা যাবে না, ক্ষীণ করা যাবে না। আবেগ ক্ষীণ না হলে তাদের ছিন্ন করা যায় না। তাদের এমন ক্ষীণ করতে হবে যেন এক ঝটকায় ত'দের সরিয়ে দেওয়া যায়।

ক্রোধ, মান, মায়া এবং লোভ—এই হল চার আবেগ। এদের প্রতিপক্ষ ভাবনাকে পুষ্ট করলে আবেগগুলি শান্ত হয়ে যায়। এদের বিপাক বন্ধ হয়। ভয়, কামবাসনা, ঘৃণা প্রভৃতি আবেগের জন্য প্রতিপক্ষের ভাবনা জরুরী। সাধনায় প্রতিপক্ষ ভাবনার খুবই গুরুত্ব আছে। এদের ছাড়া আবেগগুলিকে বিতাড়িত করা যায় না। আমাদের অভয় ভাবনা যেমন পুষ্ট হবে, ভয়ের আবেগও তেমনি ক্ষীণ হবে। চেতনার ভাবনা, চৈতন্যানুসন্ধান যেমন পুষ্ট হবে, কামবাসনা ততই ক্ষীণ হবে। একত্ব যত বিকশিত হবে, ঘৃণা ততই আপনা থেকে চলে যাবে।

প্রতিপক্ষকে পুষ্ট করা আমাদের কর্তব্য, আমাদের পুরুষার্থ এবং সঙ্কল্প। কর্মের অনিষ্ট বিপাকে যেমন কিছু নিমিত্ত হয়, কর্মের ইষ্ট বিপাকেও তেমনি কিছু নিমিত্ত হয়। কারুর জ্ঞানাবরণ কর্মে কোন বিপাক রয়েছে। তিনি চাইছেন, জ্ঞানাবরণ কর্মের বিপাক কম হোক। এর জন্য কিছু সাধন আছে। আচার্য মলয়গিরি প্রজ্ঞাপনার টীকায় অনেক উপায় নির্দিষ্ট করেছেন। ব্রাহ্মী প্রভৃতি জরিবুটি আছে, সেগুলি সেবনে জ্ঞান-বিকাশের সহায়ক হয়।

মনের একাগ্রতা এবং পদার্থ

মনের একাগ্রতায়ও কিছু পদার্থ সহযোগী হয়, কিছু নিমিত্ত হয়।

আপনি ধ্যান করতে বসেছেন। ঐ সময় যদি আপনার হাতে পারদের বড়ি থাকলে, তাহলে তা আপনার একাগ্রতা আনার সহায়ক হবে। ধ্যান-কাল দীর্ঘ হতে পারে। সাধনার কিছু কিছু প্রক্রিয়ায় রুদ্রাক্ষেরও প্রয়োগ হয়। তারও একটা মানে আছে, প্রয়োজন আছে, মন যেমন পদার্থকে প্রভাবিত করে, পদার্থগুলিও তেমনি মনকে প্রভাবিত করে। ইষ্ট এবং অনিষ্ট, উভয় ধরনের কর্ম-বিপাকে পরমাণুগুলির যোগ থাকে। আণবিক পরিণতিগুলি ঐ বিপাককে যেমন বাড়িয়ে দিতে পারে, তেমনি কমাতে পারে।

একটি লোক মদ খায়। মদ হয়ে দাঁড়ায় মোহ-কর্মের বিপাকে একটি নিমিত্ত। মূর্চ্ছা আসে। এমন জিনিস কি নেই, যা সেবনে আমাদের জাগরণ ঘটে, মোহ-কর্মের বিপাক কম হয়? এমন পদার্থ আছে। এমন হতেও পারে। কোন বস্তু সেবনে যদি কামবাসনার উত্তেজনা আসে, তাহলে এমন কি জিনিস নেই যা সেবনে কামবাসনা শান্ত হয়ে যাবে? এমন জিনিস আছে। জিনিসের অভাব নেই। আমাদের জানায় অভাব থাকতে পারে। পরীক্ষার সময় এলে অনুভবী মাতা-পিতা ছেলেমেয়েকে এমন সব ওষুধ খাওয়ান যাতে তাদের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি তীব্র হয় এবং পরীক্ষায় ওগুলি তাদের সহায়ক হয়।

ধ্যানকালে শক্তি ব্যয় হয়। মস্তিষ্কের অনেকটা শক্তি খরচ হয়। আমাদের মস্তিষ্কের বিদ্যুৎকে অনেক কাজ করতে হয়। অনেক উষ্মা তৈরি হয়। ব্যয় হয় অনেক। আমি এক হোমিওপ্যাথ চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, শক্তির ভারসাম্য তৈরি করার জন্য অমুক জিনিস সেবন উচিত হবে কিনা। তিনি বললেন—হ্যাঁ, খুবই উচিত। যে শক্তি ব্যয় হবে, এই পদার্থ থেকে তা পাওয়া যাবে। শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি হবে ধ্যানে সহযোগিতা পাবেন।

সরদারশহরের শেঠ সুমেরমলজী দুগড়ের সুপুত্র ভওরলালজী ছিলেন কুশলী চিকিৎসক। খুবই অনুভবী মানুষ। প্রায় পনের-

কুড়ি বছর আগে উনি একদিন আমাকে বলেছিলেন—আপনাকে খুব বেশি পরিমাণ মস্তিষ্কের শক্তি খরচ করতে হয়। লিখতে হয়, অনেক চিন্তাও করতে হয়। এসব কাজে মস্তিষ্কের শক্তির প্রচুর ব্যয়িত হয়। আপনি এখন থেকে শক্তির ভারসাম্য আনার চেষ্টা করুন, যাতে যতটা ব্যয় হবে তা পূর্ণ হয়। নইলে কিন্তু পরে বিপদ দেখা দিতে পারে। উনি কিছু কিছু উপায়ের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—আপনি শুকনো আমলা খান, গোল-মরিচ সেবন করুণ। কখনও কখনও মুক্তাও সেবন করবেন, যার ফলে মস্তিষ্কের যে শক্তি ব্যয় হবে, তা পূর্ণ হবে।

আমি মাঝে মাঝে ঐ উপদেশ অনুসরণ করেছি এবং খুবই লাভবান হয়েছি। পরমাণুগুলি যেমন কর্মবিপাকের নিমিত্ত হয়, তেমনি কর্মের ক্ষয়োপশমনেরও নিমিত্ত হয়ে দাঁড়ায়। কর্মের বিপাকও নিমিত্ত ছাড়া হতে পারে না। এই নিমিত্তের কথা যেন আমরা না ভুলি।

আবেগের উপশমনে যেমন আমাদের আন্তরিক পরিণতিগুলিকে বদলে দেবার প্রয়োজন আছে, তেমনি নিমিত্তকে জানা এবং তাকে করার প্রয়োগ—পদ্ধতিরও প্রয়োজন আছে।

১৬.

স্বতন্ত্র বা পরতন্ত্র ?

- আমরা কাজ করার ব্যপারে স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র ?
- চৈতন্যকে সতত অনুভব করলে আমরা স্বতন্ত্র।
- চৈতন্যের অনুভব বিস্মৃত হলে আমরা পরতন্ত্র।
- মানুষ নিজের কর্তৃত্বে স্বতন্ত্র, পরিণাম ভোগার ব্যাপারে পরতন্ত্র।
- স্বতন্ত্রতার স্বয়ম্ভূ প্রমাণ—
  আমাদের চৈতন্যের, বিকাশ, আমাদের আনন্দের বিকাশ। আমাদের শক্তির বিকাশ, আমাদের পূর্ণ জাগরণ।
- উপাদান সৃষ্টির শক্তি কারুর নেই।
- কর্ম আত্মার উপাদানভূত স্বভাবগুলিকে তৈরি করতে পারে না।
- আত্মার উপাদানভূত স্বভাব — অনন্ত চৈতন্য, অনন্ত আনন্দ, আনন্ত শক্তি, অনন্ত জাগরণ।

আবেগ হল বিভাব

দ্রব্যের নিজের নিজের স্বভাব থাকে। স্বভাব কখনও নির্মূল হয় না, তাকে কখনও নিরস্ত করা যায় না বিভাব স্বভাবকে কিছুটা বিকৃতও করতে পারে, আবৃতও করতে পারে, কিন্তু নিরস্ত করতে পারে না, শূন্য করতে পারে না।

আবেগ চৈতন্যের স্বভাব নয়। আবেগ হল চৈতন্যের সঙ্গে উৎপন্ন

মূঢ়তা। এটা মোহ, বিকৃতি, কিন্তু স্বভাব নয়। এজন্যই এই সম্ভাবনা শেষে থেকে যায়, যে, আবেগকে নিরস্ত করা যায়। যা এসে যুক্ত হয়েছে, সেই যোগকে দূর করা যায়। তাকে কাটান যেতে পারে। একে কাটাবার অনেক উপায় আছে, সাধন আছে। এসব সাধনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল—চৈতন্যের অনুভব, সংবর, শুদ্ধ উপযোগ। চৈতন্যকে যখন আমরা অনুভব করি তখন সংবরের স্থিতি হয়, আমাদের সংবর হয়। চৈতন্যের অনুভব হলে কোন হতে পারে না। আবেগ তখনই হয় যখন চৈতন্যের অনুভব লুপ্ত হয়ে যায়। যখন চৈতন্যের উপর মূর্চ্ছা ছেয়ে যায়, চৈতন্যের ওপরে যখন আবরণ আসে, তখন আবেগ বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়। চৈতন্যের অনুভূতি হলে আবেগ আসতেই পারে না।

সংবর যোগের পুষ্টি

আমাদের সাধনার সূত্র হল, চৈতন্যের সতত অনুভব। চৈতন্য অনুভবের স্থিতি যদি নিরন্তর বজায় থাকে, তবে আমাদের সংবর. হতে থাকে। সংবরের আগমনে দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। চৈতন্যের অনুভব হলেই সব দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। কোন দরজাই খোলা থাকবে না। সব দ্বার বন্ধ, সব খিড়কি বন্ধ। ঐ সময় আবেগ আসতে পারে না, উত্তেজনা আসতে পারে না, বাসনাও আসতে পারে না। সব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এজন্যই ভগবান মহাবীর বলেছেন, সাধনার চরম শিখর হল 'অযোগ' এখানে সব যোগ শেষ হয়ে যায়। এই 'অযোগ' শব্দটি বড়ই জটিল। সব আচার্যই 'যোগ' শব্দটি নির্বাচন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যোগের সাধনা কর। ভগবান মহাবীর বলেছেন - 'না, অযোগের সাধনা কর। যোগকে শেষ কর, সম্বন্ধ ছিন্ন কর।' এ থেকে কি হবে? এতে সব কিছু ঘটবে, কারণ পাওয়ার কিছুই নেই। বাইরে থেকেই নেওয়ারও কিছু নেই। আমরা সবাই নিজেরাই নিজের ভেতরে সম্পূর্ণ। উপাদেয় কিছুই নেই। বাইরে এমন কোন জিনিস নেই যা নিজের

পক্ষে হিতকর। বাইরে যেসব জিনিস আছে তাদের ত্যাগ করাই হিতকর। সব সম্বন্ধ ভঙ্গ করা, আযোগ করাই হিতকর। অন্তিম শিখর হল, অযোগ। যখন সম্যকত্বের সংবর হয়, ব্রতের সংবর হয়, অপ্রমাদের সংবর হয়, অকষায়ের সংবর হয়, তখনই আসে অন্তিম শিখর—অযোগ সংবর। যেখানে আমরা সব সম্বন্ধ বাদ দিই, সেখানে অযোগ হয়। সেখানে পূর্ণ বিকাশ হয়, পরমাত্মার পূর্ণ স্থিতির উপলব্ধ হয়। অযোগ সংবর ঘটিত হওয়া মাত্রই আত্মার সঙ্গে পরমাণবিক সম্বন্ধ আছে, তা সব একসাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যখন চৈতন্যের অনুভব শুরু হয়, তখন যোগ ছিন্ন হতে শুরু করে। মূঢ়তার গভীর বলয় ছিন্ন হতে থাকে। কর্মের সঙ্গে আমরা যে সম্বন্ধ স্থাপন করি, তার সবটাই চৈতন্যের স্মৃতির কারণে ঘটে। যখন চৈতন্য বিস্মৃত হয়, তখন কোন না কোন পরমাণু আমাদের সঙ্গে জুড়ে যায় এবং নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। চৈতন্যের অনুভব যখন আমাদের মধ্যে হয়, নিজেদের হুঁশ যখন আমার ফিরে পাই, তখন ঐ পরমাণুগুলির প্রভাব মন্দীভূত হতে শুরু করে, লুপ্ত হতে থাকে। ধীরে ধীরে পরমাণু সবে যেতে থাকে, দূর হতে থাকে। ঐ সময় আমাদের অস্তিত্ব আলোকিত হয়।

কর্ম করলে তা স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র?

বহুবার—আমাদের সামনে এই প্রশ্ন আসে, আমরা স্বতন্ত্র, না পরতন্ত্র? আমরা কর্ম করার ব্যাপারে স্বতন্ত্র, না পরতন্ত্র? আমরা কর্মফল ভোগের ব্যাপারে স্বতন্ত্র, না পরতন্ত্র?

স্বতন্ত্রতা এবং পরতন্ত্রতার নিশ্চিত উত্তর দেওয়া যায় না। উভয়ে হল পরস্পর সাপেক্ষ। আমরা স্বতন্ত্রও বটে। আমরা চৈতন্যবান। আমাদের স্বভাব সব দ্রব্যের চেয়ে বৈলক্ষণ্যযুক্ত। কোন দ্রব্যের স্বভাব চৈতন্য নয়, কিন্তু আমাদের স্বভাব চৈতন্য—এজন্যই আমরা স্বতন্ত্র। কিন্তু চৈতন্যের অনুভব যখন আমরা বিস্মৃত হই, এই চৈতন্যের আগুনের ওপরে যখন কোন আবরণ আসে, যখন

ঐ জ্বলন্ত আগুন ঐ আবরণে ঢেকে যায়, তখন আমরা পরতন্ত্র হই স্বতন্ত্রতা এবং পরতন্ত্রতার উত্তর সাপেক্ষ দৃষ্টির সাহায্যে দেওয়া যায়। এর নিরপেক্ষ উত্তর হাতে পারে না।

আমরা কোন কাজ করলাম, কর্ম করলাম। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হবে, এটা স্বাভাবিক। এমন একটি ক্রিয়াও নেই যার প্রতিক্রিয়া হয় না। সব ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া হয়। ক্রিয়া করলে মানুষ স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রক্রিয়ায় সে পরতন্ত্র হয়। 'কডেণ মুঢ়ো পুণো তং করেই'—যা ক্রিয়া' তার থেকে মোহ তৈরি হয়। ব্যক্তি মূঢ় হয়ে পড়ে এবং সে তার পুনরাবৃত্তি করে। একবার ব্যক্তি কোন কাজ করে নিল। দ্বিতীয় বার তার পুনরাবৃত্তি করা জরুরী হয়ে পড়ে, কারণ তার সংস্কার তৈরি হয়ে যায়। ঐ সংস্কারের আধারে দ্বিতীয়বার অমন পরিস্থিতি এলে তেমন করার প্রেরণা পাওয়া যায়। তা আমাদের মানসিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। মন চায় ওর পুনরাবৃত্তি করতে। ব্যক্তি মূঢ় হয়ে ঐ ক্রিয়ার পিছনে দৌড়য়, ঐ কাজের পুনরাবৃত্তি করবার ইচ্ছা যাগে। তখন আমরা পরতন্ত্র হয়ে যাই। আমরা কিছু করলাম, একটা সংস্কার তৈরি হল, একটা অভ্যাস গড়ে উঠল, তখন ঐ কাজ করতেই হবে। এ হল পরতন্ত্রতার কথা। আমরা পরতন্ত্র, আবার স্বতন্ত্রও বটে। আমাদের চৈতন্য শক্তি, আমাদের সঙ্কল্প-শক্তি এত প্রবল হয় যে, যদি তা জেগে উঠে সিদ্ধান্ত নেয় এ কাজ করা উচিত নয়, তাহলে সঙ্কল্প এমন দৃঢ় হয়ে ওঠে যে সংস্কার যতই প্রবল হোক না কেন, আমরা এক ঝটকায় তাকে ভেঙ্গে ফেলতে পারি।

স্বতন্ত্রতা এবং পরতন্ত্রতা উভয়কে সাপেক্ষ দৃষ্টির মাধ্যমেই বোঝা যায়। একটি লোক নারকেল, খেজুর বা তাল গাছে উঠল। ওঠার সময়ে সে স্বতন্ত্র। নিজের ইচ্ছায় সে ওপরে উঠেছে। এখন, নামার সময়ে সে কিন্তু স্বতন্ত্র নয়। কেন? ওপরে ওঠাটা একটা ক্রিয়া। ওপরে উঠলে নিচে নামতেই হবে। ওঠার সময়ে সে স্বতন্ত্র, কিন্তু

নামার সময়ে পরতন্ত্র। এখন তাকে নামতেই হবে, যেহেতু সে ওপরে উঠেছে। ওঠার পরিণাম হল নামা। নামাটা কোন স্বতন্ত্র কাজ নয়।

মহম্মদের এক শিষ্যের নাম ছিল আলি। উনি একবার প্রশ্ন করলেন, 'আমি কাজ করার ব্যাপারে স্বতন্ত্র, বা পরতন্ত্র?' মহম্মদ বললেন, 'নিজের বাঁ পা তোল। আলি নিজের বাঁ পা তুললেন। মহম্মদ আবার বললেন, 'এবার নিজের ডান পা তোল।' সমস্যায় পড়লেন। বাঁ পা তো আগেই তোলা আছে। এখন ডান পা তিনি কিভাবে তুলবেন? উনি বললেন, 'প্রভু! ডান পা এখন ওপরে তোলা কিভাবে সম্ভব?' মহম্মদ বললেন, 'এক পা তুললে তুমি স্বতন্ত্র, কিন্তু দ্বিতীয় পা তুললে তুমি স্বতন্ত্র নও, পরতন্ত্র।'

স্বতন্ত্রতা এবং পরতন্ত্রতা—উভয়ে হল সাপেক্ষ। তাদের নিরপেক্ষ ভাবা ভুল। মানুষ নিজ কর্তৃত্ব হল স্বতন্ত্র, আবার পরিনাম ভোগার সময় পরতন্ত্র। কর্তৃত্বকালে আমরা স্বতন্ত্র, কিন্তু পরিণামকালে আমাদের পরতন্ত্র হয়ে পড়তে হয়। বিকাশের সময় আমরা স্বতন্ত্র। আমাদের যতটা বিকাশ হয় তাকে আমাদের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব বলা হয়। কোন কর্ম দ্বারা আমাদের বিকাশ হয় না। কর্ম দ্বারা আমাদের বিকাশের অবরোধ হয়। আপনি ভাববেন, শুভ নামকর্ম দ্বারা ভাল ফল পাওয়া যায়, সুনাম হয়, পদার্থের উপলব্ধি ঘটে, যশলাভ হয়। এসব কিন্তু আত্মার বিকাশ নয়। সবই হল পারমাণবিক জগতে সংঘটিত ঘটনা। এর মাধ্যমে আত্মার বিকাশ হয় না। আত্মার স্বভাব হল, চৈতন্য। আত্মার স্বভাব হল, আনন্দ। আত্মার স্বভাব হল, যুক্তি। চৈতন্যের বিকাশ আনন্দের বিকাশ, শক্তির বিকাশ—কিছুই কর্মের উদয় দ্বারা হয় না। কর্ম এসব বিকাশকে আটকায়, বাধা দেয়, সেখানে অবরোধ তৈরি করে। কোন পরমাণুই বিকাশের মূল হেতু হয় না।

আমাদের চৈতন্যের বিকাশ, আনন্দের বিকাশ, শক্তির বিকাশ,

আমাদের পূর্ণ জাগরণ ঘটে আমরা স্বতন্ত্র বলেই। আমাদের স্বতন্ত্র হওয়ার সবচেয়ে প্রমান হল, আমাদের বিকাশ হয় এবং আমরা স্বতন্ত্র বলেই সেই বিকাশ ঘটছে। আমরা স্বতন্ত্র না হলে কখনই আমাদের বিকাশ হতো না। কর্মের উদয়ে বাধা উপস্থিত হতে থাকে। আমাদের বিকাশ কখনই হয় না। আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা আছে, স্বতন্ত্র উপানাত আছে—সেজন্যই বিকাশ হয়।

মাটি কলসীতে রূপান্তরিত হয়। কোন কুম্ভকারের হাতের আঙ্গুল এই চমৎকার পরিবর্তন আনে না। মাটিতে রয়েছে কলসী তৈরির উপাদাণ। ঐ উপাদান আছে বলেই কলসী তৈরি হয়। এই নির্মাণকার্যে আরও নানা নিমিত্ত ও সহায়ক হতে পারে। কিন্তু মাটির কলসীর রূপে পরিবর্তিত হওয়ার মূল হল উপাদান। উপাদানকে উৎপন্ন করা যায় না। অন্যান্য সাধন সহায়ক-সামগ্রী হতে পারে, কিন্তু তারা সবাই মিলেও উপাদান তৈরি করতে পারে না। উপাদানকে তৈরি করার শক্তি কোন কিছুর মধ্যেই নেই।

আত্মা স্বতন্ত্র, আবার পরতন্ত্র

উপাদান হয় সেই জিনিসই যা দ্রব্যের ঘটক। কর্মের এমন শক্তি নেই যে তা আত্মার উপাদানভূত স্বভাবগুলিকে তৈরি করতে পারে। কর্মের মধ্যে সেই শক্তি নেই যা আত্মায় জ্ঞানের পর্যায়কে তৈরি করতে পারে, চৈতন্যের পর্যায়কে উৎপন্ন করতে পারে, আনন্দ ও শক্তির পর্যায়কে তৈরি করতে পারে। কর্ম কখনই এসব করতে পারে না, কারণ এসব কর্মের স্বভাব নয়। চৈতন্য, আনন্দ এবং শক্তি—এরা হল আত্মার উপাদান। এজন্য আত্মা হল ওদের ঘটক। আত্মার মধ্যে-ই এমন শক্তি আছে যা নিজের পর্যায় তৈরি করতে পারে। নিজের সব পর্যায়কে তা তৈরি করে নিতে পারে বলেই তার স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব আছে অবাধ কর্তৃত্ব আছে। এগুলি আমাদের স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের পক্ষে।

আর একটি পক্ষ আছে। আত্মার সঙ্গে রাগ-দ্বেষের পরিণাম যুক্ত হয়েছে। রাগ-দ্বেষের ধারা প্রবাবিত হয় বলেই আত্মার সঙ্গে পরমাণুগুলির সংযোগ হয়। পরমাণু যুক্ত হয়, আত্মাকে প্রভাবিত করে। আত্মার কার্যকেও, আত্মার কর্তৃত্বকেও তারা প্রভাবিত করে। আত্মার সঙ্গে শরীরের যোগ আছে বলেই এমন হয়। প্রভাবের আদি বিন্দু হল শরীর। আমাদের পরতন্ত্রতারও আদি বিন্দু হল শরীর। আত্মার সঙ্গে শরীর রয়েছে, তাই আমরা পরতন্ত্র। আমরা স্বতন্ত্র কোথায়? শরীর আছে, এজন্য ভোজন প্রয়োজন। আত্মার কখনও ভোজনের প্রয়োজন নেই। আত্মার কখনও ভোজনের প্রয়োজন নেই। আত্মার কখনও ক্ষিধে পায় না। চেতনারও কখনও ক্ষিধে লাগে না। ক্ষিধে পায় পরমাণুগুলির, শরীরের। শরীর আছে, এজন্যই ক্ষিধে লাগে, এজন্যই ভোজন প্রয়োজন। ক্ষিধে আছে, তাই প্রবৃত্তির চক্র চলে। ক্ষিধে যদি না থাকত তাহলে মানুষের যাবতীয় প্রবৃত্তি লোপ পেত। ক্ষিধে আছে বলেই মানুষকে অনেক কিছু করতে হয়—ব্যবসা করতে হয়, নানারকম ধান্ধা করতে হয়, চাকরি করতে হয়, জানি না আরও কত কিছু করতে হয়। মানুষ রুটির জন্য, পেটের আগুন নেভানোর জন্য অনেক কিছু করে, সব কিছুই করে।

শরীর আছে বলেই কামবাসনা আছে। শরীরের সম্পূর্ণ চক্র কামের দ্বারা সঞ্চালিত। একটি প্রাণী আর একটি প্রাণীর জন্ম দেয়। এই জন্ম দেবার ক্ষমতা হল কাম। আহারের বৃত্তি আছে, এ হল আমাদের পরতন্ত্রতা। এসব পরতন্ত্রতায় রাগ-দ্বেষের চক্র চলছে।

শুদ্ধ চৈতন্য আছে, এজন্য আমরা স্বতন্ত্র।

রাগ-দ্বেষযুক্ত চৈতন্য আছে, এজন্য আমরা পরতন্ত্র।

দুটি পক্ষ আছে। একটি পক্ষ হল স্বতন্ত্রতার, অন্যটি পরতন্ত্রতার। চৈতন্যের জ্যোতি একেবারে লুপ্ত হয় না, এজন্যই আমাদের স্বতন্ত্রতার ধারা সতত প্রবহমান থাকে। আমরা শরীর, কর্ম এবং রাগ-দ্বেষের

বন্ধনে আবদ্ধ, তাই আমাদের পরতন্ত্রতার ধারা সতত প্রবাহিত। আমাদের ব্যক্তিত্ব হল স্বতন্ত্রতা এবং পরতন্ত্রতার সঙ্গম বা মিলনক্ষেত্র। তাকে কোন এক পক্ষে ফেলা যায় না। একেবারে নিখাদ সোনাও তা থেকে বানানো যায় না। সূর্য কত দীপ্তিমান, কিন্তু তাতে দিন ও রাত্রির প্রভেদকে মেটানো যায় না। যতই মেঘ ঢেকে ফেলুক অন্ধকার ছেয়ে থাক, সূর্যকে ঢেকে ফেলুক, দিন দিনই থাকবে, রাত রাতই। দিন ও রাতের প্রভেদ তাতে শেষ করা যায় না। স্বতন্ত্রতা চললে পরতন্ত্রতাও চলবে। পরতন্ত্রতা চললে স্বতন্ত্রতাও চলবে। স্বতন্ত্রতার ঘটক হল শুদ্ধ চৈতন্য, আর পরতন্ত্রতার ঘটক হল, রাগ-দ্বেষযুক্ত চৈতন্য।

কর্ম থেকেই সব কিছু হয় না

প্রশ্ন উঠবে, যা কিছু ঘটে, তার সব কিছুই কি কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? সবই কি কর্মের পরিণাম মাত্র? যদি তাই হয়? তাহলে কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। কেউ মিথ্যে বলছে, কেউ চুরি করছে, কেউ ডাকাতি করছে—তাহলে এ সবই যে করছে তার দোষ নয়, কারণ এ সবই পূর্ববর্তী কর্মের পরিণাম। এজন্য কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কাউকে আঘাত করা হল, তারপর তাকে বোঝানো হল—ভাই! এ তো তোমার পূর্বার্জিত কর্মের পরিণাম, কর্মেরই যোগ—এমন কথা বলে আঘাতকারী বাঁচতে পারে। সে তাহলে দোষী হতে পারে না। পূর্ববর্তী কর্মই তো তাকে দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছে তাহলে সে বেচারী কি করবে? এ সবই ভ্রম। প্রতিটি অপরাধীই নিজ অপরাধ লুকোনোর চেষ্টা করে, অপরাধ থেকে বেঁচে বেরিয়ে আসার প্রয়াস পায়। নিজেকে সে নির্দোষ মনে করে। সে বলতে পারে—আমি তো নিজে কিছুই করিনি। সব কিছুই কর্ম করাচ্ছে। যেমন কর্ম, তেমনি করতে হচ্ছে।

এ ধারণা সত্যি নয় যা কিছু ঘটিত হয় তা সবই কর্ম দ্বারা হয়।

ব্যক্তির নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তাও আছে। এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা আগের কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

রোগ উৎপত্তির নটি কারণ

স্থানাঙ্গ সূত্রে রোগ উৎপত্তির নটি কারণ বলা হয়েছে—

১। সর্বদা বসে থাকা।

২। অনিষ্টকর ভোজন করা। অতি ভোজন করা।

৩। অতি নিদ্রা।

৪। অতি জাগরণ।

৫। মল নিরোধ করা।

৬। প্রস্রাব নিরোধ করা।

৭। পায়ে চলা।

৮। ভোজনের প্রতিকূলতা।

৯। কামবিকার।

এই কারণ গুলি থেকে রোগের উৎপত্তি হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে একটি কারণও এমন নেই যাকে আমরা পূর্ব কর্ম-কৃত বলতে পারি। অধিক আহার থেকে রোগ সৃষ্টি হয়, অধিক নিদ্রায় রোগ তৈরি হয় এবং অধিক জাগরণেও রোগ তৈরি হয়। আহার, নিদ্রা এবং জাগরণ—এগুলি হল আমাদের ক্রিয়া পক্ষ। এগুলি কোন কর্মের উদয় নয়। এসব ঘটনা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব কর্মই এদের ঘটক নয়। পূর্ববর্তী ক্ষণ কখনই পরবর্তী ক্ষণের কারণ হয় না। তা ওর উত্তর দায়ীও হয় না। তার নিজস্ব পৃথক কিছু আছে।

অকাল-মৃত্যুর সাতটি কারণ

অকাল-মৃত্যুর সাতটি কারণ নির্দেশ করা হয়েছে—

১। রাগ, স্নেহ, ভয় প্রভৃতির তীব্রতা।

২। অস্ত্র প্রয়োগ।

৩। আহারের ন্যূনাধিকতা।

৪। চোখ, কান প্রভৃতির তীব্রতম বেদনা।

৫। পরাঘাত।

৬। সাপ প্রভৃতির স্পর্শ।

৭। পান-অপানের নিরোধ।

অকাল মৃত্যুর এই হল সাতটি কারণ। মৃত্যুর সময় নয়, কিন্তু অকাল-মৃত্যুর ঘটনা ঘটে যায়। এসব কারণের একটি হল স্পর্শ। কেউ পথ চলছে। রাস্তায় সাপ তাকে ছোবল মারল, সে মরে গেল। একটি লোক চুপচাপ বসে ছিল। ওপর থেকে ভারি কোন জিনিস পড়ল এবং সে মরে গেল। হঠাৎ ওপর থেকে ভারি পাথর গড়িয়ে পড়ল, দু চার জন লোক তাতে পিষ্ট হয়ে মারা গেল। এসব হল অকাল মৃত্যু। এগুলি কোন না কোন নিমিত্ত থেকে ঘটে, কিন্তু এতে কর্ম কখনই কারণ হয় না। আকাশে দুটি বিমানের সংঘর্ষ হল, পাঁচশো মানুষ তখুনি মারা গেল। বিমানের সংঘর্ষ কোন কর্মের যোগে হয় নি। আকস্মিক ঘটনাটি ঘটেছে এবং পাঁচশো মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এসব আকস্মিক ঘটনার ব্যাখ্যা আমরা কর্মের আধারে ধরতে পারি না।

রোগ এবং মৃত্যু কি কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ?

উলটো প্রশ্ন হতে পারে, রোগ হওয়াটা কি কোন কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয় ? অকাল মৃত্যু হওয়া কি কোন কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয় ? হ্যাঁ, সম্বন্ধযুক্ত। ব্যাপারটাকে আমাদের বুঝতে হবে। এসব ঘটনা কর্মের সাহায্যে ঘটে না। রোগ হওয়াটা একটা ঘটনা। রোগ হল, একটা ঘটনা ঘটল। এর কারণ হল, অরুচিকর ভোজন। আটা দূষিত ছিল, বিষাক্ত পদার্থের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছিল, তাই রোগ হল। অসুস্থতা দেখা দিল। এদের আমরা সংযোগ বলব। রোগ হওয়া হল অসাত বেদনীয় কর্মের উদয়। অহিতকর কিছু ভোজন করলে তার উদয় হল, বিপাকে পড়ল। কিন্তু যে অনিষ্টকর ভোজন করেছিল, সে অসাত বেদনীয় কর্মের উদয়ে কিছু খাওয়া হতো তাহলে

আমরা বলতে পারতাম, কর্মের কারণে ঐ পরিণাম ভুগতে হল। কিন্তু সংযোগবশত ভোজনের মধ্যে অহিতকর ভোজন এসে গেল। রোগ হল। একে কর্মের পরিণাম বলে ধরতে পারি না অহিতকর ভোজন করা এবং ঐ ভোজনের ফলে রোগ হওয়া, এই দুয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। অহিতকর ভোজনের ঘটনা কর্মের কারণে হয় নি, কিন্তু ঐ ঘটনা ঘটার কর্মের বিপাক ঘটেছে। বিমান দুর্ঘটনা আয়ুষ্য কর্মের কারণে ঘটে নি, কিন্তু বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে, তাই আয়ুষ্যকর্মের অবতরণা ঘটেছে। আয়ুষ্য কর্মের অবতারণা এবং বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া—এ দুটি পৃথক কথা। এদের পরস্পর সম্পর্ক নেই। বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাই আয়ু সমাপ্ত হয়েছে—এই সম্বন্ধ হতে পারে। কিন্তু এর থেকে আগের ঘটনার সঙ্গে আয়ুষ্য কর্মের কোন সম্বন্ধ নেই।

সোপক্রম আয়ুঃ এক বাস্তবিকতা

প্রশ্ন ওঠে, এমন কি হতে পারে? একশো মানুষের আয়ু কি একসঙ্গে শেষ হতে পারে? হ্যাঁ, তা হতে পারে। আয়ুষ্যকর্ম দু ধরনের—সোপক্রম আয়ু এবং নিরূপক্রম আয়ু। যে কোন কারণে আয়ুকর্মে পরিবর্তন হতে পারে, এ হল সোপক্রম আয়ু। যেখানে কোন নিমিত্ত কাজ করে না, কোন নিমিত্ত যেখানে আয়ুষ্যকর্মে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় না, তা হল নিরূপক্রম আয়ু। আয়ুষ্য-কর্ম এমন শক্তিশালী হয় যে এর উপরে নিমিত্তের কোন প্রভাবই পড়ে না। এর মধ্যে এমন প্রচণ্ড শক্তি থাকে যে, সব নিমিত্ত নিচে থেকে যায়, আর এটি ওপরে ভাসতে থাকে। এর কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। আয়ুর কালমান যতটা, তা পুরো হবার পরেই প্রাণীর মৃত্যু হয়—তার আগে বা পরে নয়। কোন নিমিত্তের কারণে ঐ প্রাণীর মৃত্যু সম্ভব নয়। এমন ঘটনা ঘটে, এমন নিমিত্ত এসে মিলিত হয় যে এক সঙ্গে হাজার মানুষ

মরে যায়। এ সবই হল সোপক্রম আয়ুর খেলা। নিমিত্ত থেকে কর্মের বিপকে চলে আসে।

প্রতিকূল সংবেদন : নিমিত্তের আধারে

অসহ্য বেদনায় কর্ম বন্ধ হল। এর পরিণামে ঐ ব্যক্তির প্রতিকূল সংবেদন ঘটবে। তার বিপাক থেকে প্রতিকূল সংবেদন হবে। কি রূপে প্রতিকূল সংবেদন ঘটবে, তা সবই নিমিত্তের আধারে আধারিত থাকে। কোন্ কাল, দেশ ও ক্ষেত্রে তা হবে, এসব নানা প্রসঙ্গের উপর নির্ভরশীল।

দুটি ব্যক্তি রয়েছে। একজন মাদ্রাজের, একজন রাজস্থানের। মাদ্রাজের আশেপাশের বাসিন্দাদের মধ্যে এক ধরনের রোগ দেখা যায়। এদের অনেকের পায়ে শোথ হয়। অনেকটা হাতির পায়ের মত ফুলে ওঠে পা। রাজস্থানে কিন্তু এমন হয় না।

রাজস্থানে 'লু' চলে। সেখানের লোকের হাঁটুতে ব্যথা হয়। শীতপ্রধান দেশগুলিতে ঠাণ্ডাজনিত রোগ বেশি হয়, আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে গরম-জনিত রোগ বেশি হয়। সব ঘটনাতেই দ্রব্য, ক্ষেত্র এবং কালের প্রভাব থাকে। সব প্রদেশের মানুষকেই অসাত-বেদনীয় কর্ম ভোগ করতে হয়। প্রতিটি মানুষের ভৌগোলিক এবং দ্রব্যগত কারণ হয় ভিন্ন ভিন্ন। ঐ অনুসারেই কর্মের বিপাক ভুগতে হয়। যেখানে ভৌগোলিক ভিন্নতা এবং দ্রব্যগত ভিন্নতা আসে, সেখানে অসাতবেদনীয় কর্ম ভোগ করার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা চলে আসে। লু লাগার ফলে রোগ হওয়াটা যদি অসাতবেদনীয় কর্মের কারণেই হয় তাহলে রাজস্থানের লোকেরই কেন লু লাগে, মাদ্রাজের লোকের লাগে না? কর্মের ক্ষেত্রে তো এই পক্ষপাত হওয়া উচিত নয়। আবার, কিছু লোক যেমন ঈশ্বরের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ আনেন। বলেন যে, ঈশ্বর এক দলকে এক রকম তৈরি করেছেন, অন্য দলকে আর এক রকম, ঐ পক্ষপাত আরোপ তো কর্মের ওপরেই কিন্তু লাগানো চলে। এটা পক্ষপাত নয়। এই

পার্থক্য হয় ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে। যেখানে গ্রীষ্মের প্রকোপ হয়, সেখানে অন্যান্য আরও কিছু কারণ পাওয়া যায়, সেখানে লু লাগে। যেখানে গরম নেই, অন্যান্য কারণও নেই, সেখানে লু লাগে না। লু লাগা বা না লাগাটা কর্মের অধীন নয়। কিন্তু লু লাগে বলে অসাতবেদনীয় কর্মের উদয় হয়। ঠাণ্ডায় ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। এই কারণে অসাতবেদনীয় কর্মের উদয় হয়। ঠাণ্ডার দেশের মানুষ ফর্সা হবে, গরমের দেশের মানুষ কালো, অন্যান্য দেশের মানুষ হয় উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ। ফর্সা হওয়া, কালো হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া—এগুলি নামকর্মের জন্য হয় না, এর মধ্যে ভৌগোলিকতা এবং প্রাদেশিকতার নিমিত্ত থাকে।

কর্ম এবং নো-কর্ম

অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলির কারণে কর্মের বিপাক হয়, কিন্তু কর্ম বিপাকের ফলে এই ঘটনাগুলি ঘটে না।

দুটি শব্দ আছে—কর্ম এবং নো-কর্ম। যেগুলি কর্ম নয় অথচ কর্মের সহায়ক, সেগুলিই হল নো-কর্ম। ভৌগোলিকতা, পরিবেশ, পরিস্থিতি—এগুলি হল নো-কর্ম। এগুলি কর্ম নয়, কর্মের উদয়ের সহায়ক তত্ত্ব।

কর্মের সত্তা সীমিত

প্রতিটি ঘটনাই কর্ম দ্বারা ঘটিত হয় না, এই তথ্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এজন্যই আমরা পরিপূর্ণভাবে পরতন্ত্র নই। যদি প্রতিটি ক্রিয়াই কর্ম দ্বারা ঘটে, তাহলে বিমানের দুর্ঘটনাও হয় কর্ম থেকে, দুই মোটরগাড়ির সংঘর্ষও কর্ম, অতৃপ্তিও হয় কর্ম থেকে, আবার প্রাকৃতিক প্রকোপও হয় কর্ম থেকে। যদি এমন হয় তাহলে কর্মের সাম্রাজ্য হবে ঈশ্বরেরই সাম্রাজ্যের মতন। তার সাম্রাজ্যও হবে সর্বশক্তিসম্পন্ন। কর্মই তখন হবে সব কিছু। তখন ঈশ্বর এবং কর্ম মানার মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকবে না। কেবল পার্থক্য হবে নামের। অনেক মানুষ ঈশ্বরকেই

সর্বশক্তিসম্পন্ন সত্তা বলেছেন, আবার অনেকে সর্বশক্তিসম্পন্ন সত্তাকে বলেছেন কর্ম। অবশ্য সর্বশক্তিসম্পন্ন সত্তার কোন পরিবর্তন হয় নি। কর্ম সর্বশক্তিসম্পন্ন সত্তা নয়। তার নিজস্ব সীমা আছে। তা আত্মার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে, তবে সেই আত্মার ওপর যার রাগ-দ্বেষ আছে। রাগ-দ্বেষ শূন্য চেতনার ওপর কর্মের কোন প্রভাব পড়ে না। তা প্রভাব বিস্তার করে নিজের সীমার মধ্যে। বাইরের ক্ষেত্রে সে নিজের প্রভাব ফেলতে পারে না। কর্মের সার্বভৌম সত্তা নেই। তার সত্তা যেমন সীমিত, প্রভাবও সীমিত। এজন্যই আমরা স্বতন্ত্রও। স্বতন্ত্র—কারণ আবেগগুলিকে শান্ত করার মনোবৃত্তি আমাদের আছে, কামনাও আছে। আবেগগুলিকে আমরা শান্ত করতে পারি—সেজন্যই আমাদের সাধনা। আবেগ-গুলিকে যদি আমরা শান্ত করতে না পারি তাহলে আমাদের সাধনা ব্যর্থ। যদি আমরা এ কথা মানি যে, কর্মে যা লেখা আছে তা-ই হবে, সাধনা যদি সেখানে লেখা থাকে তাহলেই সাধনা আসবে, বেশি বলা যদি লেখা থাকে তাহলে বেশি বলব, ঝগড়া করা যদি লেখা থাকে তাহলে ঝগড়া করব—তাহলে তো কোন কিছু করারই প্রয়োজন নেই। যা লেখা আছে তা-ই হবে। কিন্তু এ তো ভ্রান্তি।

সাধনার মূল সূত্র হল, কর্মই সব কিছু নয়। সাধনার মূল সূত্র হল, আত্মা নিজের স্বরূপে আসুক, জেগে উঠুক, জাগরণের এক স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যাক। ব্যস্, এটুকুই যথেষ্ট। এই মার্গ পেলে সাধক বিনা বাধায় সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন, আত্মাকেও সম্পূর্ণ অনাবৃত করতে সক্ষম হবেন।

১৭.

কর্মবাদের অঙ্কুশ

- কর্মবাদের ওপরে তিনটি অঙ্কুশ—
  ১. আত্মার চৈতন্য স্বভাবের পৃথক অস্তিত্ব
  ২. পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত
  ৩. বিপাকের সাপেক্ষতা
- কর্মমুক্তির দুটি সাধন — সংবর এবং তপস্যা।
- মূর্চ্ছার প্রথম মাধ্যম — দেহাসক্তি।
- দেহাসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার পাঁচটি সূত্র — খেয়ো না। কম খাও। রস ত্যাগ কর। খাওয়ায় বিভিন্ন প্রয়োগ কর। শরীরের সাধনা কর, কষ্টসহিষ্ণু হও।

  কর্মের অস্তিত্বের চারটি প্রমাণ—
  - সংসারের বিবিধতা
  - মানুষের রাগাত্মক ও দ্বেষাত্মক প্রবৃত্তি।
  - চঞ্চলতা
  - পরমাণু ও জীবের পারস্পরিক প্রভাব।

মূর্চ্ছা এবং জাগৃতি

কর্মের কেন্দ্রবিন্দু হল মূর্চ্ছা। সাধনার কেন্দ্রবিন্দু হল, জাগৃতি বা জাগরণ। মানুষ মূর্চ্ছিত রয়েছে। তার এই মূর্চ্ছা কত কালের, তার ঠিকানা পাওয়া সম্ভব নয়। তার মূঢ়তা অনাদিকাল থেকেই

রয়েছে। এই ঘোর অন্ধকারের আদি বিন্দুও আমাদের অজানা। আলোর কোন রেখা তাতে ফোটাতে হলে সাধনার দ্বারাই ফোটানো সম্ভব। এমন কাললব্ধি পাওয়া যেতে পারে যেখানে ব্যক্তির জাগরণ হল বা এমন কোন নিমিত্ত পাওয়া গেল যেখানে জাগৃতির বিন্দু স্ফুটিত হোক, কোন আলোর রেখার কিরণ পাওয়া গেল। মূর্চ্ছা এবং জাগরণ—উভয়ে একে অন্যের বিরোধী। মূর্চ্ছা জাগরণ নয়, আবার জাগরণ মূর্চ্ছা নয়।

অধ্যাত্মশাস্ত্রের সূত্র হল জাগরণ, আর কর্মশাস্ত্রের সূত্র হল মূর্চ্ছা। মূর্চ্ছাকে ভেঙ্গে ফেলা এবং জাগরিত হওয়া—এই দুই প্রসঙ্গ আমাদের সামনে রয়েছে। মূর্চ্ছা যতটা করে ভাঙ্গতে থাকে, জাগরণও তেমন তেমন বাড়তে থাকে। মূর্চ্ছা হল আস্রব, আর, জাগরণ হল সংবর। আস্রব রয়েছে। আস্রব নিয়ে আসে সেই জিনিসকে যা আমরা চাই না। আস্রব-দ্বার আছে। এর থেকেই সব কিছু আসে। যা বাঞ্ছনীয় নয়, যার আকাঙ্ক্ষা নেই, সেই জিনিস আসে। দরজা খোলা, তাই ওরা আসে। এদের আটকানো যায় না। সংবর-এর মানে হল, দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া। আস্রব হল, রাস-দ্বেষাত্মক পরিণতি। জীবের যা রাগ-দ্বেষাত্মক পরিণাম হয়, তাই-ই আস্রব হয়ে যায়। যখন চৈতন্যের অনুভব জাগ্রত হয় তখন তা নিজেই সংবর হয়ে যায়। সংবর হল চৈতন্যের অনুভব।

মূর্চ্ছার এক বিন্দু হল তমসাচ্ছন্ন, অন্ধকারাচ্ছন্ন। মূর্চ্ছা যখন সঘন হয় তখন জাগরণ অন্ধকারময় হয়ে ওঠে। বিন্দুটি লুপ্ত হয়ে যায়। যখন জাগরণের বিন্দু ফুটে ওঠে, সামান্য আলো আসে, তখন মূর্চ্ছার সঘন বিন্দু নিষ্প্রভ মনে হতে শুরু করে। রাগ-দ্বেষের তীব্র গ্রন্থির ভেদ হয়। এগুলি প্রথমবার হয় অপূর্বকরণের দ্বারা। অপূর্ব-করণ, অর্থাৎ চিত্তের এমন নির্মলতা যা এর আগে কখনও ছিল না। যে ঘটনা প্রথম বার ঘটে তা হয় অপূর্ব। এখানে রাগ-দ্বেষের গ্রন্থিটি প্রথম বার ভাঙ্গতে শুরু করে। জাগরণের একটি বিন্দু ফুটে বেরোয়।

যা ছিল ভীষণ অন্ধকার, তা ভাঙ্গতে থাকে। আমাদের চৈতন্যের অনুভব যেমন যেমন এগিয়ে যেতে থাকে, আলো ফেলতে থাকে, মূর্চ্ছার বিন্দুও তেমন তেমন কমজোরী হয়ে পড়তে থাকে। চৈতন্যের অনুভব যখন স্পষ্ট হয় তখন সম্যকত্ব সংবর তৈরি হয়। তা আরও স্পষ্ট হলে সব আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হতে শুরু করে। অপরিমিত আকাঙ্ক্ষাও বুঁজে যায়, তখন হয় ব্রত সংবর। চৈতন্যের অনুভব আরও স্পষ্ট হলে প্রমাদ শেষ হতে শুরু করে অপ্রমাদ সংবরের স্থিতি তৈরি হতে থাকে। চৈতন্যের অনুভব আরও স্পষ্ট হলে কষায়ও সমাপ্ত হয় এবং তখন অ-কষায় সংবর স্থিতি তৈরি হয়। তখন আসে পূর্ণ প্রকাশের স্থিতি, বীতরাগতার স্থিতি। রাগ-দ্বেষাত্মক পরিণাম দ্বারা যে আস্রব তৈরি হচ্ছিল, তা সমাপ্ত হয় এবং চৈতন্যের পরিপূর্ণ অনুভব জাগ্রত হয়।

সংবর-এর সাধনা কিভাবে করতে হবে?

সৈদ্ধান্তিক ভাষায় বলা হয়, মোহ যখন উপশান্ত বা ক্ষীণ হয়, তখন সংবর হয়। কিন্তু সংবর কিভাবে হয়? এর প্রক্রিয়া কি? ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের গভীরভাবে বিচার করতে হবে। সংবর হতে পারে সাধনার দ্বারা। সাধনার অনুভবের দ্বারাই কেবল জ্ঞাত হওয়া যায়, সংবর কিভাবে হতে পারে। আমি বলব, সংবর করুন, আস্রব আটকে যাবে, মূর্চ্ছার সঘন বলয় ছিন্ন হবে। কথাটা খুবই সোজা বলে মনে হয়। কিন্তু সংবর কিভাবে হবে, এই প্রশ্নটি খুব সোজা নয়। সাধনার ক্ষেত্রে চারটি শব্দ প্রচলিত আছে—সংযম, চারিত্র, প্রতিক্রমণ এবং প্রত্যাখ্যান। সংযম করুন। ইন্দ্রিয়ের সংযম করুন, মনের সংযম করুন, বাসনার সংযম করুন। চারিত্র, অর্থাৎ আচরণ। আমাদের শুদ্ধ আচরণ করতে হবে। সংযম হল সংবরের প্রক্রিয়া। অতীতের হয় প্রতিক্রমণ, আর ভবিষ্যতের হয় প্রত্যাখ্যান। তিনটি ক্ষণ আছে—একটি অতীতের, একটি বর্তমানের, আর একটি ভবিষ্যতের। যা চলে গেছে সেই ক্ষণ

হল ভবিষ্যৎ, আর এই দুয়ের মাঝের ক্ষণটি হল বর্তমান। সংবর হয় বর্তমান ক্ষণে, যাতে অতীতের প্রতিক্রমণ এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, ঐ প্রত্যুৎপন্ন ক্ষণটিতে আপনা থেকেই সংবর হয়ে যায়।

যে আস্রব চলছে, তাকে প্রতিক্রমণ করুন। ঐ আস্রব থেকে আপনি নিজের স্বভাবে চলে আসুন। নিজের চৈতন্যের অনুভব ছেড়ে আপনি রাগ-দ্বেষের অনুভবে চলে গিয়েছিলেন, এখন রাগ-দ্বেষের অনুভব ছেড়ে আবার চৈতন্যের অনুভবে চলে আসুন—সংবর হয়ে যাবে। দ্বেষের অনুভব থেকে মিলেমিশে বেরিয়ে আসাই হল প্রতিক্রমণ। আপনি সংকল্প করুন, আপনি রাগ-দ্বেষের ক্ষণে যাবেন না। এই সংকল্প যখন দৃঢ় হয় তখন রাগ-দ্বেষের অনুভব আপনা থেকেই চলে যায়। আবার তা অনুভবে যাবেই না। উভয়ের মাধ্যমে রাগ-দ্বেষের অনুভব সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই মাঝের ক্ষণটি—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝের ক্ষণটিই হবে চৈতন্য।

অসংযমের দ্বারা আস্রবের দরজা খোলা হয়। মনের অসংযম, ইন্দ্রিয়ের অসংযম, শরীরের অসংযম হলে তবেই ঐ দরজা খোলে। অনিয়ন্ত্রিত স্থিতিতে তা খোলা স্বাভাবিক, উচ্ছৃঙ্খলতাও স্বাভাবিক। যখন উচ্ছৃঙ্খলতা হয়, দরজা খোলা থাকে, তখন কারুর আসাটাও স্বাভাবিক। ঐ সময় সংবর হতে পারে না। আমরা সংযম করলাম। সংযমের কাজ হল, যা আসছে তাকে বন্ধ করে দেওয়া। আচরণের কাজ হল, যা আগে ছিল সেই সম্পদকে খালি করে দেওয়া। অসংযম কেন হয়? আমরা বিজাতীয় কিছু জিনিসকে সঞ্চয় করে রেখেছি। তা নিজ সঙ্গীদের নিমন্ত্রণ করে আনে। নিজেদেরই রাগ-দ্বেষের কারণে আমরা অসংযমের পালা এবং অসংযমের মোহ সংগ্রহ করি, মূর্চ্ছা সংগ্রহ করি, কষায়কে প্রবলতর করে তুলি। ঐ মূর্চ্ছা এবং মোহ অপরাপর কর্ম-পরমাণুগুলিকে স্বাগত জানাবার দ্বার উন্মুক্ত করে রাখে। এসো, এসো, একত্র হও।

এই যে মূর্চ্ছা, মোহ এবং অসংযমের প্রচেষ্টা চলে, তারই ফলে এত কর্ম-পরমাণু এগিয়ে আসে। আমাদের আত্মার, আমাদের অখণ্ড চেতনার এক একটি কণায়, এক একটি প্রদেশে কোটি কোটি পরমাণু তখন অ্যাটকে যায়। একটি দুটি-নয়, কোটি কোটি পরমাণু। এখন ওদের বের করবেন কিভাবে? এরা তো নিজের পুরো অধিকার, সম্পূর্ণ সত্তা জমিয়ে বসেছে। খুব সহজে তারা ওখান থেকে সরতে চায় না। যার অধিকার ছিল, সেই চৈতন্য শুয়ে পড়ল। তার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। যার কোন অধিকার ছিল না সে এতটা অধিকার নিয়ে নিল যে চৈতন্য আর রইলই না, সবই কেবল পরমাণু হয়ে গেল। জড়তা হয়ে গেল জড়তা। সেজন্যই আমাদের মনে সন্দেহ জাগে, এ কি আত্মা, না কি আত্মা নয়? এ সন্দেহ কারুর নয়। ভৌতিকতা থাকুক বা না থাকুক, এ সন্দেহ কারুর নয়। পরমাণু ও ভৌতিকতার সাম্রাজ্য এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে তার প্রবলতায় যে অ-পরমাণবিক পদার্থগুলি ছিল সেগুলি দমিত হয়ে গেল। যা ছিল চেতন তত্ত্ব, যা জড়ও ছিল না, অচেতনও ছিল না, তা লুপ্তপ্রায় হয়ে গেল।

অসংযম এবং আস্রব

পৃথিবীতে একটি মতবাদ খুবই চালু আছে যে, চৈতন্যবাদের কোন স্বতন্ত্র সত্তাই নেই। সব কিছুই জড়—তাই জড়বাদই চলছে। এ ধরনের জড়বাদের সার্বভৌম সত্তা তৈরি হয়ে গেছে। কেন এমন হল? এর মূল কারণ হল—অসংযম, আস্রব। অসংযম শক্তি দিয়েছে আস্রবকে। উপচয় হতে লাগল। সম্পদ ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ হল। যতক্ষণ পর্যন্ত জমে থাকা ঐ সম্পদকে পরিষ্কার করা না যায় এবং নবাঙ্গতুকের মার্গকে আটকানো না যায়, ততক্ষণ নিজের স্বভাবকে অনুভবের প্রসঙ্গ সফল হতে পারে না। সংবর হবে কিভাবে? চৈতন্যের অনুভব কিভাবে হবে? নিজের অস্তিত্বের অনুভব হবে কিভাবে? চৈতন্যের অনুভব, অস্তিত্বের অনুভব,

সংবর—এ সব একই। সংবরের অর্থ হল, নিজের চৈতন্য অনুভব, নিজের অস্তিত্ব বোধ। যতক্ষণ তা সম্ভব না হচ্ছে, ততক্ষণ তো চয়কে রিক্ত করা যায় না, তার দরজাকেও বন্ধ করা যায় না। চয়কে রিক্ত করার দায়িত্ব হল চারিত্রের। রাগ-দ্বেষের পরিণমন তথ্য মন, বাণী ও শরীরের চঞ্চলতার দ্বারা আমরা বিজাতীয় পদার্থগুলিকে নিজেরাই টেনে আনি, তাদের আকর্ষণ করি, সংগ্রহ করি। মন, বাণী ও শরীরের চঞ্চলতা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যা উপচিত তাকে রিক্ত করা যায় না, খালি করা যায় না। কারণ জায়গা একটু খালি হলেই নতুন সংগ্রহ ঐ স্থান দখল করবে। এই ব্যাপারটা অবাধ গতিতে চলতে থাকবে।

সমতার গূঢ় অর্থ

এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রথম কাজ হবে, নিজের আচরণকে সমতাপূর্ণ করা। ভগবান মহাবীর সমতার ওপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। আমাদের বুঝতে হবে, জীবমাত্রের ওপর সমভাব রাখাই হল সমতা, এটাই হল ধর্ম। একটি একটি প্রসঙ্গ। ধর্মের কথা। কিন্তু এর আরও গূঢ় অর্থ আছে। সমতার মূল তাৎপর্য হল, অ-রাগের ক্ষণ, অ-দ্বেষের ক্ষণ। আমাদের জীবনে এমন ক্ষণ আসে যখন রাগও থাকে না, দ্বেষও থাকে না—তা হল বীতরাগতার ক্ষণ। বাস্তবে এই বীতরাগতার ক্ষণই হল সমতা। যখন বীতরাগ-ভাব হয়, তখন সব প্রাণীর প্রতি, প্রতিটি জীবের প্রতিই আপনা থেকে সমতার ভাব আসবে। এতটুকু সমতা তাতে থাকবে না। যে কোন পদার্থের প্রতিও—তা সে চেতন হোক, আর অচেতন হোক—উচ্চ-নিচ ভাব তখন সমাপ্ত হয়ে যায়। কেন ঘৃণা থাকতে পারে না, অহঙ্কার থাকতে পারে না, উচ্চ ভাবও থাকতে পারে না। বীতরাগতার ক্ষণে কিছুই থাকে না।

সংবর-এর প্রক্রিয়া

যে আচরণ সমতাপূর্ণ, তা হল সবচেয়ে বড়। সমতা এক মহান

আচরণ। যে আচরণে সমতা নেই, অর্থাৎ তটস্থতা নেই, মধ্যস্থতা নেই, নিরপেক্ষতা নেই, যাতে রাগ-দ্বেষের প্রাচুর্য রয়েছে, তা কখনই মহান হতে পারে না। তা হবে সাধারণ, সাধারণ ব্যক্তির আচরণ। যা পূর্ণ তটস্থ, যা মধ্যস্থভাবে পরিপূর্ণ এবং যা রাগ-দ্বেষের পরিণতি-শূন্য, সেটাই হল মহান আচরণ। তার এদিকে ঝুঁক নেই ওদিকেও ঝুঁক নেই। উভয়ই তুলাদণ্ডের পাল্লার মত। এ হল সমতার আচরণ। যখন সমতাপূর্ণ আচরণ হয়, তখন বিজাতীয় তত্ত্বকে ওপরে তুলে ফেলতে হয়। অসমতার কারণে যে তত্ত্ব বদ্ধমূল ছিল, তার পদার্থ স্পন্দিত হতে থাকে, তার সত্তা পিছলে যেতে থাকে। এক এক করে তারা সেখান থেকে সরে যেতে শুরু করে। পরিপূর্ণ সম্পদ শূন্য হতে শুরু করে। একদিকে যেমন এই শূন্য করার কাজ চলতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে এটাও করা দরকার, যেসব শূন্য জায়গায় নতুন কোন জিনিস এসে বসে না যায়। যা শূন্য হল, অনেক পরিশ্রমে তাকে খালি করা হয়েছে, আবার যেন তা ভরে না ওঠে। পুরনো যা আছে তা থাকুক, নতুন যেন আর কেউ আসতে না পারে। আমাদের চরিত্র তৈরি হয় সমতার তত্ত্ব দ্বারা। ভর্তি জায়গা শূন্য হতে শুরু করেছে। এখন আমরা সীমানাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা শুরু করব, সংযম করতে শুরু করব। মনকে আটকাবো, ইন্দ্রিয়কে আটকাবো, শরীর ও বাক্যের চঞ্চলতাকেও আটকাবো। জোর করে ঘিরে ফেলে সংযম করব। এখন নতুন কিছু আর ভেতরে আসতে পারবে না। পুরনোরা সরে যেতে থাকবে, দূরে যেতে থাকবে। এই রকম পরিস্থিতিতে যদি আমরা সংযমের সাধনা করি তাহলে আমাদের আচরণ তৈরি হবে এবং সংবর হবে। এই হল সংবর-এর প্রক্রিয়া।

তত্ত্বের ব্যখ্যায় সংবর হয় না। তা হয় সাধনার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা। আপনি জানলেন, কর্মের অমুক প্রবৃত্তিগুলির ক্ষয়োপশম দ্বারা সংবর হয়—কিন্তু এতেই সংবর হবে না। সংবর তখন হবে

যখন প্রতিক্রমণ ও প্রত্যাখ্যান, তথা সংযম ও চারিত্র—এই চার তত্ত্ব আমাদের সাধনার অঙ্গ হয়ে ওঠে। সংবর হলে মূর্চ্ছার ঘোর বলয় আপনা থেকেই ছিন্ন হতে শুরু করে এবং একদিন পূর্ণ জাগরণের স্থিতির উপলব্ধি ঘটে। ঐ অবস্থায় কেবল জাগরণই থাকে।

চেতনার সাধনা

কর্মশাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করার, বিবেচনা করার এবং তা বোঝার পরিণাম বা নিষ্কর্ষ হল, যদি আমরা সাধনা করতে চাই তাহলে আমাদের চৈতন্যের অনুভবে আসতেই হবে। এমন একটা ক্ষণে আমাদের পৌঁছুতে হবে যখন চৈতন্যের অনুভব হবে না, কেবল নিজের অস্তিত্বের অনুভব হবে, রাগ-দ্বেষের কোন অনুভব হবে না। কখন পৌঁছব? আচারের ক্ষণে, ব্যবহারের ক্ষণে। আমরা যে আচরণই করি না কেন, কারুর সঙ্গে যে ব্যবহারই করি, ঐ ক্ষণে যেন আমরা সমতায় থাকি, সমতা অনুভব করি। সংবর আপনা থেকেই নিষ্পন্ন হবে।

আমরা সর্বদা জাগ্রত থাকব। মনে বা ব্যবহারে রাগ-দ্বেষের পরিস্থিতি হলে সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে বেরিয়ে আসব এবং সঙ্কল্প-শক্তিকে জাগ্রত করব। আমাদের সংকল্প এমন দৃঢ় হবে যেন রাগ-দ্বেষের পরিণতিই না হয়, রাগ-দ্বেষের ক্ষণ উৎপন্ন না হয়। সংবর-এর সাধনা তাহলে আপনা থেকেই নিষ্পন্ন হবে। সাধনার এই হল সম্পূর্ণ সার্থকতা। সাধনা তখন হয় দেশকালাতীত। এখনও আমাদের সাধনা দেশকালাতীত নয়, তা দেশবদ্ধ বা কালবদ্ধ এবং কালবদ্ধ সাধনার পরিণাম তাৎকালিক হয়। সাধনা হতে হবে এমন যা দেশ বা কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, তার বন্ধনে বাঁধা নয়। আপনি যে কোন দেশে চলে যান, যে কোন কালে চলে যান, কোন এক কালে থাকুন, কিন্তু চৈতন্যের অনুভবের এক জ্যোতি, এক প্রকাশরেখা বিকশিত হতে হতে ক্রমশ বাড়তে বাড়তে থাকবে।

কখনই তা বুঁজে যাবে না। তাকে নিন, তাহলে ঐ প্রকাশরেখা কখনই দূরে যাবে না। এমনই আমাদের প্রচেষ্টা হোক।

কর্মমুক্তির সূত্র : সংবর এবং তপ

এর আগে কর্ম-বন্ধের সূত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখন কর্ম-মুক্তির কিছু সূত্র বলছি। কর্মমুক্তির সবচেয়ে বড় সূত্র হল—সংবর এবং তপ। তপস্যার ব্যাপারেও কিছু ভাবতে হবে। যাকে নষ্ট করতে হবে, যাকে দূর করতে হবে, তার প্রথম তত্ত্ব হল মূর্চ্ছা। মূর্চ্ছার সবচেয়ে প্রথম মাধ্যম হল, দেহাসক্তি। এখান থেকেই মূর্চ্ছা শুরু হয়। ভগবান মহাবীর তপস্যার জন্য বারটি সূত্রের কথা বলেছিলেন। এর প্রথমটি হল, অনশন—খেয়ো না। দ্বিতীয় হল—উনোদরী, কম খাও। তৃতীয় হল—রস-পরিত্যাগ, রসকে ছাড়ো। জিহ্বা নামক ইন্দ্রিয়টির ওপরে সংযম রাখ। চতুর্থ হল—বৃত্তি-সংক্ষেপ। খাওয়ার বিভিন্ন প্রয়োগ কর। পঞ্চম হল—কায়ক্লেশ। শরীরকে সাধনা করে নাও। এমন কষ্টসহিষ্ণু হও, আসনের দ্বারা এমন শক্তি তৈরি করে নাও যাতে যে কোন পরিস্থিতিকে শরীর আটকাতে পারে। এই পাঁচটি সূত্র হল, দেহাসক্তি থেকে মুক্ত হবার সূত্র।

আহারের প্রতি আসক্তিও দেহাসক্তি। এই দেহাসক্তিরও এক পরিণাম আছে। ওপরের পাঁচ সূত্রের যখন সাধনা করা হয় তখন দেহাসক্তি ভেঙ্গে যায়।

এসব হয়ে গেলে প্রতিসংলীনতার প্রসঙ্গ আসে। এ হল কর্ম-মুক্তির ষষ্ঠ সূত্র। প্রতিসংলীনতার অর্থ হল, ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী তৈরি করা। যে রাস্তাগুলি থেকে ইন্দ্রিয়গুলি বাইরে বেরিয়ে যায়, সেগুলিকে বন্ধ করে দাও। নতুন পথ খুলে দাও। মার্গান্তরীকরণ কর। যে ইন্দ্রিয়গুলি কেবল বাইরের দিকেই দৌড়চ্ছে, যে মন বাইরের ঘটক হয়ে থাকছে, ঐ ইন্দ্রিয়গুলিকে ভেতরে নিয়ে যাও, মনকে ভেতরে নিয়ে যাও। এ হল অন্তঃপ্রবেশের

প্রক্রিয়া। আমরা বলি - শরীরকে দেখ। এর তাৎপর্য হল, শরীরের ভেতরে যে প্রকম্পন হচ্ছে, তা দেখ। অভ্যাস এমন হয়ে যায় যে তা কেবল ওপর ওপর দেখে. দেখতে চায়। এই অভ্যাসকে বদলে দাও। এক নতুন অভ্যাসকে বদলে দাও। এক নতুন অভ্যাস তৈরি কর। ঐ অভ্যাস কেবল ভেতরটুকুকে দেখবে। বাইরের দর্শনে যে আনন্দ, তার থেকে বহুগুণ বেশি আনন্দ হল ভেতরের দেখায়। বাইরের দেখার পরে ব্যক্তির বহুবার অনুতাপও হয়। কিন্তু ভেতর যিনি দেখছেন তাঁর তেমন অনুতাপ হয় বলে দেখি নি। শরীরের প্রেক্ষা-সাধনকারীরা আমাকে বহুবার প্রশ্ন করেছেন, শরীরের প্রেক্ষা করলে আপনার মধ্যে ব্যর্থতার অনুভবই বা হবে না কেন? কেউ বলেন নি, আমার মধ্যে ব্যর্থতার অনুভব হয়েছে কিংবা অনুতাপ হয়েছে। প্রেক্ষার এই প্রক্রিয়া, দর্শনের প্রক্রিয়া বা দেখার প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা আস্রব, কর্ম-আগমনের দ্বার, তা সংবর-এরও দ্বার। দর্শনের প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ দ্বারগুলিকে আমরা বন্ধ করে দিই।

• দেহাসক্তিকে নষ্ট করা, শরীরের সাধনা করা এবং ইন্দ্রিয়গুলির রাস্তা বদলে দেওয়া – এ হল প্রাথমিক দ্বার। সাধকের জন্য প্রবেশ-দ্বার। একে বহিরঙ্গও বলা যায়। যতক্ষণ আমরা প্রবেশ না করব, ততক্ষণ ভিতরে থাকার প্রশ্নও হবে না।

সপ্তম সূত্র হল—প্রায়শ্চিত্তের। মনে বিচার আসছে। ঐ বিচার আসা মাত্র তাকে পরিষ্কার করে ফেলুন। তখুনি যদি পরিষ্কার না করেন, জাগরুক না থাকেন, তাহলে ঐ বিচারকে পালন করলে গাঁট তৈরি হবে, গ্রন্থিপাত হবে। বিচার আজকের, কিন্তু তার পরিণাম হাজার বছর পরেও ভুগতে হতে পারে। কখন এই ভোগ হবে তা জানি না। ঐ সময় যদি তার প্রক্ষালন করা হয়, ধুয়ে ফেলা যায়, তাহলে যে কর্ম-পরমাণুগুলি এসেছিল, সেগুলি ভেঙ্গে যাবে। গাঁট-গুলি তৈরি হতে পারে না। সাবধান না থাকলে, জাগরিত না

থাকলে গাঁট তৈরি হলে নিশ্চিতভাবে তার পরিণাম ভুগতে হবে। এজন্যই প্রায়শ্চিত্তের সূত্র দেওয়া হয়েছে। গাঁট যাতে তৈরি হতে না পারে সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে থাকুন।

অষ্টম সূত্র হল—বিনয়। মনে যেন অহং না থাকে। অহঙ্কার এবং মমকার—এই হল দুই বাধা। সাধনায় কোন অহঙ্কার হওয়া উচিত নয়। সাধক অত্যন্ত নম্র ও মৃদু থাকবেন।

নবম সূত্র হল—বৈয়াবৃত্য। এর অর্থ হল, সাধনাকারীকে সহযোগিতা করা। স্বার্থপর হবেন না। যিনি সাধনা করতে চাইছেন, তাঁকে নিজের জন্য যা কিছু করেছিলেন, দিয়ে দিন। এ হল বৈয়াবৃত্য, সেবা।

দশম সূত্র হল – স্বাধায়। স্বাধ্যায়-এর অর্থ হল, পড়া, জ্ঞান-প্রাপ্ত হওয়া। যে জ্ঞানপ্রাপ্ত হবেন, তা দিয়ে নিজের আত্মাকে জাগ্রত করুন। কেবল বই পড়া জ্ঞান যথেষ্ট নয়। কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তি দেখাতে পারে, এমন জ্ঞান লাভ করুন। এমন জ্ঞান লাভ করুন যাতে মূর্চ্ছার বন্ধন থেকে ছিন্ন হওয়া যায়।

একাদশ সূত্র হল—ধ্যান। যদি না পড়ার হল তাহলে নিজের মধ্যেই নিজে লীন হয়ে যান। ধ্যান হল লীন হওয়ার প্রক্রিয়া। ধ্যানের মাধ্যমে আপনি সত্য পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন, সত্যকে পাবেন, সত্যের সাক্ষাৎ পাবেন।

দ্বাদশ সূত্র হল—ব্যুৎসর্গ। এর অর্থ হল, ছেড়ে দেওয়া। আমি আগেই বলেছিলাম, মহাবীরের সাধনার সূত্র হল, অ-যোগ-এর সাধনা। সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করুন। সব বিসর্জন দিন। যা কিছু আছে তা বিসর্জন করুন। শরীরের ব্যুৎসর্গ এবং কর্মের ব্যুৎসর্গ।

এ সবই হল তপস্যার প্রক্রিয়া। এর বারটি সূত্র আছে।

কর্ম মুক্তির প্রক্রিয়ার দুটি তত্ত্ব আছে—একটি হল সংবর, অন্যটি হল তপস্যা বা নির্জরা।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্লেশকে কম করা

যায়। তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান—এসব হল ক্রিয়াযোগ।

ভগবান মহাবীরের ভাষায় সংবর এবং নির্জরার সাহায্যে আস্রবকে ক্ষীণ করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় কর্মমুক্তি ঘটে এবং ব্যক্তি সর্বদা মুক্ত হয়ে যান।

কর্ম-বন্ধনের প্রক্রিয়া দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম, এখন পৌঁছে গেছি কর্ম মুক্তির প্রক্রিয়া পর্যন্ত। বন্ধনের ক্ষণ থেকে মুক্তির ক্ষণ পর্যন্ত এসে গেছি।

কর্ম-চর্চার নিষ্কর্ষ

এখন আমরা কর্ম-সম্বন্ধীয় দু-চারটি বিন্দুর ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। যাবতীয় আলোচনার এই হল মূল।

প্রশ্ন উঠবে, কর্মের অস্তিত্ব আছে, কি নেই? বলা হয়, সংসারে নানা বিভিন্নতা আছে এবং এই বিভিন্নতার এক হেতু হল কর্ম। কিন্তু বিভিন্নতার হেতু কেবল কর্মই নয়, আরও অনেক কারণ আছে। চৈতন্য-জগতে বিভিন্নতা আছে। চৈতন্য-জগতে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার এক বড় নিমিত্ত হল কর্ম। যদি কর্ম-পরমাণু না থাকে, যদি কর্ম-বন্ধ না হয় তাহলে এসব বিভিন্নতা থাকবে না। সব কিছুই সমান হয়ে যাবে। সবই হয় আত্মার স্বভাবে। সব একই রকম হবে, কোন পরিবর্তন হবে না, বিভিন্নতা থাকবে না। বিভক্ত হওয়া, বিভাজিত হওয়া হল কর্মের অস্তিত্বের খুব বড় প্রমাণ।

কর্মের অস্তিত্বের দ্বিতীয় কারণ হল, মানুষের রাগাত্মক ও দ্বেষাত্মক পরিণাম। মানুষের যদি রাগ-দ্বেষ না হয়, তাহলে কর্মকে স্বীকার করার কোন কারণই হবে না। মানুষ কর্মের সঙ্গে বাঁধা, তাই রাগাত্মক ও দ্বেষাত্মক পরিণাম হয়। বন্ধন চৈতন্যের মূল স্বভাব নয়, স্বভাবের অতিক্রমণ। স্বভাব-বিরোধী যে কাজ আমরা করি তার প্রেরক তত্ত্ব হল কর্ম।

তৃতীয় কারণ হল চঞ্চলতা। কর্ম না হলে চঞ্চলতা হয় না।

সক্রিয়তা হবে, কিন্তু চঞ্চলতা হবে না। সক্রিয়তা হল পদার্থের লক্ষণ। কোন পদার্থ নিষ্ক্রিয় হয় না। সব সক্রিয়। সক্রিয়তা পদার্থের লক্ষণ, চঞ্চলতার নয়।

আমরা নিজের কর্ম-পরমাণুর দ্বারা নিজের ওপর এক শরীরের বন্ধন দিয়ে রেখেছি। একটি হল সূক্ষ্ম শরীরের, আর একটি হল স্থূল শরীরের। ঐ শরীরের দ্বারাই এসব চঞ্চলতা হচ্ছে। শরীর আছে বলেই মনের চঞ্চলতা আছে। শরীর রয়েছে বলেই বাণীর চঞ্চলতা আছে। এ সবই প্রধানত শরীরের চঞ্চলতার জন্যই চঞ্চল। কর্মের কারণে এই শরীর, এবং শরীরের কারণে এই চঞ্চলতা। এজন্য এটা স্বীকার করে নেওয়া ভাল, কর্ম আছে।

চতুর্থ প্রসঙ্গ হল—পরমাণু এবং জীবের পারস্পরিক প্রভাব। একে অপরকে প্রভাবিত করে। জীব পরমাণুকে প্রভাবিত করে, এবং পরমাণু জীবকে প্রভাবিত করে। পরমাণু মনকে প্রভাবিত করে, শরীরকে প্রভাবিত করে। জীবের রাগ-দ্বেষাত্মক পরিণাম এবং পরমাণুগুলির মধ্যে এমন সেতুবন্ধ রয়েছে, এমন সন্ধি আছে যে, রাগ-দ্বেষাত্মক পরিণাম পরমাণুগুলিকে সহযোগিতা দেয় এবং পরমাণুগুলিও রাগ-দ্বেষাত্মক পরিণামকে অসহযোগিতা করে। উভয়েই একে অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। উভয়েই একে অন্যকে প্রভাবিত করে। চেতন ও আত্মার এভাবে অপর কর্তৃক প্রভাবিত হওয়া প্রমাণ করে, কর্মের অস্তিত্ব আছে।

আমি আগেই আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছি, কর্মের সার্বভৌম সত্তা নেই, সর্বশক্তিসম্পন্ন সত্তা নেই। এই তথ্য খুবই নিয়ন্ত্রিত। সাধনা-ক্ষেত্রে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও আমরা ভুল করি এবং বলি, আমার দ্বারা সাধনা সম্ভব নয় কারণ কর্মের যোগ এমনই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও আমরা বলে দিই—আমি এই কাজ করতে পারব না, কারণ কর্মের যোগ এই রকম। আমরা ধরে নিয়েছি, কর্মই সব কিছু। কিন্তু কর্ম সব কিছু নয়। কর্ম এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে তা

সব কিছু হয়ে যাবে। ভুলবশত আমরা কর্মকে সব কিছু হওয়ার স্থান দিয়েছি।

সাধনার দৃষ্টিতে, কর্মশাস্ত্রের আধারে যদি আমরা বিচার করি, তাহলে নিচের দু-চারটি কথাকেও আমাদের প্রায়ই মনে রাখতে হবে।

প্রথম কথা, কর্মের ওপরেও অঙ্কুশ আছে। তা একেবারে নিরঙ্কুশ সত্তা নয়। তার ওপর সবচেয়ে বড় অঙ্কুশ হল, আত্মার। চৈতন্য স্বভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যদি না থাকত, তাহলে কর্মই সব কিছু হয়ে যেত। কিন্তু আত্মার স্বতন্ত্র স্বভাব আছে এবং ঐ চৈতন্যও কখনও নিজের স্বভাবকে ভাঙ্গতে দেয় না, নষ্ট হতে দেয় না। এজন্যই কর্ম আত্মার ওপরে একাধিপত্য স্থাপন করতে পারে না। আত্মার ওপর কর্ম যতই প্রভাব বিস্তার করুক, তার ওপরে কখনই একচ্ছত্র শাসন চালাতে পারে না। যখন আত্মার চৈতন্য-স্বভাবের জাগরণ হয়, তখন কর্মের সত্তা নড়তে শুরু করে। যতই গভীর অন্ধকার হোক, এক ছোট আলোর রেখা দেখা দেয়, তখন তা সমাপ্ত হয়ে যায়। তার একচ্ছত্রসম শাসনও নষ্ট হয়ে যায়। আলোর সামনে অন্ধকার টিকতে পারে না। যতক্ষণ আলো না আসে ততক্ষণ অন্ধকার থাকে। যতক্ষণ না চৈতন্যের জাগরণ হচ্ছে, ততক্ষণই কর্ম ঠিক থাকে। যেই চেতনা জাগে, অমনি আপনা থেকেই কর্ম সমাপ্ত হতে শুরু করে।

কর্মকে বদলানো যায়

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হল, পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যা পরিবর্তনশীল নয়। যা নিত্য, তা অনিত্যও বটে। আবার যা অনিত্য, তাও নিত্য বটে। সবই পরিবর্তনশীল। ভগবান মহাবীর কর্মশাস্ত্র বিষয়ে এমন কিছু কিছু নতুন ধারণা দিয়ে গিয়েছিলেন যা অন্যত্র দুর্লভ বা দুষ্প্রাপ্য। তিনি বলেছিলেন, কর্মকে বদলে দেওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও এত শতাব্দী ধরে এই

ধারণা প্রচলিত ছিল যে, লোহা-তামা-সোনা-পারদ প্রভৃতি হল মূল তত্ত্ব, এদের একটিকে আর একে পরিণত করা যায় না। এঁরা এই তত্ত্বকে ধরে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এদের একটিকে অন্যে পরিবর্তিত করা যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এসব মূল তত্ত্ব নয়। এদের একটিকে অপরটিতে পরিবর্তিত করে ফেলা যায়। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগেই এ কথা নিশ্চিতভাবে মানা হতো যে. সোনাকে পারদে পরিণত করা যায়, পারদকেও সোনায় বদলে ফেলা যায়। আজ বিজ্ঞানও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, পারদ থেকে সোনা করা যায়। প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রবিদরা পারদ থেকে সোনা তৈরির অনেক বিধির উল্লেখ করেছেন। জৈন গ্রন্থগুলিতেও এর নিয়মাদির বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পারদের অণুর ভার হল হল ২০০। একে প্রোটন দ্বারা ভাঙ্গা যায়। প্রোটনের ভার হল ১। প্রোটনের সাহায্যে বিস্ফোটিত করার পর ঐ প্রোটন পারদে মিশে যায় এবং পারদের ভার গিয়ে দাঁড়ায় ২০১-এ। ২০১ হলেই এর থেকে আলফা কণা বেরিয়ে যায়। আলফা কণার ভার হল ৪। ভার ৪ কমে যাবে। শেষে ১৯৭ ভারযুক্ত অণু থাকবে। সোনার অণুর ভার ১৯৭ এবং পারদের অণুর ভারও ১৯৭। পারদ সোনা হয়ে গেল। বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করে এ জিনিস দেখিয়ে দিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে তৈরি সোনা সস্তা পড়ে। তাই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু এ কথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, পারদ থেকে সোনা তৈরি হয়।

মহাবীর বলেছিলেন, আপনার সাধনা যদি প্রবল হয়, সমতা যদি মজবুত হয় তাহলে পুরনো বন্ধনযুক্ত কর্মের যতই উপচয় হোক, তা ভাঙ্গতে শুরু করবে। পারদ হয়ে যাবে সোনা। নতুন পাপ কর্ম তীব্র হয়ে বাঁধতে :পারবে না, এ তো একটা প্রসঙ্গ। পুরনো যে

সঞ্চয় আছে, তাতে অসৎ সৎ-এ বদলে যাবে, অশুভ হয়ে যাবে শুভ। পাপ বদলে যাবে পুণ্যে। নতুন যে কথাটি মহাবীর বলেছিলেন তা হল, কর্মকেও বদলে দেওয়া যায়। কর্মকে ভাঙ্গতে পারা যায়। কর্ম কখন উদয়ে আসবে? কর্মের ভাণ্ডার কখন শূন্য হবে? এ প্রসঙ্গ অনন্ত কালের হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মহাবীর বলেছিলেন, নিজের পরিণামকে এমন শ্রেণী-নিমিত্ত করুন যাতে রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন না হয়। কর্মের ভাঙ্গন শুরু করুন, বন্ধনযুক্ত কর্মকে টেনে তাকে ভাঙ্গতে শুরু করুন। বিপাকের প্রতীক্ষা করবেন না। আগে তাকে শেষ করার চেষ্টা করুন। এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হল বড় অঙ্কুশ।

বিপাকের সাপেক্ষতা

তৃতীয় প্রসঙ্গ হল, বিপাকের সাপেক্ষতা। কোন বিপাকই নিরপেক্ষ হয় না। দেশ, কাল, ভাব, পরমাণু, পরমাণুর পরিণাম—এ সবেরই মাধ্যমে হয় ঐ বিপাক। সাধনার দ্বারা আমরা বিকাশের বাধা-সৃষ্টিকারী নিমিত্তগুলিকে দূর করব। এমন নিমিত্তকে আমরা বিকশিত করব যা কর্মের বিপাক দূর করতে সক্ষম। বিপাক হয় নিমিত্ত থেকে। এই বিপাকের সাপেক্ষতা হল কর্মের ওপরে অঙ্কুশ।

সাধনাকারী যে ব্যক্তির মধ্যে সাধনা সম্বন্ধে সামান্যতম রুচিও জাগ্রত হয়েছে তিনি কর্মশাস্ত্রের এই গূঢ়তম রহস্যকে জানবেন এবং জানার পর অধ্যাত্মশাস্ত্রের সাহায্যে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করে সাধনায় সফল হবেন।